ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১৯৫৮-৭১

রোজিনা কাদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের
এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য পেশকৃত অভিসন্দর্ভ

384630

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
384630

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৩-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদন

শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্যই নয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্যও ১৯৫৮-৭১ সময়কাল গুরুত্বপুর্ণ। কেননা, এই সময়ে বাঙালির পুঞ্জিভুত অসন্তোষ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয় যা অন্তিমে সৃষ্টি করে স্বাধীন বাংলাদেশের। আর এ সমস্ত কিছুর কেন্দ্র ছিল ঢাকা শহর।

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুতকৃত আমার এই অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ ১৯৫৮-৭১'। বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতি কর্মীরা এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রণোদনা যুগিয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষকে। সে জন্যই আমি এ পর্বের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপরে গবেষণার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। কেননা আমাদের দেশে রাজনৈতিক ইতিহাস যতটা লেখা হয়েছে, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ততটা লেখা হয়নি।

384630

এই গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ মুনতাসীর মামুন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুপ্রেরণা, অকুণ্ঠ সহযোগিতা, অসীম ধৈর্য-আগ্রহ এবং সুচিন্তিত পরামর্শ-নির্দেশনার ফলে আমি এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া বিভাগীয় অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীরা প্রায়শই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন গবেষণা কর্মটি শেষ করতে। প্রুফ সংশোধনে আমাকে সাহায্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা অধিকর্তা আহমেদ মাহফুজুল হক। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাঁদের মুল্যবান সময় নষ্ট করে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রোজিনা কাদের

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় ঃ পটভূমি (১৯৪৭-১৯৫৮) ১০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সামরিক শাসনের অভিঘাত (১৯৫৮-১৯৬৫) ৬৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের দাবি (১৯৬৬-১৯৬৯) ১১১

চতুর্থ অধ্যায় ঃ স্বাধীনতার পথে (১৯৭০-১৯৭১) ১৬২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার ১৯২

পরিশিষ্ট-১ ঃ ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটকের তালিকা (১৯৪৮-১৯৭১) ১৯৭

পরিশিষ্ট-২ ঃ উল্লেখযোগ্য গণসঙ্গীত যা আন্দোলনে (১৯৫৮-১৯৭১) অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল ২৩১

384630

পরিশিষ্ট-৩ ঃ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী - আনিসুজ্জামান ২৬৫

পরিশিষ্ট-৪ ঃ সাক্ষাৎকার ঃ আবদুল গাফফার চৌধুরী ২৭৪

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ২৮৭

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাঙালি সব সময় তার সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করেছে কেননা সে উত্তরাধিকারী এক গৌরবময় সংস্কৃতির, লিখেছেন কবীর চৌধুরী, ''প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে তার মাটি, প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব থেকে প্রাণরস আহরণ করে একান্তভাবে দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্য লালিত হিন্দু -মুসলমান নির্বিশেষে এক ইন্টিগ্রেটেড বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সম্প্রদায়ভেদে, শ্রেণীভেদে, ধর্মভেদে, পেশাভেদে কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও জীবন-যাপন রীতির ক্ষেত্রে উপর স্তরে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিভিন্নতা থাকলেও মৌল স্তরে নিবিড় ঐক্য ছিল।''[১]

বাঙালির জীবনচর্যাকেই কবীর চৌধুরী সংস্কৃতি হিসাবে বিচার করেছেন।[২] তবে, 'সংস্কৃতি' শব্দটির (যার ইংরেজী কালচার) সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য, তর্ক -বিতর্ক আছে। নৃতাত্ত্বিকরা সংস্কৃতির একরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, বলা হয়েছে, বিশ শতকে নৃতত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ই হচ্ছে 'সংস্কৃতি', এবং বিশ্ব বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভক্ত। প্রত্যেক মানুষই একেকটি সংস্কৃতিতে বসবাস করে। মানুষকে ব্যাখ্যা করতে হবে তার জাতি (ক্ষতদন) দিয়ে নয় তার সাংস্কৃতিক ভিন্নতা দিয়ে।[৩] সুতরাং বলতে পারি সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে গবেষকরা একমত নন। তবে, এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ববিদ মেকাইভারের একটি বাক্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যা আমরা গ্রহণ করতে পারি। লিখেছেন তিনি, '' আমরা যা তাই সংস্কৃতি''।[৪] আবার একেবারে সাম্প্রতিক এডোয়ার্ড সাঈদের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য, যদিও কবীর চৌধুরীর সংজ্ঞার সঙ্গে এর কিছুটা মিল আছে। তবে, তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন নন্দনতত্ত্বের ওপর যার মূল লক্ষ্য আনন্দ।[৫] ব্যাপক অর্থে অবশ্য মানুষের জীবন চর্যাটাই সংস্কৃতি। এবং সাহিত্য, শিল্পকলা, গান, নাটক - এসব কিছুই হচ্ছে সংস্কৃতির প্রকাশ মাধ্যম। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা গ্রহণ করলেও আমি আলোচনা করব এর কিছু প্রকাশ মাধ্যম নিয়ে মাত্র।

আন্দোলনের সংজ্ঞাও বিভিন্নজন দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। আন্দোলন বিশেষ করে সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা নিরুপন করেছেন মুনতাসীর মামুন এভাবে -

Dhaka University Institutional Repository

"সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি বহুলোকের অংশগ্রহণ, একক অংশ গ্রহণ নয়; অন্যপক্ষে, আকস্মিক ঘটনাজাত প্রতিক্রিয়াও আন্দোলন নয়। আন্দোলন, আমাদের অর্থে, পরিকল্পিত, লক্ষ্যনির্ভর এবং বহুলোকের অংশগ্রহণ। ব্যক্তিগত, যৌথ কর্মকান্ড কিছুটা সময় টিকে থাকলে তা আন্দোলনে রূপ নেয় তবে ঐ যৌথ কর্মকান্ড সংহত এবং সংগঠিত কিংবা স্বতস্ফূর্ত হতে পারে। আবার যদি তা বেশ কিছু লোকের মনে সচেতনতা ও কৌতুলহ জাগতে পারে, তা'হলে তাকে আমরা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সুতরাং সামাজিক আন্দোলন, "essentially involves sustained collective mobilization through either informal organization."[৬]

এ পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও সংজ্ঞা অনুরূপভাবে নির্ধারণ করা যায়, কেননা সংস্কৃতিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। রুডলফ হেবারলি ও এম. এস. এ. রাও -এর সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, "একটি সামাজিক আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন তার লক্ষ্য থাকে বিদ্যমান মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, ব্যবস্থার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন। আবার এটাও ঠিক, একই সময় এর বিপরীতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে প্রতিরোধও গড়ে উঠতে পারে। .....যেমন- কোন অভিজ্ঞতা ব্যক্তিমানসে এ ধারণা বা বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে যে, কোথাও অবিচার হয়েছে। তখন সে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা আন্দোলনের নেতার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েও তাতে যোগ দিতে পারে।"[৭]

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। কেননা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও আবেগজাত এবং তা স্থিতাবস্থা ভাঙ্গার জন্য করা হতে পারে। আবার এটাও ঠিক এ স্থিতাবস্থা ভাঙ্গার আন্দোলনের ওপর আঘাত এলে তা প্রতিরোধের সৃষ্টি হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার আলোচ্য সময়ে ঢাকা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা গড়ে উঠেছিল বাঙালির সংস্কৃতির ওপর কলোনির সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক কর্মধারাকে উজ্জীবিত করার মানসে। বাংলাদেশে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যেসব সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়েছে তার প্রকৃতিই ছিল সেরকম।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলা/ পূর্ব পাকিস্তান/ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বৈশিষ্ট্যময়। এর সঙ্গে রাজনীতির নিবিড় সম্পর্ক আছে, যেমনটি লিখেছেন ওয়াহিদুল হক, ''বাংলায় রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ কেটেছিল সাংস্কৃতিক জাগরণ।''[৮] পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, অন্তিমে একে অন্যকে প্রেরণা যুগিয়েছে, যে কারণে একটা সময় দেখা যায় যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ ছিলনা। কারণ উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক কর্মী তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের আগে অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, প্রণোদনা যুগিয়েছে। পরে রাজনৈতিক কর্মীরা এতে যোগ দিয়েছেন।[৯] যেমনটি লিখেছেন ওয়াহিদুল হক, ''যে মানুষই তখন সংস্কৃতি-কর্ম করেছে- বাংলায় লিখেছে, বলেছে, গেয়েছে বাঙালীর কথা বাংলার কথা, যে মানুষই এঁকেছে অভিনয় -আবৃত্তি করেছে মূর্তি গড়েছে বাংলার বাঙালীর সে এ দেশের পক্ষে এক দুর্বার রাজনীতি করেছে। যে রাজনৈতিক লড়াই লড়েছে সে সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াই লড়েছে, কেবলই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নয়।''[১০] এজন্য বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন অন্যমাত্রা পেয়েছে (উদাহরণস্বরূপ ভাষা আন্দোলন উল্লেখ্য)। এখানে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিছক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলনা, সব সময় প্রগতির পথে মানুষকে এগিয়ে নিতেও তা সহায়তা করেছে। ''পাকিস্তানী সর্ব প্রকার ষড়যন্ত্র বাঙালীর একটা পাষাণ প্রাকারে এসে বাধা পায়, পরাস্ত হয়। বাঙালীর যত ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই নিরাকরণ হয় একটি মাত্র ধারণার দ্বারা - সংস্কৃতি।''[১১] পূর্ব বাংলা/ পূর্ব পাকিস্তান/ বাংলাদেশে ধর্ম ব্যবসায়ী, প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন কখনো শক্তি অর্জন করতে পারেনি। বিশেষত শহরে বা ঢাকাতে। এটি শুধু আমার আলোচিত সময়কালে নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্বৈরাচারী গণআন্দোলনে এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে এ প্রতিরোধ বিভিন্ন ধারায় চলেছে। তবে, ওয়াহিদুল হকের ভাষায় আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা প্রতিরোধের ধারা কয়েকটি ক্ষেত্র ঘিরেই বেশি হয়েছে। যেমন, তাঁর ভাষায়, ''বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ কেবল একটিমাত্র খাত ধরে চলেনি। ভাষা আন্দোলন থেকে নানা শাখা নদী বেরিয়েছে, কত যে উপনদী এসে যুক্ত হয়েছে তাতে। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মূল প্রতিজ্ঞাগুলোকে কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এক. বাংলা ভাষার অবিভাজ্যতা ও সার্বজনীনতা

দুই. বাঙালি সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা

তিন. সাম্প্রদায়িকতার বিদূরণ, গণতন্ত্রের বিকাশ

চার. এই সমস্ত কিছুর সার্থক সম্পাদনের অস্ত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার

পাঁচ. এই সমস্ত সাধনের পথে পাকিস্তান কাঁটা দিলে পাকিস্তানকে প্রতিরোধ ও প্রয়োজনে অস্বীকার।''[১২]

এই অভিসন্দর্ভের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে ঢাকা শহর । এক্ষেত্রে বর্তমান ঢাকা শহরের সীমানাকে বোঝানো হচ্ছে, যদিও ১৯৫৮-৭১ সময়কালে এর পরিধি কম ছিল। আর পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান বলতে বর্তমান বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে।

ঢাকা মুঘল বাংলার প্রথম রাজধানী যা চারবার রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছে। পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র সব সময় থেকেছে ঢাকা।[১৩] এটি সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই আমার অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি '' ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ ১৯৫৮-৭১।'' বস্তুত, বেশীর ভাগ সময়ে যে কোন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আন্দোলন ঢাকা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। ঢাকায় যা শুরু হয়েছে, তা পরে পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকার বাইরেও যে কখনও কোন আন্দোলন হয়নি তা নয়। তবে, ঢাকা থেকে উৎসারিত আন্দোলনই ব্যাপকতা পেয়েছে। তাই আমার অভিসন্দর্ভে একটি বিশেষ সময়ের ঢাকার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

১৯৫৮ সাল এবং ১৯৭১ সাল আমাদের ইতিহাসের দু'টি মাইল ফলক। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। এর অভিঘাত ছিল সুদূর প্রসারী। এমন কি স্বাধীনতার পরও এ থেকে আমরা মুক্তি পাইনি। অন্যদিকে, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বাদ দিয়ে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের আলোচনা সম্ভব নয়। মুক্তিসংগ্রাম তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ পটভূমিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালে যার শুরু এবং

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অস্বীকার করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কিছু লেখালেখি হয়েছে, তবে এর পরিমান কম। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দু'টি গবেষণা, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ দু'টি হলো -

১. পূর্ব বাংলার রাজনীতি- সংস্কৃতি ও কবিতা।[১৪]

২. পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন।[১৫]

গ্রন্থ দুটো পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যাক লেখকদ্বয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে কিভাবে আলোচনা করেছেন, কোন বিষয়ে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। ''পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা'' গ্রন্থটির লেখক সাঈদ-উর রহমান। আলোচ্য গ্রন্থটি ''পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বাংলা কবিতাঃ ১৯৪৭-৭১'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের সংশোধিত, সংকুচিত ও পরিবর্তিত রূপ বলে লেখক উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য-প্রসঙ্গ কথা)। গবেষণার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ''পাকিস্তান-আমলে পূর্ব বাংলার জনমানসে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার যে- পরিবর্তন হয়েছে তার পটভূমিতে সে-সময়ের কবিতার পর্যালোচনাই এ গবেষণার লক্ষ্য। কবিতার তথা যে- কোন শিল্পকর্মের, শিকড় সমকালীন সমাজের গর্ভে প্রোথিত থাকে, এবং সমসাময়িক জীবনের আলো-বাতাসে বিকশিত হয়। অথচ, ইতিপূর্বে পূর্ব বাংলার কবিতা নিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে। সামগ্রিকভাবে ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে চারপাশের জীবনের সঙ্গে একে সম্পর্কিত করার কোনো চেষ্টা বিশেষ হয়নি। সেই অভাববোধই আমাকে উৎসাহিত করেছে এই গবেষণা-কর্মে''(প্রাগুক্ত)। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আলোচনার ক্ষেত্রে কবিতার ওপর তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। অবশ্য তিনি রাজনৈতিক -সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঘটনাবলীর বিবরণ দিলেও কি কারণে এসব ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোন তাত্ত্বিক আলোচনা করেননি। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক, যোগসূত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়না। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলায় উভয় আন্দোলন পরস্পর থেকে বিযুক্ত ছিলনা, বরং একে অন্যের পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

''পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন'' নামক গ্রন্থটির রচয়িতা রেজোয়ান সিদ্দিকী। এই বইটিতে লেখক ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সংগঠন, সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন কি অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মতই ছিল বা এই আন্দোলন কি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বা অন্তিমে কি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল- তা উল্লেখ করেননি। তাঁর এই গ্রন্থ তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে বটে কিন্তু আমরা জানি পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিছকই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলনা। অবশ্য উভয় গ্রন্থে রাজনৈতিক পটভূমিকা আলোচিত হয়েছে কিন্তু , তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যোগসূত্রটি অস্পষ্ট। লেখক পদ্ধতিগত দিক থেকে সমসাময়িক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ছাড়াও সাক্ষাৎকার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের কর্ম সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও বিভ্রান্ত করেছেন (পৃঃ ৭)। কিন্তু কেন, তা তিনি উল্লেখ করেন নি। এটি একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি। কারণ একজনের বিভ্রান্তি বা অতিরঞ্জন তখনই প্রমাণিত হবে যখন তা সমসাময়িক তথ্যে বিচার্য হবে। রেজোয়ান সিদ্দিকী সাংস্কৃতিক সংগঠন, সম্মেলনকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চালিকা শক্তি হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিছক কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলনা বিধায় সাংস্কৃতিক সংগঠন, সম্মেলন এর প্রধান চালিকা শক্তি হতে পারেনা। পূর্ব বাংলায় যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশেষ করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন (যেমন-ছাত্র ইউনিয়ন) সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগী সংগঠন/ সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ''সংস্কৃতি সংসদ'' '৬০- এর দশকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। সেজন্য দেখি '৬০-এর দশকে পুরো ইউরোপে যে ছাত্র আন্দোলন ও যুদ্ধ -বিরোধী (ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া) আন্দোলন গড়ে ওঠে তার প্রভাব পূর্ব বাংলার ছাত্র-সংগঠনগুলির ওপর পড়েছিল। ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তারা এসব মতাদর্শগুলি যুক্ত করেছিল। যেজন্য যুদ্ধবিরোধী গান, গণসঙ্গীত একটি বিশেষ মাত্রা অর্জন করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য/ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

রেজোয়ান সিদ্দিকী, সাঈদ-উর রহমানের বইকে মডেল হিসেবে নিয়েছেন। তবে অধ্যাপক রহমান যেখানে কবিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেখানে সিদ্দিকী সাংস্কৃতিক সংগঠন, সম্মেলনগুলির কর্মবিবরণের ওপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য শেষোক্ত বই অনেক তথ্য সমৃদ্ধ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় স্বাভাবিকভাবে ঢাকা শহর যা ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্র, সেটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসেনি এসব গ্রন্থে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তেমন কাজ হয়নি বিধায় ঢাকার ওপর আলাদাভাবে অভিসন্দর্ভ রচনার/ গবেষণার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে উল্লেখ্য, আমার অভিসন্দর্ভের পরিধি ততটা ব্যাপক নয়। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার অভিসন্দর্ভের বিষয় যা আগেই উল্লেখ করেছি, 'ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ ১৯৫৮-৭১'। আমার চেষ্টা হবে শুধুমাত্র ১৯৫৮-৭১ সময়কাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিবরণীই নয়, উপর্যুক্ত বিষয়গুলির আলোকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি বিবরণ প্রস্তুত করা। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে আমি নাটক, সঙ্গীত বিশেষত গণসঙ্গীত, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সম্মেলনকে গুরুত্ব দিয়েছি। তবে, মাঝে মাঝে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-সাহিত্যের বিষয়টি যে আসবে না তা নয়। কারণ সংস্কৃতির প্রকাশ মাধ্যমের প্রতিটি বিষয়ই কোন না কোন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এখানে উল্লেখ্য, সমকালীন রাজনীতি বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই আমি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বিচার করতে চেয়েছি এবং এর মধ্যে যোগসূত্রটি উন্মোচন করতে চেয়েছি। দেখাতে চেয়েছি বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ ও প্রগতি-তে সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

এ গবেষণাকর্মে উপাদান হিসেবে আমি গ্রন্থ, সাময়িকী, দৈনিক পত্রিকা, পূর্বসুরীদের গবেষণা প্রভৃতির ওপরই গুরুত্ব দিয়েছি। কিন্তু একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সাক্ষাৎকারও উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে পাঁচটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলি হচ্ছে- ভূমিকা, প্রথম অধ্যায় ঃ পটভূমি (১৯৪৭-১৯৫৮), দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সামরিক শাসন ও এর অভিঘাত (১৯৫৮-১৯৬৫), তৃতীয় অধ্যায় ঃ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি (১৯৬৬-১৯৬৯),

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ স্বাধীনতার পথে (১৯৭০-১৯৭১) এবং শেষ বা পঞ্চম অধ্যায়ঃ উপসংহার।

তথ্যপঞ্জী

১. কবীর চৌধুরী 'বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সংকট ঃ কৃত্তিম সমস্যা (?)', *আবহমান বাংলা*, পৃঃ ৩৯৮।

২. ''কোন একটি জনগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তাদের জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার, তাদের ভাষা-সাহিত্য-চিত্রকলা-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি মিলেই তাদের সংস্কৃতি।'' *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯৬।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Edited by Alan Barnard & Jonathan Spencer, 'Culture', *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology* , London, 1996.

৪. 'Culture is what we are' -ম্যাকাইভারের উদ্ধৃতি , আবুল মোমেন, 'সমাজ প্রগতি, গণতন্ত্রায়নে সংস্কৃতির ভূমিকা', *সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৪১।

৫. "First of all it means all those practices, like the arts of description, communication and representation that have relative autonomy from the economic, social & political realms and that often exist in aesthetic forms, one of whose principal aims is pleasure." Edward W. Said, *Culture and Imperialism*, London, 1993, P. XII.

৬. মুনতাসীর মামুন ঃ *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৩১-২।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩২।

৮. ওয়াহিদুল হক ঃ *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, লোকবক্তৃতামালা-৭। মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০ পৃঃ ১৮।

৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়- *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ২।

১০. ওয়াহিদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০ -২১।

১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৭৯ । *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান*, ঢাকা, ১৯৯৮ এবং *পূর্ববাংলার সভাসমিতি*, ঢাকা, ১৯৮৪।

১৪. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি- সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা, ১৯৮৩।

১৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি
(১৯৪৭-১৯৫৮)

১. রাজনীতি

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম হয় দু'টি রাষ্ট্রের- পাকিস্তান (১৪ আগষ্ট) ও ভারত (১৫ আগষ্ট)। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি গঠিত হয় বিশালায়তন ভারতবর্ষের দু'প্রান্তে অবস্থিত দু'টি ভিন্ন ভুখন্ড নিয়ে। এর পশ্চিমাংশ ''পশ্চিম পাকিস্তান'' এবং পূর্বাংশ ''পূর্ব বাংলা'' (১৯৫৬ সালে এর নতুন নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান) নামে অভিহিত হয়। দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান ছাড়াও নৃতত্ত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, আর্থ-সামাজিক কাঠামো অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনধারা বা বোধ উভয় অংশে ভিন্ন ছিল। এতসব পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলিম লীগের আহবানে সাড়া দিয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, একে সফল করেছিল। অবশ্য এর পেছনে মূল কারণ ছিল তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা। বা যেমনটি লিখেছেন মুনতাসীর মামুন, যে এর ফলে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিকতার ''প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়ে যায় বাঙালি প্রশ্ন, বরং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্যান ইসলামিজম। পাকিস্তান শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকই নয়, উঠতি মধ্যবিত্তের কাছেও ছিল ভারতের বিকল্প যেখানে নিজের প্রসারণের সুযোগ তার থাকবে।''[১] কিন্তু অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হলো। ফলে ক্রমে তারা তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ে সোচ্চার হতে থাকে। আকাঙ্খিত, সদ্য-স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে অচিরেই কেন পাকিস্তানতত্ত্ব বিরোধী আন্দোলন শুরু হলো তা বোঝার জন্য রাষ্ট্রের পরিকল্পক ও শাসনভার গ্রহণকারী দল অর্থাৎ মুসলিম লীগ-এর নেতাদের তথা তাদের শাসনের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা নেয়া প্রয়োজন।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রীর স্থলে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন। এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। অর্থাৎ তিনি একনায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। অবশ্য পাকিস্তানের উপযোগী করে গৃহীত ১৯৩৫ সালের ভারত

Dhaka University Institutional Repository

শাসন আইন অনুসারেই তিনি সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যাবতীয় সাংবিধানিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। এমনকি প্রয়োজনানুযায়ী এই আইনকে পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনের অধিকার তাঁকে দেয়া হয়। কিন্তু নির্বাহী ক্ষমতা যথার্থভাবে বন্টন না করে তিনি কুক্ষিগত করেন। সুতরাং, যদিও গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনী ভোটাভুটির মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রটি সৃষ্টির সাথে সাথে এখানে অগণতান্ত্রিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পদগুলি ছিল অবাঙালিদের হাতে। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতাও ছিল অবাঙালি আমলাদের হাতে। সেনাবাহিনীর অবস্থাও ছিল তথৈবচ। ফলে পুরো রাষ্ট্রটি তাদের দখলে চলে যায়।[২] এভাবে দখল হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রে তখন আর দায়বদ্ধতা বা স্বচ্ছতা থাকেনা। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। গভর্ণর জেনারেল হিসেবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তেরোমাস ক্ষমতায় (মৃত্যু ১১-৯-৪৮) থাকলেও পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য কোন পদক্ষেপ তিনি নেননি। 'কায়েদে আযম' (মহান নেতা) হিসেবে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পৃথক দু'টি অন্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুসমন্বিত পদক্ষেপের উদ্যোগ গ্রহণ তাঁর পক্ষে একান্ত বান্ছনীয় ছিল। কিন্তু তা তিনি করেননি। ''তাঁর আমলে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি পর্যন্ত শুরু হয়নি। সংবিধান বিষয়ে কোন পথ-নির্দেশনাও (guide-line) তিনি দেননি।'' সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানদের সমর্থনের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। করাচিকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচিত করে শিল্প, পুঁজি, ও রাজনীতিকে পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক করেন। এভাবে তিনি পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সূত্রপাত করে যান, যা পরবর্তীতে মহীরূহের আকার ধারণ করে। তাঁর একনায়কমূলক, গণতন্ত্রপরিপন্থী মনোভাব ও পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরবর্তী ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গকে অনুকরণে অনুপ্রাণিত করেছিল, এটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

জিন্নাহর মৃত্যুর পর থেকে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একদিকে ছিল আমলা, আমলা রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। অন্যদিকে, পাকিস্তান আন্দোলনে যেসব

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের ক্ষমতা রক্ষার প্রচেষ্টা। জন্ম লগ্নে পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু ছিল। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং ''জাতির জনক'' হওয়ার কারণে আমলা গোষ্ঠীর তখনই রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জ করার সাহস ছিলনা। জিন্নাহ্‌র অকাল মৃত্যুর পর সে পথ সুগম হলো। গুলাম মুহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রমুখ আমলা ক্ষমতা করায়ত্তে এগিয়ে এলেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তা চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। ফলে ক্ষমতায় এলেন গুলাম মুহাম্মদ, আর হটে গেলেন খাজা নাজিমুদ্দীন, সোহরাওয়ার্দী, চুন্দ্রিগড়, খান সাহেব প্রমুখ।[৩] এ ধারায়ই ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন।

ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ১২০০ মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব বাংলা । সেখানেও একই ধারা ছিল প্রবাহিত। প্রাদেশিক পরিষদে ছিল রাজনৈতিক প্রভুত্ব নিয়ে লড়াই। আবার সামগ্রিকভাবে ছিল কেন্দ্র বা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ। পূর্ব বাংলায় যারা মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন কেন্দ্রেরই সমর্থক। ফলে, পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। প্রথমে, যারা রাজনীতি করছিলেন তারা প্রায় সবাই ছিলেন মুসলিম লীগের সদস্য। কিন্তু, এই মুসলিম লীগের একাংশের মধ্যেই বিশেষ করে তরুণ বাঙালিদের মধ্যে যে প্রশ্নগুলি দেখা দেয়। তা' হলো- সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা ক্ষমতা থেকে দূরে থাকবে কেন ? সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, সংস্কৃতি কেন প্রতিফলিত হবেনা সামগ্রিক কর্মকান্ডে ? কেন তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হবে ? এসব প্রশ্নেই মুসলিম লীগের আনুগত্যের প্রশ্নে চিড় ধরে এবং মুসলিম লীগের কর্মীরাই আনুগত্য ত্যাগ করে নতুন গ্রুপ বা দল গঠন করে।[৪] এখানে উল্লেখ্য যে দেশ বিভাগ পরবর্তী কালে এদেশের রাজনীতিতে দু'টি ধারা প্রবহমান ছিল। একটি চরম ডানপন্থী ও অন্যটি চরম বামপন্থী। চরম ডানপন্থী ধারার অর্ন্তভূক্ত ছিল মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী। যদিও উভয় দল ডানপন্থী তথাপি তাদের মধ্যকার পার্থক্য ছিল বিস্তর। অন্যদিকে বামপন্থী দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কমিউনিষ্ট পার্টি সহ অন্যান্য দল।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই দেখা যায় শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত। আর মুসলিম লীগের সব চাইতে বড় অর্জন যেহেতু পাকিস্তান সেহেতু এই সময়ে লীগের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন। এর পাশাপাশি বামপন্থী দলগুলো বিশেষত কমিউনিষ্ট পার্টি কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বৃহৎ পরিসরে সাধারণ মানুষের/ জনগণের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই পটভূমিতে একটি মডারেট/ মধ্যপন্থী ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী লীগ। যদিও ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে যাত্রা শুরু করেলেও অল্পদিনের মধ্যেই 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেবার উদ্দেশ্যে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করা হয়।

আওয়ামী লীগ এ অঞ্চলের মানুষের, পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, এটাকে তুলে ধরে জনমত সংগঠিত করতে থাকে। এবং ধীরে ধীরে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

১.১ পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গঠনের প্রচেষ্টা

প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ শাসন করছে পাকিস্তান। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃত্ব প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলাকে স্থায়ী উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ সহ বাঙালিদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। কারণ তারা বুঝেছিল, ধর্ম ছাড়া পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের ১২'শ মাইল দূরে অবস্থিত দুটি ভিন্ন ভূখন্ডের মধ্যে কোন মিল নেই। সুতরাং কেবল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন, ঔপনিবেশিক শোষণ-নির্যাতনের দ্বারা একে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। তাই তারা পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী ইসলামিক রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। এ লক্ষে প্রথমেই তারা বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। কিন্তু এ সময় কেন্দ্রের অনুগত পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ অঞ্চলের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম হয়নি। বলা যায় তারা চেষ্টাও করেনি। কেননা, পূর্ব বাংলার ন্যায্য হিস্যা বুঝে নেয়ার চেয়ে তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার

Dhaka University Institutional Repository

লোভই মূখ্য ছিল। ফলে বাঙালি জাতি আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্ববিরোধিতা আবিষ্কার করতে পেরে তারা সচেতন হয়। এই পটভূমিতে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটে। বিকাশমান শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দল গঠন করে আন্দোলন শুরু করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্রবোধ গড়ে উঠতো না, যদি অন্তত কিছুটা হলেও মুসলিম লীগ সরকারের কার্যক্রমে তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটতো। ক্রমে লীগ প্রাধান্য, জনসমর্থন হারাতে থাকে। পূর্ব বাংলায় এই রাজনৈতিক পরিবর্তনে আরো সহায়ক হয়েছিল ''পূর্ব বাংলা জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন''। এটি পাসের ফলে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয় পূর্ব বাংলায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। এবং এই ভূস্বামী ও পুঁজিপতি শ্রেণী মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশে কাঠামোগত পার্থক্য সূচিত হয়। কেননা, জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণে জমিদার, মধ্যস্বত্ত্বভোগী অভিজাত শ্রেণী পূর্ব বাংলার সমাজে প্রতিপত্তি হারান এবং উদীয়মান শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখানকার সমাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে থাকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রেও মেরুকরণ ঘটে। আগে সেখানে দল হিসেবে ছিল মুসলিম লীগ ও তার ছাত্র সংগঠন এখন তা থেকে উদ্ভব হয় বিভিন্ন দল ও ছাত্র সংগঠনের। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভালো, কমিউনিষ্ট পার্টি আগে থেকেই কাজ করে যাচ্ছিল।

নতুন দলগুলোর মধ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'সিভিল লিবার্টিস লীগ' যা বেশিদিন টিকে থাকেনি।[৫] এর পর গঠিত হয় গুরুত্বপূর্ণ যে দল তা'হলো-

আওয়ামী লীগ

মুসলিম লীগের অপেক্ষাকৃত প্রগতিবাদী তরুণ কর্মীরা ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠন করেন এই সংগঠন। দলটিতে বিভিন্ন আদর্শের অনুসারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাবেশ ঘটেছিল। তবে এর লক্ষণীয় দিক হল অনভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে

Dhaka University Institutional Repository

আগতরা এর নেতৃত্বে ছিলেন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এখানেই এর নেতৃত্বের মৌলিক পার্থক্য সূচিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম না হলেও দলটির কর্মসূচীতে পূর্ববাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছিল।[৬] ফলে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ বিরোধী দলটি গ্রহণযোগ্যতা লাভে সমর্থ হয় এবং এর কার্যক্রম দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিলে দলটির গ্রহণযোগ্যতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে বেড়ে যায়। তাছাড়া পরবর্তীতে দল থেকে প্রবীণ অনেক নেতা কর্মী বেরিয়ে গেলে (ন্যাপ, ন্যাশনাল লীগ গঠন করেন যথাক্রমে ভাষানী ও আতাউর রহমান খান) দলটির নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃবৃন্দ আসে এবং একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়।

পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি

ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির একটি অংশ ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ 'পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি' গঠন করে। এর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে স্থানীয় শাখার সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ এবং তাই অসাম্প্রদায়িক, বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি এসময় পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু 'বি. টি. রণদীভে' লাইন নামক নীতি (পরবর্তীতে ভ্রান্ত বলে বিবেচিত) অনুসরণ করে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করলে শহরাঞ্চলে শ্রমিক, মধ্যশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সরকার তাদের দমনে ব্যাপক দমন নীতি গ্রহণ করলে তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তারা গোপনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়।[৭]

গণতন্ত্রী দল (ডেমোক্রেটিক পার্টি)

১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে তখন স্বনামে প্রকাশ্যে রাজনীতি সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগে হিন্দু কর্মীদের অংশগ্রহণ সম্ভব ছিলনা বিধায় এ দলটি গঠিত হয়। ''এই দলের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলার সবচেয়ে প্রগতিশীল

Dhaka University Institutional Repository

মতাদর্শ''[৮]। দলটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও এর সহযোগীদের বিনাশ, পাকিস্তানে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ রোধ বিদেশী ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলোর জাতীয়করণ, ক্ষতিপূরণ ব্যতিত জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টন ইত্যাদি।[৯] ফলে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলটিকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দান করে ফলে গণতন্ত্রী দল আওয়ামী লীগে যোগ দেয় এবং এভাবে দলীয় লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়।

কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে এস পি)

১৯৫৩ সালে ২৩ আগষ্ট একটি অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটি ছিল মূলত কৃষক-প্রজা পার্টির নতুন সংস্করণ। মুসলিম লীগের সুবিধা বঞ্চিত বহু নেতা-কর্মী এতে যোগ দেন। এদের অধিকাংশ ছিলেন প্রবীণ ও অভিজাত শ্রেণীভুক্ত।[১০]

নিজাম-ই-ইসলামী

১৯৫৩ সালের১ আগস্ট গঠিত এই রাজনৈতিক দলটি পূর্বে 'জমিয়তে ওলামায়ে এসলাম' নামক ধর্মীয় সংগঠন ছিল।[১১] এ দলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ব্যক্তিবর্গ থাকলেও প্রধানত মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত উলেমাবৃন্দ এবং বিত্তশালী মুসলমানেরা এর নেতৃত্বে ছিলেন। দলটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।[১২]

ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)

১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই গঠিত এই রাজনৈতিক দলে আওয়ামী লীগে যোগদানকৃত বামপন্থী নেতৃবৃন্দসহ কমিউনিষ্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী যোগ দেয়। নবগঠিত ন্যাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ঃ

''১. পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিত করণ ;

২. জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন ;

৩. নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উভয় অংশের স্বায়ত্বশাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা----।''[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমে দলটি জনসমর্থন বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে সক্ষম হয়। অবশ্য পরবর্তীতে দলটিতে ভাঙন দেখা দেয়।

খিলাফতে রব্বানী পার্টি

পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ প্রবর্তনে মুসলিম লীগের ব্যর্থতা এ দলটিকে আত্মপ্রকাশে উজ্জীবিত করে। ১৯৫৩ সালে আবুল হাশিমের নেতৃত্বে দলটি গঠিত হয় এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি এর সভাপতি ছিলেন।[১৪]

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস সদস্যদের সমন্বয়ে এই দলটি গঠিত হয়। স্বভাবতই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক দল শাসিত পাকিস্তানে এই দলটির যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। ফলে এ দলের অনেক সদস্য অন্যান্য দলে যোগ দেন এবং ১৯৫৮-র পর এটির কার্যক্রম দেখা যায়না। উল্লেখ্য যে কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালে প্রথম গণ পরিষদে বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবী জানান।[১৫]

পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় প্রগতিশীল, বামপন্থী ছাত্র-যুবকদের প্রচেষ্টায় এই অসাম্প্রদায়িক যুব সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর মুসলিম লীগ বিরোধী প্রথম সংগঠন ও লীগের সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ হিসেবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমে এর কার্যক্রম ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ, রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি সংগঠনটি। সংক্ষেপে এই সংগঠনের মুল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির বিকাশ, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, বিদেশী শোষণের অবসান, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসন।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকায় এই ছাত্র সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রচিত দশটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং দশটি সুনির্দিষ্ট দাবী সংগঠনটি তুলে ধরে।[১৮]

প্রথমদিকে ডান ও বামপন্থী ছাত্ররা এতে যোগ দেয়। মুসলিম লীগ বিরোধী হলেও এটি পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক ছিলনা। সংগঠনটির নামকরণে ''মুসলিম'' শব্দটি থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। অবশ্য এটি যে কমিউনিষ্টপন্থী বা প্রভাবাধীন নয়, তা বোঝানোও এর কারণ হতে পারে। যাই হোক, পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে ''মুসলিম'' শব্দটি বাদ দিয়ে একে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনের রূপ প্রদান করলে ক্রমে তা পূর্ব বাংলার একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে কমিউনিষ্ট কর্মীরা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। সরকার কর্তৃক সে সময় ১৪৪ ধারা জারী থাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড়ে ভাসমান গ্রীণবোটে মার্চের ২৭ ও ২৮ তারিখে তারা সম্মিলিত হয়ে এটি গঠন করে। বস্তুত, ১৯৫৫ পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগে অমুসলমান কর্মীদের যোগদান সম্ভব ছিলনা বলে এরূপ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা থেকে এটি গঠিত হয়। সংগঠনটির মূলমন্ত্র ছিল সামাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধীতা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি চর্চা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সবার জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি।[১৯]

ঢাকা সহ বেশ কয়েকটি মহকুমা ও জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছাত্র-যুবকদের এই সংগঠনটি ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বলা যায় এই আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব ছিল তাদের হাতে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র-ইউনিয়ন

১৯৫২ সালে ২৬ এপ্রিল ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরে প্রগতিশীল ছাত্র-কর্মীদের উদ্যোগে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসে এর নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক, আপোষহীন, রাজনৈতিক দল ও নেতার প্রভাবমুক্ত এবং সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবিরোধী সংগঠনের

Dhaka University Institutional Repository

তীব্র প্রয়োজনীয়তা থেকে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। শেষ পর্যন্ত এটি ন্যাপ-এর অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় আরো কিছু ছাত্র সংগঠনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এগুলো বেশিদিন সচল থাকেনি। এগুলো হচ্ছে- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন,[২০] ছাত্র ফেডারেশন,[২১] ছাত্র সংঘ,[২২] ছাত্রী সংঘ[২৩] ইত্যাদি। এসব সংগঠন ক্ষণস্থায়ী হলেও রাজনীতিতে সচলতা সৃষ্টি করেছিল, মেরুকরণে সহায়তা করেছিল।

১.২ যুক্তফ্রন্ট গঠন

প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। কেননা, এই আন্দোলনে ভাষা প্রশ্নের সঙ্গে রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবীসমূহ যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৮-৫১ কালপর্বে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের নিজ নিজ দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই দাবী সমূহ আদায়ে সচেষ্ট হয়। ক্রমে ১৯৫২ -তে এসে ভাষা আন্দোলন সর্বস্তরের জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়ে পূর্ববাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাঙালির কোন বিক্ষোভ, আন্দোলন এর পূর্বে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হয়নি। ভাষা আন্দোলন সকল পেশার মানুষ- ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতির মধ্যে যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে, পরবর্তী আন্দোলন সমূহে আমরা সে ঐতিহ্যেরই পূনরাবৃত্তায়ন দেখি। বাঙালির এই জাগরণে ছাত্র সমাজ ও সংঠনগুলির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের আত্মদানই একে বেগবান করেছিল। যাই হোক, আন্দোলনের ফলে বহু ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী জেলে যান। নির্যাতন ও দমননীতির কারণে আন্দোলন, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে, ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচনে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত পরিষদ) গঠনের উদাহরণ ও এর বিজয় পূর্ব বাংলার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ''যুক্তফ্রন্ট'' গঠনে উৎসাহিত করে। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের মোকাবেলার জন্য যা অপরিহার্য ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল বিশেষত আওয়ামী মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগের জনপ্রিয়তা মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব করায় তারা ভীত হয়ে পড়ে। ফলে তারা পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন প্রক্রিয়া পিছাতে থাকে।[২৪]

অচিরেই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিসহ নির্বাচনের দাবীতে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক গণ আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নির্বাচন ঘোষণায় বাধ্য হয়। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব বাংলার আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি ও নেজামে এসলামী যুক্তফ্রন্ট গঠন করে এবং ২১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন পরবর্তীতে বাঙালির সব আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়। ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনেও মূল প্রেরণা শক্তি ছিল এটি। তাই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে ২১ টি দফা প্রণয়ন করে ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, শহীদ মিনার নির্মাণ, এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারী সরকারি ছুটি ঘোষণা বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়াও ২১ দফার মূল কথা ছিল পূর্ব বাংলার পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং গণতন্ত্র।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[২৫] "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় যে ক্ষোভ ক্রমে পুঞ্জিভুত হচ্ছিল, এই বিজয় ছিল তার সমন্বিত এবং সর্বোচ্চ প্রকাশ। "এতে করে পূর্ব বাংলার জনগণের ভবিষ্যত মানস প্রবণতাটিও স্পষ্ট হয়ে যায়।"[২৬] নির্বাচনে বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করলেও, এরা ছিল মূলতঃ দুটি পক্ষে বিভক্ত - ক. মুসলিম লীগ এবং খ. যুক্তফ্রন্ট ভুক্ত ও এর সহযোগী দলসমূহ। এসব দলগুলির নির্বাচনী ইস্তেহার থেকে এদের প্যাটার্ণ বোঝা যায়।[২৭]

ক. চরিত্রগত দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ ছিল ডানপন্থী। নির্বাচনে এর পতন ঘটে। কারণ এটি পূর্ব বাংলায় জনশাসন প্রবর্তন করতে পারেনি। তাছাড়া যে আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসনের চেষ্টা করেনি। এরপর এ দলটি এখানে আর প্রাধান্য অর্জনে সক্ষম হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

খ. যুক্তফ্রন্টভুক্ত দলগুলির মধ্যে মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একত্রিত হয়ে জোট গঠন করে। তন্মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক- শ্রমিক পার্টি ছিল মধ্যপন্থী। যুক্তপ্রন্টের অপর শরিক দল নেজামে এসলামী ছিল ডানপন্থী। প্রশ্ন হচ্ছে, যুক্তফ্রন্টে এই দলটি কেন এলো ? বস্তুত, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিশ্চিত সাফল্য বুঝতে পেরেই দলটি ফ্রন্টে সামিল হয়। এক্ষেত্রে কোন নীতি বা আদর্শ ছিলনা।[২৮]

যুক্তফ্রন্টের সহযোগীদল এবং ছাত্রফ্রন্ট গুলিও ছিল মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী। বস্তুতঃ যুক্তফ্রন্টের মূল উদ্যোক্তা ছিল যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। এই ছাত্র-ফ্রন্ট গুলি যদিও বামপন্থী কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেসময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা মধ্যপন্থাকে গ্রহণ করেছিল এবং যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জানায়। বামপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি ফ্রন্টে ছিলনা। কে এস পি ও নিজাম-ই-ইসলামীর বিরোধীতার কারণে এসব দলকে ফ্রন্টভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, সরকারের ব্যাপক দমননীতির ফলে প্রকাশ্য রাজনীতি কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য নিষিদ্ধ ছিল।[২৯] কারণ, সাম্প্রদায়িক ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট পার্টিকে মেনে নেয়া অসম্ভব ছিল। এসব বাধা বিরোধীতার ফলে দেখা যায় যুক্তফ্রন্টভুক্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে নমিনেশন পান ১০ জন কমিউনিষ্ট পার্টি, ১০ জন গণতন্ত্রী দল ও ১৫ জন যুবলীগ সদস্য।[৩০] খিলাফতে রব্বানী পার্টিকেও যুক্তফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু এ দলটিও ফ্রন্টের সহযোগী দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেয়।

প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ মধ্যপন্থাকে গ্রহণ করে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার পক্ষে রায় দেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল-

১. মধ্যপন্থার বিজয়

২. পশ্চিম পাকিস্তানী আধিপত্য বজায়ের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

৩. আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৯৪৭ সালে গঠিত হয়েছিল প্রথম গণপরিষদ এবং এতে মুসলিম লীগ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।[৩১] ১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। এবং এতে পাকিস্তানের উত্তর অংশ থেকে সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত হয়। এই দ্বিতীয় গণপরিষদে ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। একটি স্বাধীন দেশে সুদীর্ঘ ৯

Dhaka University Institutional Repository

বছর লেগেছে সংবিধান প্রণয়ন করতে। কারণ, এখানে আমলাতান্ত্রিক শাসন চলছে এবং তাদের ক্ষমতা দৃঢ় হয়েছে। তাদের ক্ষমতা খর্ব হবার ভয়ে তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দেরী করছিল। পক্ষান্তরে, এর ফলে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। গণতন্ত্রের পথে যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অথচ প্রায় একই সঙ্গে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতে এর আগেই সংবিধান প্রণীত হয়ে গেছে।

যাই হোক, এই সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম দাবী পূর্ব বাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্বশাসন সহ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সমতা বিধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এছাড়াও পাকিস্তানকে ''ইসলামী প্রজাতন্ত্র'' এবং পূর্ব বাংলাকে ''পূর্ব পাকিস্তান'' রূপে ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষ তার কাংখিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে মুক্তি পেতে যাচ্ছিল, তা সম্ভব হয়নি। বস্তুত, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরংকুশ বিজয় শাসকগোষ্ঠীকে ভীত করে তোলে। অবশেষে, যুক্তফ্রন্ট নেতবৃন্দের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সরকারি চক্রান্তে ৩০ মে, ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির পৃথক অস্তিত্ব/ সত্ত্বা বিলুপ্ত করে সেখানে এক-ইউনিট চালু করেন। উদ্দেশ্য, সংখ্যাগরিষ্ট হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। আর শাসকগোষ্ঠীর এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মেনে নেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদেরা। অথচ তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পতিবাদ জানালে, প্রতিরোধ করলে পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতো।[৩২]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রাধান্য বিস্তারকারী দল ছিল একটিই - মুসলিম লীগ। তার বিপরীতে আরেকটি দল ছিল বটে, কিন্তু প্রাধান্য বিস্তারকারী নয় এবং তখনও গণসংগঠনে পরিণত হয়নি - তা'হলো কমিউনিষ্ট পার্টি। দু'টি দলের অবস্থান ছিল দু' মেরুতে।

১৯৪৮ -এর পরে মুসলিম লীগ ভেঙ্গে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগ। বাম ভাবধারায় এ সময়ের উল্লেখযোগ্য দল ন্যাপ। অন্যদিকে বেশ কিছু ছাত্র সংগঠনেরও সৃষ্টি হয়, যেমন- ছাত্র লীগ, বা ছাত্র ইউনিয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর বিভিন্ন উদ্দেশ্য, কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে তৎকালীন ঢাকা তথা পূর্ব বাংলায় তিনটি রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি হয়েছে। একটি রক্ষণশীল ধারা যার মধ্যে অন্তর্গত মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নিজাম-ই-ইসলামী প্রভৃতি। মধ্যপন্থায় আওয়ামী লীগ, কে. এস. পি প্রভৃতি। বাম ধারায় ছিল কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ। যুব সংগঠনগুলিও একেক ধারায় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহে বাম ও মধ্য ধারায় মাঝে মাঝে ঐক্য হয়েছে ডানপন্থী দল বা কখনও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ যুক্তফ্রন্ট, যদিও তা বেশিদিন টেকেনি।

১.৩ ১৯৪৭-১৯৫৮ ।। একদশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অভিঘাত

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় পাকিস্তানের উভয় অংশে বিরাট অভিঘাত সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তান মুসলিম লীগ সব সময় পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের (পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগসহ) তাদের অধঃস্তন মনে করতো। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট কারো অধঃস্তন নয়। কেননা এ বিজয়ের ফলে পরিষদে এটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ এটি মেনে নিতে পারছিল না। ফলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরাবার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। যুক্তফ্রন্টও নিজদের মধ্যে ক্ষমতায় যাবার জন্য দ্বন্দ্বের ফলে আর তাদের ঐক্য ধরে রাখতে পারল না। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবার পর কখনো কৃষক-শ্রমিক পার্টি আবার কখনো আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়। "এভাবে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্ণরের শাসন চালু হয়। ১৯৫৮ সালের বাজেটের ব্যাপারে চারটি মন্ত্রিএসভার পতন ঘটে। কিন্তু আগষ্ট পর্যন্ত বাজেট পাস সম্ভব হয় না। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে আইন পরিষদে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় এবং অক্টোবরে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে আইন পরিষদের অবসান ঘটে।"[৩৩] উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের সুযোগ করে দেয়, সামরিক শাসনের পথ সুগম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদ ও আমলা শাসন দুটি মিলে পুরো পাকিস্তান শাসন করতে চেয়েছিল। ধর্মকে সামনে রেখে সাধারণ জনগণকে একত্রিত করে তাঁদের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের রাজনীতির ধরণ ছিল রক্ষণশীল, জনস্বার্থের প্রতিকূল। ১৯৫৮ পর্যন্ত তাই আমরা দেখি সংসদীয় শাসন বিস্তারের অবকাশ থাকলেও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগের আমলা ও রাজনীতিবিদেরা নানা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরও অংশীদারিত্ব ছিল। কেন্দ্রের প্রতি অনুগত পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ ও সেখানে অপরাপর রাজনীতিবিদেরা বারবার ক্ষমতায় যাবার জন্য অপোষ করেছে। কারণ আমরা দেখি, এ সময় কালে (১৯৪৭-৫৮)-র মধ্যে ৫২, ৫৪ ও ৫৬ সালের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলিকে তারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সংহত করতে পারেননি। এসব ব্যর্থতা সত্ত্বেও এসময়কালে এসব অর্জনের নির্যাসটি ঘুরে ফিরে সব সময় সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে। বলা যেতে পারে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করা ও ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র নির্মাণে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতে বাধা দেয়ার ফলে বাঙালিদের মধ্যে এই বোধেরই জন্ম হলো যে, বাঙালিকে তার ন্যায্য অধিকার কখনই দেয়া হবেনা। এবং এজন্য তাকে দুস্তর পথ পেরুতে হবে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল তা আরো স্পষ্ট করল। কিন্তু এর অন্য একটি দিকও ছিল। তা'হলো, সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদদের ওপর আস্থা সৃষ্টির বিষয়টি ছিল। আরো ছিল রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশ্নটি। অনুন্নত, অশিক্ষিত ও দরিদ্র পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল উন্নয়ন, শিক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য। মাত্র দশ বছরের মধ্যে অন্য রাষ্ট্র সৃষ্টি তার কল্পনার মধ্যেও ছিলনা। যদিও ক্ষোভের বিষয়টি উচ্চারিত হচ্ছিল বারবার। ফলে, রাজনীতিবিদদের দায়িত্বহীনতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে তাদের আকাঙ্খার ব্যর্থতাই পূনরায় নতুনভাবে রাজনীতি চর্চায় উজ্জীবিত করেছিল, বিজয় এনে দিয়েছিল। এই বোধটিরই প্রকাশ দেখি আমরা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে।

Dhaka University Institutional Repository

২ . সংস্কৃতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে বাঙালিরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। তারা যে প্রতারিত হয়েছে অচিরেই এই নির্মম সত্যটি বুঝতে পেরে মোহভঙ্গের পালা শুরু হয়। আর বাংলা ভাষার ওপর আঘাতের ফলে এ চেতনা ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে। ফলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এসব দলে প্রধানত প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত তরুণ ছাত্র-রাজনৈতিক কর্মীদের সমাবেশ ঘটেছিল।[৩৪] এসব রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন নীতি-আদর্শ, ক্ষমতার প্রশ্নে নানা রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন চলেছে। কিন্তু এরমধ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত, প্রতারিত, নিষ্পেষিত হবার বোধ থেকে জনমনে সুপ্ত ক্ষোভগুলি প্রকাশ্যে রূপ নিতে থাকে। কিন্তু, রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণে জনগণকে আরো সচেতন করে তোলা, বিভিন্নভাবে জনমত সংগঠন করার বিষয়টি সম্ভব হচ্ছিল না। এর ফলে ১৯৪৭-৫৮ কালপর্বে তারা কাংখিত অর্জনগুলোও ঠিকভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় সাংস্কৃতিক কর্মীরা মানুষের সাংস্কৃতিক বোধ, চিন্তা অর্থাৎ সাংস্কৃতিকভাবে তারা যে শোষিত হচ্ছে, তাদের সত্তা, অস্তিত্ব যে সংকটের সম্মুখীন - এ বিষয়টি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। অর্থাৎ মূল কথা হল এই যে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা করতে পেরেছে তা রাজনীতি থেকে একেবারে বিযুক্ত ছিলনা। কারণ রাজনীতিবিদেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বৈষম্য-শোষণের বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর সাংস্কৃতিক কর্মীরা সেই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট, সংহত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যই নয়, সাংস্কৃতিক শোষণেও বাঙালির অস্তিত্ব যে বিপন্ন, সংকটের সম্মুখীন সে বার্তা সাংস্কৃতিক কর্মীরা জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সচেতন, ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও সম্মেলনের মাধ্যমে। আমরা লক্ষ্য করি, এসব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলনা। যারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন করছেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন করছেন তার মধ্যেও রাজনীতি ছিল। এ প্রসঙ্গে কলিম শরাফী বলেন, ''পলিটিক্যালি মোটিভেটেড মানে পলিটিক্যালি

Dhaka University Institutional Repository

এডুকেটেড, সচেতন কর্মীরাই সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংস্কৃতিক আন্দোলনের চালিকা শক্তি ছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল লোককে জাগানো। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে এটি সম্ভব নয়। এই চেতনা ছিল বলেই সাংস্কৃতিক কর্মীরা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এই চেতনা প্রসারের জন্য।''[৩৫] আবার, যাঁরা রাজনীতির কথা বলেছেন তারাও সংস্কৃতিতে বাদ দিয়ে কোন কথা বলেননি। এ সময়ে সংস্কৃতি ও রাজনীতি পরস্পরকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তার একটি বড় উদাহরণ ভাষা আন্দোলন। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন অন্যতম মাইল ফলক। এটি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখি এর সঙ্গে ক্রমে রাজনীতি-অর্থনীতি অর্থাৎ সবকিছু জড়িত/যুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন লিখেছেন ওয়াহিদুল হক, ''পাকিস্তানকে বাঙালীর প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ভাষা তো পূর্ণত একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ।''[৩৬] অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন একে অপরের সম্পূর্ণ সম্পুরক হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে আত্মপরিচয় আবিষ্কার থেকে ক্রমান্বয়ে স্বাধিকার - স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা যুগিয়েছে। এভাবে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার ও আমলা-শাসন বিভিন্ন শোষণ-নির্যাতন শুরু করে। ফলে এ পর্বে (১৯৪৭-৫৮) সুখী সমৃদ্ধ জীবনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা , পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনসহ বিভিন্ন ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায় -

১. রক্ষণশীল, পাকিস্তানপন্থী যেমন - তমদ্দুন মজলিশ
২. প্রগতিশীল, মধ্যপন্থী যেমন -প্রগতি লেখক সংঘ, ধুমকেতু শিল্পী সংঘ, সংস্কৃতি সংসদ, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, অগ্রণী শিল্পী সংঘ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য, ভিন্নমুখি রাজনৈতিক মতাদর্শ -এর সঙ্গে জড়িত ছিল সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। অর্থাৎ রক্ষণশীল রাজনৈতিক আদর্শ প্রভাবিত করেছে রক্ষণশীল

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহকে। তেমনি মধ্যপন্থী ও বামধারা মতাদর্শ প্রভাবিত করেছে প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও সংগঠনকে।

২ .১ সংস্কৃতি কর্মীদের বিভিন্ন ধারা ও বাংলাভাষা সংস্কার প্রচেষ্টা

রক্ষণশীল, পাকিস্তানপন্থী ধারা এবং প্রগতিশীল, মধ্যপন্থীধারাভুক্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির অন্যতম দাবী ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাসহ বাঙালি সংস্কৃতিকে ন্যায্য আসনে আসীন করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় ধারার মধ্যে ফারাক অবশ্যই ছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ''তখন ঢাকায় বলা যেতে পারে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান্তরাল সাংস্কৃতিক আন্দোলন হচ্ছে। একটা তমদ্দুন মজলিস -এর নেতৃত্বে। যারা মোটামুটি পাকিস্তানী ভাবধারার কথা, ধর্মের প্রেরণার কথা, আমাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের কথা বলছেন। আরেকটি হচ্ছে প্রগতিশীল, বামধারা যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের, বাঙ্গালি ঐতিহ্যের অখন্ডরূপের কথা বলা হচ্ছে এবং একটা ধর্মনিরপেক্ষ বা ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।[৩৭] রক্ষণশীল বা পাকিস্তানপন্থীরা বাঙালি সংস্কৃতিকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চান। কারণ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতো ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত আবেগ তাদের মধ্যে কাজ করেছে। ফলে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতিতে প্রচুর পরিমাণে উর্দু-ফার্সী- স্থানীয় শব্দ প্রয়োগ করে ''পাক -বাংলা কালচার'' গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা সম্মেলন, সভা-সমিতিসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তাদের মতাদর্শ তুলে ধরে একে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। রক্ষণশীল হলেও তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগেই বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে এই সংগঠনটি সবাইকে ভাষার দাবীতে আন্দোলনে আহবান জানায়। তবে, ১৯৪৮ পর্যন্তই ভাষা আন্দোলনে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। ক্রমে ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং ১৯৫২ সালে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। প্রগতিশীল, বামপন্থী অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠন, রাজনৈতিক দলগুলো এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিষয়টি তমুদ্দন মজলিশের মনোঃপূর্ত না হলেও তাদের করার কিছু ছিলনা। ''তমদ্দুন মজলিসের অনুসারীরা বলেন, কমিউনিষ্ট ও বামপন্থীদের হাতে চলে যাওয়ার কারণেই

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলন সফল হতে পারেনি।"[৩৮] অবশ্য প্রগতিশীলদের অনেকেও পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছেন।

রক্ষণশীল, পাকিস্তানপন্থী ধারার বিপরীতে প্রগতিশীল, মধ্যপন্থী ধারার অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মীরা হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র, সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি -ঐতিহ্যের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। তারা পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু রক্ষণশীল, পাকিস্তান পন্থীদের কর্মকান্ড বাঙালি সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিপরীতে অবস্থান নিতে থাকলে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান পাকিস্তানী তথা পাক-বাংলা সাংস্কৃতিক ধারা তৈরীর প্রয়াসের বিরুদ্ধে। এজন্য তারা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, কবিতা, নাটক, গান বিশেষত গণসঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যম বেছে নিয়ে বাঙালি আদর্শ, স্বকীয়তা তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেন। কারণ এ সবইতো সংস্কৃতির অঙ্গ। তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই এসব বিভিন্ন মাধ্যমে বাঙালি আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রতিবাদ, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য, জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তারা বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন, সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ও আমলা শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ করা। সেজন্য প্রথম থেকেই তারা পূর্ব বাংলার ওপর সাংস্কৃতিক আক্রমণ চালায়। কেননা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই তারা বুঝতে পেরেছিল শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ দ্বারা সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর (শুধুমাত্র ধর্ম ছাড়া) একটি ভূখন্ড তথা এর অধিবাসীকে করায়ত্তে রাখা অসম্ভব। তাই জাতীয় সংহতি রক্ষার নামে বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে তাদের পছন্দ মাফিক ইসলামীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ, তারা ভালো ভাবেই বুঝেছিল একটি জাতিকে দমিয়ে রাখতে হলে প্রথমে তার সংস্কৃতির ওপরই আঘাত হানতে হবে। এর পরিপূর্ণ বিকাশের পথ রুদ্ধ করলে ক্রমে তারা মানসিকভাবে হীনবল, আত্মমর্যাদাহীন, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বিস্মৃত জাতিতে পরিণত হবে, তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার প্রসার ঘটবেনা। তাই তারা প্রথমেই আঘাত হানে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার ওপর। যার অস্তিত্ব বাঙালির অন্তরের অন্তঃস্থলে, জীবনের সর্বত্র যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা তিন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে -

Dhaka University Institutional Repository

ক. উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা

খ. বাংলা ভাষায় অবাধে আরবী-ফার্সী -উর্দু শব্দ প্রয়োগ করে ইসলামী রূপ প্রদানের প্রচেষ্টা

গ. বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা

ক. উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ গভর্ণর জেনারেল 'কায়েদে আযম' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা সফরে এসে চরম সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেন, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্য ছিল, উর্দু নয়।[৩৯] ফলে, স্বয়ং কায়েদে আযমের ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে পূর্ববাংলার জনগণ দ্বিধা করেনি। প্রথমত ও প্রধানত ছাত্র বুদ্ধিজীবি শ্রেণী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ক্রমে সাধারণ মানুষও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকে।[৪০] বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা ভঙ্গ করে সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয়। ফলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ক্রমে আরো বেগবান হয়ে আন্দোলনে পরিণত হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার এই সংগ্রাম ১৯৫২ সালে সর্বাত্মক রূপ ধারণ করে। সরকারও গ্রেফতারসহ অন্যান্য দমননীতির আশ্রয় নিলে সাময়িকভাবে আন্দোলন থেমে যায়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত বাঙালির আত্মপরিচয় আবিষ্কারের চেতনা পরবর্তী আন্দোলনসমূহে পাথেয় হয়েছিল।

খ. বাংলা ভাষায় অবাধে আরবী-ফার্সী -উর্দু শব্দ প্রয়োগ করে ইসলামী রূপ প্রদানের প্রচেষ্টা

বাংলা ভাষাকে ইসলামী রূপ প্রদানের লক্ষ্যে এতে প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪০) কর্তৃক এ ধরনের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নব সৃষ্ট রাষ্ট্রে মুসলিম লীগ সরকার ব্যাপকভাবে এই কার্যক্রম শুরু করে। এ উদ্দেশ্য বাস্তাবায়িত করতে যেয়ে তাদের মতানুযায়ী তথাকথিত হিন্দুয়ানী শব্দসমূহ পরিবর্তন করে অপ্রচলিত ইসলামী শব্দে

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত করা হয়। এভাবে হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলা ভাষাকে বিকৃত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এই ভাষা স্কুলে পাঠ্য করা সহ রেডিওতে প্রচারিত বাংলা সংবাদে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৪১]

গ. বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা

সরকার কর্তৃক বাংলা ভাষার স্বকীয়তা বিনষ্ট করার আরেকটি প্রচেষ্টা ছিল রোমান ও আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রয়াস। আরবী হরফ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য হিসেবে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংহতি দৃঢ়তর করার দোহাই দেয়া হয়। এ লক্ষ্য পূরণে বই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে বার্ষিক ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হয়।[৪২] ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ২০ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে বিনামূল্যে আরবী হরফের বাংলা বই ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হয়।[৪৩]

ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।[৪৪] জনমত ক্রমে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে ওঠে। "এই বিক্ষোভের মুখে প্রাদেশিক সরকার ঘোষণা করে যে, বাংলা ভাষার হরফ কি হবে তা এ প্রদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে; কিন্তু এর পরেও তৎপরতা অব্যাহত থাকে এবং নতুন পথে শুরু হয়।"[৪৫]

মুসলিম লীগ সরকার এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মাওলানা আকরম খাঁ ও কবি গোলাম মোস্তফা। পরবর্তীতে তা স্থলাভিষিক্ত হন শাইখ শরাফুদ্দীন।[৪৬] ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর কমিটি সরকারের কাছে মূল রিপোর্ট পেশ করে। এর মূল বক্তব্য ছিল, বাংলা ভাষা, বর্ণমালা, ব্যাকরণ সংস্কার অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দসমূহের পরিবর্তে ইসলামী আদর্শের অনুকূল শব্দাবলী, উপাদানসমূহ ব্যবহার করতে হবে। পাকিস্তানী তথা মুসলিম ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কারকৃত বাংলা ভাষার নতুন নাম দেয়া হয় সহজ বাংলা।[৪৭] কমিটির

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ প্রতিক্রিয়াশীল হলেও বাংলা ভাষায় উর্দু ও আরবী হরফ প্রবর্তন না করার এবং বিশেষত শেষোক্তটির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য বন্ধ রাখার স্বপক্ষে দৃঢ় অভিমত প্রদান করা হয়। স্বভাবতই এটি সুপারিশসমূহ সরকারের মনোপূত না হওয়ায় বিভিন্ন মহলের দাবী সত্ত্বেও রিপোর্টটি প্রকাশ করেননি। পরবর্তীতে আইয়ুব আমলে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বস্তুত, আইয়ুব খান রোমান হরফ প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন। তাই এই রিপোর্টের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশগুলির আলোকে একে বাস্তবায়িত করতে চান।[৪৮] ''আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনকালে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন হামলা এসেছিলো ভাষাকমিটির রিপোর্টের উপর গুরুত্ব প্রদান ছিলো তারই প্রথম পদক্ষেপ।''[৪৯]

ভারত বিভাগোত্তর ঢাকায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারা বিরাজমান ছিল। ক্রমে ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে আরেকটি ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখি দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ধারায় কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি-সাংস্কৃতিক কর্মীরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে প্রগতিশীল, সক্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেকে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই শূন্যতার ফলে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে পাকিস্তানপন্থীদের কর্মকান্ড জোরদার হয়ে ওঠে।[৫০] তবে পাকিস্তানপন্থীদের অনেকে সরকারের তল্পিবাহক ছিলেন একথা যেমন সত্য তেমনি, তাঁদের অনেকে বিভাগোত্তর কালে সংখ্যালঘু শ্রেণীর কাছে নিগৃহীত, শোষিত হবার কারণে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশে নতুনভাবে সুখী উন্নত জীবনের আশায় একে সমর্থন জানান। পাকিস্তানবাদী হয়েও এদের অনেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। এমনকি পরবর্তীতে মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধেও এঁরা অনেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন।[৫১] যাই হোক, পাকিস্তানবাদীদের এক অংশ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে ছিলেন। আবার আরেকটি অংশ ছিল ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত। তাঁরা বাংলা ভাষার পক্ষে থাকলেও এর মধ্যে আরবী-ফার্সী বা আন্ঞ্চলিক বুলির প্রয়োগ ঘটিয়ে পাক-বাংলা কালচার গঠনে উদ্যোগ নেন। ''এঁরা ভাষাকে 'জবান', প্রধানমন্ত্রীকে 'উজিরে আজম', রাষ্ট্রপতিকে 'সদরে রিয়াসত' ইত্যাদি উর্দু-ফার্সী শব্দ চালুর প্রয়াস পান। এরা এমনকি কবি নজরুলের কবিতার 'মহাশ্মশানকে' কে 'গোরস্থান' করার মত কাজেও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে

Dhaka University Institutional Repository

রাজী হন। এঁদের কারো কারো কাছে বাংলা পুঁথি সাহিত্যই মুসলিম সাহিত্যের পূর্বসূরীরূপে বিবেচিত হয়ে ওঠে।''[৫২]

এর বিপরীতে ক্রমে গড়ে ওঠে আরেকটি ধারা, প্রগতিশীলদের কিয়দংশ যারা এদেশে রয়ে গিয়েছিলেন এবং কলকাতা থেকে আগত বিশেষত আই পি টি এ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ- এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, সরকারের কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও তাঁরা সম্মিলিতভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারে উদ্যোগী হলেন। প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, রাজনীতি সচেতন এসব তরুণ সাহিত্যিক-শিল্পী-অভিনেতা প্রমুখ সাংস্কৃতিক কর্মীরা সে অর্থে পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন না। বরং প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের ইসলামের নামে আবহমান কাল ধরে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধশালী বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তারা পাকিস্তান আদর্শের মধ্যেই বাঙালি আদর্শ, স্বকীয়তাকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হন। এ সময় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮২), মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) প্রমুখ প্রবীণ পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় সমর্থন-সহযোগিতা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারার সূচনায়, একে গতিশীল করার কাজে সহায়ক হয়েছিল।[৫৩] ক্রমে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের (বিশেষত গণসঙ্গীত, নাটক, সম্মেলন, চিত্রকলা ইত্যাদি) মাধ্যমে ঢাকা থেকে পূর্ব বাংলার সর্বত্র সাধারণ মানুষকে নব সৃষ্ট পাকিস্তানে তাদের স্বপ্নভঙ্গের কথা, মুসলিম লীগের বাঙালি বিদ্বেষ, শোষণ-নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন, সজাগ করে ন্যায্য দাবী আদায়ে উজ্জীবিত করে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে সচেষ্ট হলেন। এ লক্ষ্যে তারা রাজনীতিবিদদের চেয়ে দ্রুত এবং বেশী সফল হয়েছিলেন। বলা যায় পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় গড়ে ওঠা এই সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলোতে যেমন ঢাকার বাইরে থেকে আগতরা যুক্ত হয়, তেমনি এগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায়ও এরূপ অনেক সংগঠন গড়ে ওঠে, সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার সাংস্কৃতিক কর্মীরা এসব সম্মেলনে যোগ দেন।[৫৪] ক্রমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন দূর্বার হয়ে ওঠে, জনগণের ন্যায্য দাবী -অধিকার আদায়ের চেতনা শানিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২ .২ সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের বিকাশ

১৯৪৭-৫৮ সময়কালে সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ গড়ে ওঠে প্রধানত ঢাকা শহরেই। নিম্নে এদের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-

প্রগতি লেখক সংঘ

১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫] পরবর্তীতে ১৯৪২ সালে প্রগতিশীল লেখক ও শ্রমিক সংগঠক/নেতা সোমেন চন্দের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ এর নামকরণ করা হয় 'ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। ১৯৫৪ সালে এর নাম পূনরায় পরিবর্তন হয় ''প্রগতি লেখক সংঘ''। স্বল্প পরিসরে হলেও সংগঠনটি ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল।[৫৬]

তমদ্দুন মজলিশ

১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হয়।[৫৭] এর লক্ষ্য ছিল ইসলামী আদর্শভিত্তিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা। কারণ ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ফলে ইসলামী আদর্শ, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে সুখী সমাজ জীবন গড়ার আশা নিয়ে সংগঠনটি গঠিত হয়।[৫৮] সংঠনটির মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক 'সৈনিক' এবং 'দ্যুতি' ছিল এর সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা এই সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম ১৯৫৪-র পর স্তিমিত হয়ে পড়ে।

ধুমকেতু শিল্পী সংঘ

মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসন-নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫০ সালে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সাংস্কৃতিক কর্মীরা গণসঙ্গীত স্কোয়াড গঠন করে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট, বন্ধনার কথা তুলে ধরে ব্যাপকভাবে জনগণকে সচেতন করে তুলতে থাকেন। এই গণসঙ্গীত গুলোর দ্বারা সহজেই নিপীড়িত মানুষ উজ্জীবিত হয়ে ন্যায্য দাবী আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এগুলির মধ্যে ভারতীয় নাট্য সংঘ বা আই পি টি-এর 'ঘুম ভাঙার গান' অন্যতম ছিল। এই সংগঠনটি পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয় হয়। এর নাম হয় ''পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ।[৫৯]

সংস্কৃতি সংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক সংস্কৃতি সংসদ ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে এক্ষেত্রে সংস্কৃতি সংসদও সারা প্রদেশে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। নাটক, দেশাত্মবোধক ও গণসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রগতিবাদী, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রতিষ্টায় অপরিসীম অবদান রেখেছিল এই সংগঠনটি।[৬০]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক মধ্যশ্রেণীভূক্ত তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রথম ও প্রধান সংগঠন হিসেবে ১৯৫২ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রধানত সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকদের বিরোধী সংগঠনরূপে এটি গড়ে ওঠে।[৬১] এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাদের সৃজনশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে আরো পরিপূর্ণতা প্রদান করেন।

অগ্রণী শিল্পী সংঘ

১৯৫২ সালে পুরনো ঢাকায় বসবাসকারী সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রধানত এই গণসঙ্গীত গোষ্ঠীটি গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল আই পি টি এ বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদর্শ। এই সংগঠনের শিল্পীরা ১৯৫৩ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারী শেখ লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে ''মিলিত প্রাণের কলরবে'' গানটি গেয়ে প্রভাত ফেরী করেছিল।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

বুলবুল ললিত কলা একাডেমী (বাফা)

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী রশীদ আহমদ চৌধুরী যিনি বুলবুল চৌধুরী (১৯১৯-৫৪) নামে সমধিক পরিচিত, তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৫৫ সালের ১৭ মে এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত (গীত, বাদ্য, নৃত্য), নাটক, চারু-কারু শিল্প সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের আলোকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে মর্যাদার আসনে সুপতিষ্ঠিত করা।[৬৩]

রওনক সাহিত্য সংস্থা

১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে এটি গঠিত হয়।[৬৪] এই সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে প্রবন্ধকার মুহম্মদ বরকত উল্লাহ ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, মতীন উদ্দীন আহমেদ, মুজীবর রহমান খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি বেনজীর আহমেদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখ। ঘরোয়া এই সাহিত্য সংস্থার কোন ঘোষিত গঠনতন্ত্র না থাকলেও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "পাকিস্তানের জাতীয় ভিত্তিতে তমদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ও তামুদ্দুনিক প্রচেষ্টা চালানো।"[৬৫]

প্রতিমাসে একজন সদস্যের বাড়ীতে রওনকের বৈঠকে অনুষ্ঠিত হতো। এই বৈঠক একটি প্রবন্ধ পাঠ এবং এর ওপর আলোচনা করা হতো। প্রথম দিকে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সংগঠনটির কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ এক দশকেও সাহিত্যিকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য কোন কমন প্ল্যাটফর্মর গড়ে তোলা যায়নি বা সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি বলা যায়। এই অভাববোধ থেকেই রওনক সাহিত্য সংস্থা গড়ে তোলা হয়। কিন্তু ৩ বছর পর ক্রমে এর বিলুপ্তি ঘটে।

বাংলা একাডেমী

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হবার বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা-সাহিত্য গবেষণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে বিশেষ করে প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চার।

২.৩ সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহ

পাকিস্তানপন্থি ইসলামী আদর্শের অনুসারী এবং প্রগতিশীল সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিরা এ সময়পর্বে ঢাকায় কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন করে। নিম্নে সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন

ঢাকার কার্জন হলে দু'দিন ব্যাপী (১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১লা জানুয়ারী) এ সম্মেলন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর (১৯০৬-৬৬) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির মনে ধুমায়িত ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল 'পাকিস্তানী সাহিত্যের পূণর্জাগরণ'[৬৬] সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে প্রখ্যাত শিক্ষা ও ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রদত্ত বক্তব্য সরকারি মতাদর্শ, উদ্দেশ্য পরিপন্থি হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন- ''আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি, এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।''[৬৭] এছাড়াও তিনি বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রচেষ্টা না করে বরং শিক্ষাসহ জীবনের সর্বস্তরে এর ব্যবহারের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। অর্থাৎ নব সৃষ্ট পাকিস্তানে তিনি পাকিস্তানীত্ব ও বাঙালিত্বের সংঘাতে শেষোক্তটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। ''কারণ তাঁর মনে হয়েছে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর কিছু মানুষ আমাদের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাকে খন্ডিত করার চেষ্টা করছে। কাজেই এরই প্রতিবাদে উপর্যুক্ত মন্তব্য করছেন। যদিও সাহিত্য সম্মেলন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।''[৬৮] কিন্তু তাঁর মত পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি যে স্বতন্ত্র তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জনমানসে স্পষ্টতই এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে।

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ১৯৫২ সালে চার দিন ব্যাপী (১৭-২০ অক্টোবর) এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল- ইসলাম সম্পর্কে জনমনে সৃষ্ট ভুল ধারণা অপসারণ করে পাকিস্তানকে যথার্থ অর্থে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা। তাদের যুক্তি ছিল, মানবকল্যাণে ইসলামই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। আর এই আদর্শের ভিত্তিতেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলনে ইসলামের নামে লীগ সরকারের অপশাসনের নিন্দা করে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাসহ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক হৃদ্যতা-সম্প্রীতি বাড়ানর লক্ষ্যে 'ইসলামিক কালচারাল কনফারেন্স' নামক স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৬৯] ''সামন্ত চেতনা লালিত এই সম্মেলন জনমনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।''[৭০]

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন

পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা সম্মিলিত হয়ে ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে পাঁচ দিন ব্যাপী (২৩-২৭) এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এর পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল মুসলিম লীগের 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই নির্বাচনী জোট গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করে ১৯৫৪ সনের ৩রা এপ্রিল।

সম্মেলনে প্রায় প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। এবং বিভিন্ন জেলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংক্রান্ত যাবতীয় অগ্রগতির রিপোর্ট প্রদান করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছিলেন তারা। ১০৮ জনের সাক্ষরিত দীর্ঘ ঘোষণাপত্রে সম্মেলনের মূলনীতি হিসেবে পূর্ব বাংলার লেখক-

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী, সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে ব্যাপকতম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়।[৭১] তাছাড়াও পশ্চিম বঙ্গ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোজবসু, শান্তিরঞ্জন মন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধায়, রাধা রাণী দেবী, কাজী আবদুল ওদুদ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।[৭২]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ''আবদুল লতিফের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যদিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়, অতঃপর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদশর্ন স্বরূপ দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।''[৭৩] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর প্রদত্ত ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরকার ও এর অনুগত শিল্পী-সাহিত্যিকদের ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করেন। সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বাংলা ভাষা-সাহিত্য -সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ, গণসঙ্গীত, লোক সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, লোকনাট্য, একাঙ্কিকা, ছায়ানাটক, চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা এসব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রামের লোক সংস্কৃতি সংসদ 'ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা' নামক ছায়ানাট্যে লবণের দুর্মূল্য, খুলনার দুর্ভিক্ষ, ভাষা আন্দোলন প্রভৃতিসহ বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন।[৭৪] অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। এতে ''পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন পরিচালনা সমিতি'' গঠিত হয়। উদ্দেশ্য, এই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং ফি বছর একটি সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা।[৭৫] বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে আয়োজিত সম্মেলনটি সাফল্যের সাথেই শেষ হয়। অবশ্য পূর্ব বাংলার ইসলামী ও পাকিস্তানপন্থি সাহিত্যিকরা আমন্ত্রণ না পাওয়ায় এটি সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন নয় বলে সমালোচনা করেন। এছাড়াও পাঁচ দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের সঙ্গীতানুষ্ঠান সমূহে ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, মুরশিদী প্রভৃতির স্থান না থাকা সহ বিভিন্ন অভিযোগ করা হয়। এভাবে এই সম্মেলনের মাধ্যমে পাকিস্তানপন্থি ও প্রগতিপন্থিদের মধ্যেকার দৃষ্টিভঙ্গী তথা মতপার্থক্য, বিরোধ স্পষ্টতই দৃশ্যমান হয়ে পড়ে।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন

১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল ঢাকা আর্ট কাউন্সিল। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সংহতি-সৌহার্দ্য রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে এটির আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালের মে মাসে এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৭৭]

সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

ঢাকার কার্জন হলে১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে তিন দিন ব্যাপী (২৯ -৩১) এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠন এর আয়োজক হিসেবে ভুমিকা পালন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, এসলামী সংস্কৃতি পরিষদ, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, পাক-বাংলা সাহিত্য মহফিল প্রমুখ।[৭৮] এসব ছিল প্রধানত পাকিস্তানবাদী তথা রক্ষণশীল সংগঠন।

সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম (১৮৯০-১৯৬৬) এবং উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। উপাচার্য মোহাম্মদ ইব্রাহিম তাঁর সভাপতির ভাষণে শতবার্ষিকী উদযাপনের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ''যে আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসমূহের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশত বীর মুজাহিদগণ অকাতরে রক্তদান করেছেন তার প্রতি আজো যদি আমরা উদাসীন থাকি তবে আমাদের নবলব্ধ রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে।''[৭৯]

সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাদি ও আলোচনার মূল বক্তব্য ছিল, ইংরেজ শাসনকালে (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত) মুসলমানেরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরমভাবে বৈষম্য-নির্যাতনের শিকার হয়। ইতিহাসের আলোকে এই সময়কালে মুসলমানদের বিভিন্ন সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়। তন্মধ্যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ছিল অন্যতম।[৮০] মুসলমানদের জন্য যা পরবর্তীতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এবং সেই বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

মাহফুজুল হক শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের শেষ দিন অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ''যে সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে সিপাহী বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে-সবের পূনরুজ্জীবনের প্রয়াসই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।''[৮১]

২ .৪ প্রগতিবাদীদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, ১৯৪৭-৫৮

১৯৪৭-৫৮ পর্যন্ত (সামরিক শাসন জারীর আগ পর্যন্ত) প্রগতিপন্থি/ ধারার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। আলোচনার ব্যাপ্তির কারণে এক্ষেত্রে সাহিত্যকে বাদ দেয়া হলো। এ পর্যায়ে মূলত নাটক, সঙ্গীত বিশেষত গণসঙ্গীত- এদু'টি মাধ্যমকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ এগুলির দ্বারা খুব সহজেই গণমানসের কাছে বক্তব্য তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের উজ্জীবিত করা গেছে, রক্ষণশীল সমাজের বিপরীতে সংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের সম্ভব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ক. নাটক

পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় দেশভাগের পূর্বেই নাট্য চর্চার ধারা বিকশিত ছিল।[৮২] এসময় নাটক বিনোদনের একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিভিন্ন পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল নাট্যমন্বও। পুরাণ আশ্রয়ী, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক মন্বস্থ হতো। ক্রমে ঢাকা শহরের বাইরেও নাট্যচর্চা ছড়িয়ে পড়ে।

পাকিস্তান আন্দোলনকালীন সময়ে এ ধারাটি ক্ষীণ হলেও বহমান ছিল। তবে এসময় নাটকের বিষয় বদলে যাচ্ছিল, প্রধানত ইসলামী ভাবধারার নাটকই মন্বস্থ হতো। মহল্লায় ছোট-খাট আয়োজন করা হতো বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে।[৮৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত জনসমষ্টির দেশত্যাগের ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গণে সৃষ্ট শূন্যতা পূরনে উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ এগিয়ে আসেন। মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের মোহভঙ্গ এ ধারাকে বেগবান করে। পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির বিপরীত একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নাটক। সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যম যেমন- সাহিত্যে ইসলামী তথা পাকিস্তানী ভাবধারার

Dhaka University Institutional Repository

যে উপস্থিতি দেখি, নাটকের ক্ষেত্রে তা দেখিনা। অন্তত পক্ষে, ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটকগুলির ক্ষেত্রে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।[৮৪]

১৯৪৭-৫৮ কালপর্বে ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটকগুলোর একটি ছক পরিশিষ্টে উল্লেখিত হলো। এ থেকে এই সময়কালীন নাটকের মোটামুটি সংখ্যা নামকরণ থেকে এদের ধরণ বা নাটকগুলোর মাধ্যমে প্রকাশমান চেতনা বোঝা সহজতর হবে। (দেখুন, পরিশিষ্ট)।

বর্ণিত ছক থেকে ঢাকা শহরে বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক মঞ্চস্থ নাটকগুলোর নামকরণ থেকেই এগুলির বিষয়বস্তু সহজে অনুমান করা যায়। এ সময় মঞ্চস্থ অধিকাংশ নাটক ছিল জীবনমুখী, সামাজিক বিভিন্ন দিক, সমকালীন সমস্যা-সংকট সম্বলিত। তবে ১৯৫২-র আগে নাটকের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির মোহভঙ্গ, সংস্কৃতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আক্রমনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটলেও প্রতিবাদের ভাষাটা তেমন দৃঢ় বা প্রবল ছিলনা। কিন্তু নাট্যকর্মীরা নাটকগুলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছার চেষ্টা করেছেন। তবে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে নাট্যচর্চার ধারাকেও অধিকতর জীবনঘনিষ্ট, আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক করে তোলে।[৮৫] সরকার ও এর অনুগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন দমননীতি ও বাধা প্রদান সত্ত্বেও নাটকগুলোতে এই কালপর্বে রাজনৈতিক-সামাজিক- সাংস্কৃতিক বঞ্চনা পরিস্ফুটিত হয়। এসময়পর্বে ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটক সমূহের মধ্যে মুনীর চৌধুরীর 'কবর',[৮৬] আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র', আসকার ইবনে শাইখের 'বিদ্রোহ পদ্মা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাদের দেশ' ও রক্ত করবী' প্রভৃতির রাজনৈতিক-সামাজিক অবিচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ, প্রতিবাদী উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী অঙ্গ/মাধ্যম হয়ে ওঠে নাটক। ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় নাট্যচর্চার উদ্দেশ্যে নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ক্রমেই দেখা যায় নাটক তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে মানুষকে উদ্দীপ্ত করছে। বস্তুত, "এই পর্বের নাট্যচর্চা পরবর্তীকালের নাট্যান্দোলনে পালন করেছে দিক নির্দেশকের সুদৃঢ়স্পর্শী ভূমিকা। এই দিক নির্দেশ যেমন নাটক সমূহের বিষয়ে-বক্তব্যে-চেতনায়-অভিজ্ঞানে পরিদৃশ্যমান, তেমনি আঙ্গিকে-পরিকল্পনায় আর প্রয়োগ বিজ্ঞানেও।"[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

ঋ গণসঙ্গীত

গণ আলোচনায় সঙ্গীতের ওপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করব। কারণ সঙ্গীতের এই বিশেষ ধারাটি মানুষকে দ্রুত উজ্জীবিত করেছে। এর মাধ্যমে প্রচারিত বাণী, সুর সব ধরনের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ, অধিকার তথা সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের কথা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য তথা আত্মপরিচয়ের কথা বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

'গণসঙ্গীত' নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে এই শব্দটির অর্থ জানা দরকার। 'গণসঙ্গীত' বলতে আমরা সঙ্গীতের সেই ধারাকে বুঝব যা শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজের প্রগতিশীল, অধিকার সচেতন ও প্রতিবাদী অংশ (যারা প্রধানত মধ্যশ্রেণীভুক্ত এবং শহরবাসী) কর্তৃক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে গাওয়া গান। সমাজের এই বাকী অংশ যে অসচেতন ছিল তা নয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামবাসী এই জনসমষ্টির মধ্যেও ক্ষোভ বিরাজমান ছিল। এই সহজ-সরল মানুষেরা নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ইসলামী লেবাস/ মুখোশের কারণে বুঝে উঠতে পারছিলনা কিভাবে এ পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সরকারের দমননীতি সত্ত্বেও বিভিন্ন গণসঙ্গীত স্কোয়াড ও শিল্পীরা এই সময়কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইস্যু তথা বঞ্চনা, নির্যাতনের কথা তাদের গানের/ গণসঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরতে থাকেন। এভাবে ক্রমে গণসঙ্গীত তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে অধিকার আদায়ের বোধ, দৃঢ় চেতনা জাগরিত করে এবং যারফলে সম্ভব হয়েছিল স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে এগিয়ে যাওয়া। সুতরাং আমরা বলতে পারি গণসঙ্গীত হচ্ছে সমাজ বদলের গান।[৮৮]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর প্রথম দিকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের[৮৯] গণসঙ্গীতগুলো গাওয়া হতো। কারণ এসময় রচয়িতার অভাবে এখানে গণসঙ্গীত রচিত হয়নি। তাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'ঘুম ভাঙার গান' -এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুলের জাগরণীমূলক, দেশাত্ববোধক গান গাওয়া হতে থাকে।[৯০] কিন্তু পূর্ব বাংলার আলাদা সমস্যা ও তখনকার আর্থ-সামাগিজক পরিবেশে নতুন গণসঙ্গীতের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন দেখা দেয়।[৯১] ক্রমে সাংস্কৃতিক কর্মীরা গণসঙ্গীত রচনা করে গাইতে শুরু করেন এবং এতে পশ্চিম পাকিস্তানী বিভিন্ন শোষণ-নির্যাতনের কথা প্রতিফলিত হতে থাকে।[৯২] গণসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে শেখ লুতফর রহমান, আব্দুল লতিফ প্রমুখ ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য, চল্লিশের দশকের শেষপাদে এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথমপাদে গণসঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে গান গাইতে না জানা সত্বেও এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মীরাও এগিয়ে আসতেন।[৯৩] ক্রমে বিভিন্ন গণসঙ্গীত স্কোয়াড গঠিত হয় এবং বিভিন্ন গান রচিত হতে থাকে।[৯৪] সংরক্ষণের অভাবে অনেক গানই হারিয়ে গেছে। ১৯৪৭-৫৮ (সামরিক শাসনজারীর আগ পর্যন্ত) কালপর্বে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-র প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন ও ১৯৫৬ -তে সংবিধান প্রণয়ন। এই সময়কালে রচিত উল্লেখযোগ্য গানসমূহ নিম্নে উল্লিখিত হল এবং এর মাধ্যমে আমরা দেখব গণসঙ্গীত কিভাবে বাঙালির প্রাণের সাথে মিশে গিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভাষা আন্দোলন গণসঙ্গীতচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল। জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮-র শেষদিকে প্রতিবাদস্বরূপ গাওয়া হয়, ''ওরে ভাইরে ভাই/ বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই''।[৯৫] দর্শকদের অনুরোধে গানটি কয়েকবার গাওয়া হয়। গানটির মাধ্যমে প্রচারিত বাণীতে ভীত হয়ে পরবর্তীকে এটি না গাইবার জন্য শেখ লুতফর রহমানকে বন্ড সই করতে হয়েছিল।[৯৬] ১৯৫২ সালে নিরীহ ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সমস্ত পূর্ব বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে '৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী। তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হতে থাকে বিভিন্ন জ্বালাময়ী গণসঙ্গীত। 'কোন সাংগঠনিক প্রয়াসে নয়, প্রাণের আবেগে সৃষ্টি হতে থাকলো গণসঙ্গীতের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।'[৯৭]

একুশে ফেব্রুয়ারীকে নিয়ে সর্বপ্রথম গানটি রচিত হয় ১৯৫৩ সালে। গানটির রচয়িতা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা গাজীউল হক। এবং তিনিই গানটি প্রথম গেয়েছিলেন।[৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি গান হল [৯৯] -

১. মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে / আজিকে স্মরিও তারে
২. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙ্গালী/ ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি।
৩. ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়।
৪. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী।

একুশে ফেব্রুয়ারী নিয়ে আবদুল গাফফার চৌধুরীর ''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী'' এই অমর গানটি আমাদের সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক স্বরূপ।[১০০] যেমনটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আরেকটি প্রতীক হচ্ছে শহীদ মিনার। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনেতো বটেই পরবর্তীতে যখনই আন্দোলন হয়েছে, একুশে ফেব্রুয়ারী এবং এই একটি বিশেষ গান আমাদের চেতনা যুগিয়েছে। বস্তুত, গণসঙ্গীত সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ বা আন্দোলনকে কিভাবে এগিয়ে দিয়ে যেতে পারে তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই গানটি।

উপর্যুক্ত গানসমূহ ছাড়াও ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক আরো প্রচুর গান রচিত হয়। এই গানগুলি প্রভাতফেরী সহ বিভিন্ন সম্মেলন, সভায় গাওয়া হত। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্মিলিত হয়ে নির্বাচনী জোট ''যুক্তফ্রন্ট'' গঠন করে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে লীগ বিরোধী বিভিন্ন প্রচারণামূলক গণসঙ্গীত রচিত হয়। শিল্পীরা যারা পূর্ব বাংলায় এসব গেয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন, সচেতন করেছেন মুসলিম লীগের অপশাসন সম্পর্কে এ সময় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে [১০১]-

১. শুনছনি ভাই দেখছনি
দেখছনি ভাই শুনছনি
স্বাধীনতার নামে আজব কান্ড দেখছনি।
লীগের মন্ত্রিরা আজি কাঁদে ঘরে ঘরে
ভোট দিমু ভাই হক ভাসানীর নামে।

২. মোরা কি দুঃখে বাঁচিয়া রবো
উজিরে নাজিরে বাঁচায়ে রাখিতে চির উপবাসী রবো।

৩. মন্ত্রী হওয়া কি মুখের কথা
যদি না বোঝে জনতার ব্যথা;

Dhaka University Institutional Repository

৪. মরি হায়রে হায় দুঃখে পরান জ্বলে
পাঁচশো টাকার বাগান খাইলো পাঁচ টাকার ছাগলে;

৫. ও হক লাটগিরি নেয়না তোদের দুঃখে
তাও কি তোদের মনে নাই
হকের দলে আয়রে সবে ভাই।

৬. মরি হায়রে হায়, দুঃখ বলি কারে
সোনার পাকিস্তান পুড়াইল জালিম লীগ সরকারে।

৭. স্বর্গে যাবো গো স্বর্গে যাবো, স্বর্গে যাবো
ষোল টাকা সের দরে লবণ খেয়ে স্বর্গে যাবো।

৮. লীগের মন্ত্রীরা আজি কাঁদে ঘরে ঘরে
ডি এস বাড়োড়ী কাঁদে পানের বড়ে হায়রে।

৯. ও দুনিয়ার মজদুর ভাইসব
আয় এক মিছিলে দাঁড়া
ঐ নয়া যমানার ডাক এসেছে
এক সাথে দে সাড়া।

১০.ওঠো-ওঠো- ওঠো
ওঠো দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।

আমরা বলতে পারি, এভাবে গণজাগরণীমূলক গান তথা সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দেখি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ।

উল্লেখ্য, '৫০ -এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়েও বেশকিছু গান রচিত হয়।[১০২]

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর কঠোর মনোভাব, দমননীতি সত্ত্বেও অজস্র গণসঙ্গীত রচিত হয় এবং গণসঙ্গীত শিল্পীরা এ সব গাইতে থাকেন।

২ .৫ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মূল্যায়ণ

সবশেষে, এ পর্বের সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্মকান্ডকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষণশীল, পাকিস্তানপন্থি ধারার বিপরীতে প্রগতিপন্থী ধারা বাংলার সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের স্বকীয়তা রক্ষায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। এলক্ষ্যে সংস্কৃতি কর্মীরা বিভিন্ন সংগঠন, সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এসব সংগঠন- সম্মেলনে ঢাকার বাইরে থেকে আগত সংস্কৃতি কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। আবার এগুলির অনুপ্রেরণায় ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে, সম্মেলন হয়েছে। ঢাকার কর্মীরা পূর্ব বাংলার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে প্রগতিশীল ধারাকে গতিশীল করেছেন। রক্ষণশীল সমাজের ঘেরাটোপ ভেঙ্গে মেয়েরাও ক্রমশ বেরিয়ে আসতে থাকে।

ভাষা তথা সংস্কৃতির ওপর আঘাত এলে প্রথমে সাংস্কৃতিক কর্মীরাই প্রতিবাদ জানান। তারা জনগণকে সচেতন করেছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে। উল্লেখ্য ধর্মের ভিত্তিতে এবং পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার বেশীরভাগ মানুষই ছিল দরিদ্র, শিক্ষাবন্ধিত। সরকারের বিভিন্ন শোষণ- নির্যাতন সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি মোহ তখনও কাটেনি তাদের। আর এরই সুযোগ নিয়ে সরকার ও পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিরা জাতীয় সংহতির নামে বাংলা ভাষা- সংস্কৃতির ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কর্মীরা এই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি অশিক্ষিত জনগণের মোহের দরুণ কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিলনা। সরকারের দমন সত্ত্বেও তারা নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়, সংস্কৃতি হচ্ছে একটি ভুখন্ডের জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনবোধ বা ধারা। অর্থাৎ এর সাথে রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সবকিছুই জড়িত। আর বিশেষত অর্থনৈতিক মুক্তির আশায়তো পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। এই বাস্তব সত্যটি মুসলিম লীগ সরকার মেনে নিতে অস্বীকার করে। ক্রমে তাদের কাছে শাসক শ্রেণীর আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর এই দুরহ কাজটি রাজনীতিবিদদের চেয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছিল। ভাষা তথা সংস্কৃতির ওপর আঘাতকে কেন্দ্র করেই ৫২ এসে জনগণ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সময়ই রাজনীতি ও সংস্কৃতি একত্রিত হয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। কেননা উভয় ক্ষেত্রের, আন্দোলনের বক্তব্য ছিল অভিন্ন, বাঙালির ন্যায্য দাবী -অধিকার আদায়। ২১ শে ফেব্রুয়ারীর চেতনায় উজ্জীবিত বাঙ্গালী জাতি ক্রমে এ লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, পাকিস্তান তন্ত্রের বিপরীতে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত নাটক, সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদী বক্তব্য তুলে ধরতে থাকেন। এভাবে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি পটভূমি তৈরী করছে। আমার আলোচনায় সাহিত্য চর্চাকে বাদ দিয়েছি। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, এক্ষেত্রে প্রথমদিকে প্রধানত পাকিস্তানী ভাবধারা পুরোমাত্রায় প্রতিফলিত ছিল।[১০৩] ক্রমে এর বিপরীত অর্থাৎ পাকিস্তান তত্ত্ব বিরোধী সাহিত্যচর্চা শুরু হয় সীমিত পরিসরে হলেও। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো এই সাহিত্যচর্চার ধারায়ও প্রাণসঞ্চারিত করে। এ সময় থেকে সাহিত্যিকদের লেখনীতে মুসলিম লীগের শোষণ-নির্যাতন-দূর্নীতি, দারিদ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সুস্পষ্ট হতে থাকে। 'এ- নতুন ধারাটি বিষয় বেছে নেয় চারপাশের জীবন থেকে, প্রকাশ করতে থাকে জীবনের ক্লান্তি, গ্লানি ও আবেগ।'[১০৪] এবং 'জীবনের গ্লানি ও অসারত্বের ছবি এঁকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, আগ্রহ প্রকাশ করেছে নতুন সমাজ গড়ার।'[১০৫] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, সাহিত্য-সংস্কৃতির যে দুটি ধারা চলেছে দেখা গেছে বেশীরভাগে ক্ষেত্রে লেখকরা কোন না কোন পক্ষে দাঁড়িয়ে গেল। যেমন- শামসুর রাহমান। তিনি যখন কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিলনা। এমনকি তিনি রাজনীতি একটু অবজ্ঞাই করতেন। কিন্তু শুদ্ধ চোখ-কান খোলা রাখার ফলে তাঁর মানবিক চেতনা এবং আধুনিক রুচিবোধের ফলে ধীরে ধীরে দেখা গেল যে তিনি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কবিতা লিখছেন। এভাবে রাজনৈতিক পজিশন নিচ্ছেন যা তাঁর নেয়ার কথা ছিলনা। দেখা গেল পাকিস্তান আমলে এটি কেবল আর ব্যক্তির অভিরুচি হিসেবে থাকছেনা। এটা একটু সংঘবদ্ধ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। মানে সাহিত্য -সাংস্কৃতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, নানা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এ দু'টো আদর্শ প্রচারিত হচ্ছে এবং তার সংঘাত হচ্ছে।[১০৬]

এভাবে সংস্কৃতিসেবী, সাংস্কৃতিক কর্মীরা সাহিত্য, গান, নাটক, সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করছেন। ক্রমে এগুলি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, যা আগে সেভাবে ছিলনা। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

দেখি অন্তত নাটক, গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ ক্রমশঃ জোড়ালো হচ্ছে। বস্তুত, '৬০-এর দশকে এসে একদিকে ধর্মভিত্তিক আদর্শ, অন্যদিকে খুব মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ- এ দুটো ধারা মধ্যে সংঘাত আরম্ভ হলো। এবং এ সংঘাতটা এক অর্থে রাজনৈতিক, সেটা বলা যায় যে পাকিস্তানী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম।[১০৭] ক্রমে সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্মকান্ড তথা আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বি-জাতিতত্ত্বের শূন্যগর্ভতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায় পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠী।

২ .৬ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পৃক্ততা

মুসলমানদের জন্য এবং প্রধানত পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠির সমর্থনে সৃষ্টি হয় পাকিস্তানের। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের জীবনাচরণ ইসলামপন্থী না হলেও তারা ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করার পর পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠির ওপর অন্যায়ভাবে শোষণ-নির্যাতন শুরু করে। অথচ ইসলামে কারো ন্যায্য অধিকার হরণের কথা বলা হয়নি। বস্তুত, ধর্মকে সামনে রেখে অশিক্ষিত জনগণকে একত্রিত করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছেন তারা। তাদের সাথে জোট বাঁধে আমলারা। পুরো ভারত বর্ষে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছিলনা। ছোট পরিসরে সম্ভাবনা ছিল। তারা মিলিতভাবে পাকিস্তান শাসন করছে যার ধরণ ছিল রক্ষণশীল, জনস্বার্থের প্রতিকূল ক্রমে রক্ষণশীল রাজনীতিকে বিদীর্ণ করে জনমানুষ কথা বলতে শুরু করে। এমতাবস্থায় বাংলা ভাষার ওপর আঘাতকে কেন্দ্র করে বাঙালির সব বঞ্চনা, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ভাষা আন্দোলন মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও রাজনীতি থেকে বিযুক্ত ছিলনা। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র রাষ্ট্র ভাষার জন্য আন্দোলন ছিলনা কারণ ভাষাতো শুধু আবেগের সঙ্গে জড়িত কোন বিষয় নয়, জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সকল কর্মকান্ডই এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, বাংলা শুধু মাত্র পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষাই ছিলনা, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-অর্থনীতিও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাজেই এর পরিসর অনেক বেশী বিস্তৃত। যদিও ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের সাথে এর

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্তি ছিলনা, কিন্তু '৫২-তে এসে ভাষা আন্দোলন তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সহায়ক হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে তারা প্রতিবাদ, বিক্ষোভ জানালেও '৫২-র ভাষা আন্দোলনের আগে এর কোনটিই সুনির্দিষ্ট রূপলাভে ব্যর্থ হয়। ঐ সমস্ত প্রতিবাদ, বিক্ষোভের সমন্বিত রূপই ছিল ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। যার ফলে সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করায় এটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। 'বাঙালী রুখল পাকিস্তানকে তার সংস্কৃতিতে পূণর্জাগরণ দিয়ে। পাকিস্তান তাকে চিরকাল দাস করে রাখতে চাইল তার সংস্কৃতি হরণ করে। .....একুশে বাইশে ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত আত্মদানই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করে ফেলল, তা নয়। খুব সার্থক ভাবে তা রুখলো পাকিস্তানকে। আমার সংস্কৃতিতে হাত দেবেনা খবরদার -এ বার্তা ঠিকই পৌঁছালো পাকিস্তানের জবরদখলকারী প্রভুদের কাছে।'[১০৮] বস্তুত, '৫২-র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক সূত্রে গ্রোথিত হয়ে পড়ে। শুধু রাজনীতি নয়, জনগণের সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায় এই আন্দোলন প্রসূত চেতনা। বিভিন্ন ন্যায্য দাবী আদায়ের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ জীবনের লক্ষ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ, সুসংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অভিন্ন। মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলে। ফলে পূর্ব বাংলার জনমানস যে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক পরিবেশকামী তা ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণসহ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে শুধু জনগণ নয় মুসলিম লীগের প্রধান নেতা, বিধান পরিষদের সদস্য মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেন। সরকারের এই হত্যাকান্ডের নিন্দা করায় মুসলিম লীগের অনেক রাজনীতিবিদও বন্দী হন। ক্রমে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। এরই পরিণতি হিসেবে দেখি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট তথা সাধারণ মানুষের নিরঙ্কুশ বিজয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে ২১ টি দফা প্রণীত হয়েছিল মূলত ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদান, শহীদ মিনার নির্মাণ এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণা ছাড়াও ২১ দফার মূল কথা ছিল পূর্ব বাংলার পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনকালীন সময়েই (১৯৪৮ -৫২) মূলত পূর্ব বাংলার প্রধানতম রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে, বিকশিত হয়। এই আন্দোলনই পূর্ব বাংলার জনগণকে ও সংগঠন সমূহকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ডি অতিক্রমে সহায়তা করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে দেখি রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমে অসাম্প্রদায়িক রূপ নিতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম ধারণ করে। ক্রমে বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠন, রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। যেমন- ১৯৫২-তে ছাত্র ইউনিয়ন (২৬ এপ্রিল), গণতন্ত্রী দল (২৭ এপ্রিল) এবং ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় কৃষক-শ্রমিক পার্টি (২৬ জুলাই) প্রভৃতি।

বস্তুত,"ভাষা আন্দোলনের ফলে বা প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি-চর্চার ধারা সৃষ্টি হয়।"[১০৯] ভাষা আন্দোলনের দ্বারা অর্জিত চেতনা, বাঙালির আত্মপরিচয় আবিষ্কারই মূলত পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা পরিবর্তন করে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদল বিভিন্ন চক্রান্ত সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে ভাষা প্রশ্নের সমাধান হয়। সরকার ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী এতে গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে ন্যায্যদাবী সমূহ প্রাপ্তির আকাঙ্খা অর্জিত হয়নি। এজন্য যুক্তফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, মতপার্থক্য, দায়িত্বহীনতা অনেকাংশে দায়ী ছিল। কিন্তু সে খানে এটাও ঠিক যে, "ছাপান্নতে প্রদেশে এবং কেন্দ্রে বাঙালি কেন্দ্রিক দল আওয়ামী লীগকে ছাড়তেই হল। চুয়ান্নর সাহিত্য সম্মেলনের স্পিরিট টি হারায়নি, আওয়ামী রাজনীতি বরং দিয়েছে তাকে প্রাণ। সাতান্নতেই মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, যথেষ্টই আশ্চর্যের বিষয়- কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ডাকেন। সমগ্র দেশ ঝাপিয়ে পড়ল সেখানে। কর্তা ব্যক্তিদের অদক্ষতায়, কল্পনাহীনতায় সংস্কৃতির কিছু হল না সেখানে, প্রতীচ্য ছন্দে রক্ত গরম করা অন্তহীন গণসঙ্গীত ছাড়া। কিন্তু রাজনীতি হল সাংঘাতিক।"[১১০] জনগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার তাদের কোন গণতান্ত্রিক দাবীই মেনে নেবেনা। এজন্য তাদের আরো পথ পাড়ি দিতে হবে। ফলে তারা আরো ঐক্যবদ্ধ, সংহত, সংগঠিত হয়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। আর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে প্রগতিশীল,

Dhaka University Institutional Repository

অসাম্প্রদায়িক মধ্যশ্রেণীভুক্ত তরুণ কর্মীরা বেরিয়ে আসে, তারাই পরবর্তী কালপর্বে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বস্তুত, ২১ শে ফেব্রুয়ারী অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের শিকার পূর্ব বাংলার মানুষ দ্বি-জাতিতত্ত্ব তথা সাম্প্রদায়িকতাকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ক্রমে স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা তথা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। এবং এ পর্যায়েও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে, পরস্পরের সম্পূরক হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১ মুনতাসীর মামুন, 'মুক্তিযুদ্ধ', *যেসব হত্যার বিচার হয়নি*, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ১৭।

২. পাকিস্তানের আমলা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে সিভিল সমাজের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতো তা বিশ্লেষণ করে কে. বি. সাঈদ মন্তব্য করেছেন- "The same pattern of central intervention had taken place in East Bengal as in Punjab, the difference being that it was the Muslim League Politicians who could not control the situation arising out of religious disturbances in Punjab who had been removed. In East Bengal, politicians of the United Front, who had won an overwhelming majority in the provincial elections ..... where dismissed. In both case there was military intervention except that Martial Law was imposed in Punjab, whereas a defense official was put in charge of the civil administration in East Bengal." খালিদ বিন সাঈদ-এর উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৮, পাদটীকাঃ ১৫।

৩. সোহরাওয়ার্দী আতাউর রহমান খানকে বলেছিলেন, ''কোন দেশেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে নাই সরকারের উপর। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গেলে অনেক অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হবে উভয়েরই।'' উদ্ধৃত, আতাউর রহমান খান, *ওজারতির দুই বছর*, ঢাকা, ১৩৭১, পৃঃ ২৬৫।

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *তাজউদ্দীনের ডাইরী ১ম ও ২য় খন্ড*, ঢাকা, ২০০০ পৃঃ ৮। একজন রাজনীতি সচেতন তরুণ তখনই পাকিস্তান সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন তারই বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে এতে।

৫. মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িক, বামপন্থী তরুণ কর্মীরা ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ''পিপলস ফ্রিডম লীগ'' গঠন করে। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের কর্তৃত্বপরায়ন, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিরোধী মনোভাবের জন্যই এর জন্ম হয়। সরকারি দমননীতির কারণে এর নাম পরিবর্তন করে প্রথমে 'গণ-আজাদী লীগ' পরে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালে 'সিভিল লিবার্টিস লীগ' রাখা হয়। এ দলের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলারে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১ম খন্ড), ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৭-১৯।

৬. নব গঠিত দলটি ১২ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। সংক্ষেপে এই গণমুখী কর্মসূচির অন্যতম দাবীসমূহ ছিল- আন্ঞলিক স্বায়ত্বশাসন, পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দান, পাট শিল্পের জাতীয়করণ, ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন ইত্যাদি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ ১২২, ১১৭-১৩৫।

৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*। ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, ঢাকা, ১৯৯৯।

৮. ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩০।

৯. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ২৭৬।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ২৮০-২৮১।

১১. দেখুন, দৈনিক আজাদ, ২৭. ১১.১৯৫৩ এবং ২৯ .১১.১৯৫৩।

১২. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮২।

১৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১২।

১৪. দেখুন ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮২-৩১৪ (পরিশিষ্ট-গ)।

১৫. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮১-২৮২। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাবটি পেশ করলে ও কংগ্রেস দলের সকল সদস্য একে সমর্থন জানান। কিন্তু পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধীতার ফলে সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার প্রতি অবজ্ঞার প্রতিবাদে ক্রমে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০-২৬।

১৭. সংগঠনটির কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২-১০৩।

১৮. সংগঠনটির উদ্দেশ্য, দাবী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৭-৪৮।

১৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (৩য় খন্ড)*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃঃ ৩০২।
এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের দাবী সম্পর্কে বিস্তারিতের জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২-২১৩।

২০. সংগঠনটির নামকরণ করা হয় ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারী ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের এই অঙ্গ সংগঠনটি টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি।

২১. প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক এই ছাত্র সংগঠনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ সক্রিয় ছিল। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থিত সংগঠন ছিল বিধায় একে 'অতি-বিপ্লবী' বলে চিহ্নিত করা হয়। ফলে সাধারণ ছাত্রদের কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। যদিও এক সময় প্রগতিশীল, বামরাজনীতি ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সেরা মুসলমান ছাত্ররা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬। এম এম আকাশ, *ভাষা আন্দোলন ঃ শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃঃ ৬০।

২২. অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু কমিউনিষ্টপন্থী নয়, এমন কিছু সংখ্যক ছাত্রদের নিয়ে এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে। এবং ১৯৪৯-এর জানুয়ারীর দিকেই এর লক্ষ্য, কর্মসূচী এবং গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ করা হয়। এতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলা এবং অবিলম্বে বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষা করার দাবী জানানো হয়। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে স্বাধীনভাবে সংগঠনের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে চায় সংগঠনটি। কিন্তু এটিও বেশীদিন স্থায়ী হতে সক্ষম হয়নি।

২৩. প্রধানত কমিউনিষ্ট পার্টির অনুপ্রেরণায় এটি গঠিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে ইডেন ও কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয় রাজপথে ছাত্রী সংঘের নেতৃত্বে মিছিলও বেরোয় যা সাবইকে বিস্মিত করে। কারণ, ঐ ধরণের ঘটনা ছিল পাকিস্তানে প্রথম। তবে এই সংগঠনটি ও বেশিদিন কাজ করতে পারেনি। দেখুন, ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬৪।

২৪ ''শাসক মুসলিম লীগ নির্বাচন পিছালো, এমনকি উপ-নির্বাচনে যেতেও সাহস পাচ্ছিলো না। অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে, একটা সময় দেখা গেলো প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে চৌত্রিশটি আসন শুন্য পড়ে আছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের নীতিও ছিল তাই। কারণ শাসনের চরিত্র আমলাতান্ত্রিক এবং সর্বজনীন ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল তাদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে এ ভরসাও তারা করতে পারছিলো না। এ সমস্যাটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণ, পাকিস্তানের শাসক আমলাদের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী যাদের কোন রকম সমর্থন ছিলনা পূর্ববঙ্গে অথচ পূর্ববঙ্গবাসীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাসকদের মধ্যে আবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পাঞ্জাবীরা যারা সামরিক -বেসামরিক দু'ক্ষেত্রেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।'' উদ্বৃত, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪।

২৫. এই নির্বাচনে ''পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা '' অনুসৃত হয়। যুক্তফ্রন্ট কেবল মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ২৩৭ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলো এবং ২২৮ টি আসনে জয়ী হয়। তন্মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩ টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮টি, নিজাম-ই-ইসলাম ২২ টি, গণতন্ত্রী দল ১৩ টি এবং খিলাফতে রব্বানী ২টি আসন লাভ করে। দেখুন, আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পন্ঞাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩২৩-৩৩৩।

২৬. মিনার মনসুর, 'বাংলাদেশ (১৯৪৭-'৮২)ঃ সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১১৭।

২৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৪-১১৯।

২৮. এ প্রসঙ্গে রঙ্গলাল সেন মন্তব্য করেছেন, "However, as the political situation developed in favour of the UF, the conservative party, the NIP which was led by Maulana Atahar Ali, Somehow managed to

Dhaka University Institutional Repository

enter the said alliance." দেখুন, Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka, 1986, P. 118.

২৯. দেখুন, ডঃ মোঃ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৯০।

৩০. দেখুন, Rangalal Sen, *ibid*, P. 125.

৩১. ১৯৪৭সালে ভারত ভাগের পর পাকিস্তান গণপরিষদের মোট ৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ৫০ জন মুসলিম লীগের (তন্মধ্যে পূর্ব বাংলায় ৩১ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯ জন) সদস্য, সাধারণ সদস্য ১৯ জন (পূর্ব বাংলার ১৩ জন, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪ জন, পশ্চিম পাঞ্জাবের ২ জন)। পরবর্তীতে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯ জন। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো ১০ জন সদস্যকে মুসলিম লীগ সরকার গণপরিষদ ভুক্ত করেন। উল্লেখ্য, গণপরিষদে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সদস্যদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য। যারা প্রকারন্তরে ছিলেন বাঙালি বিদ্বেষী। এঁরা হলেন, গোলাম মোহাম্মদ, লিয়াকত আলী খান, আই এইচ কোরেশী, মোহাম্মদ হোসেন, আবদুর রব নিস্তার, আবদুল কাইউম খান। দেখুন, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮', *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, ১৯৯৭।

৩২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫-১১।

৩৩. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৬।

৩৪. "১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভক্ত হবার ভেতর দিয়ে পূর্ব-বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের যে ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলন এবং তার বাস্তবায়নে সে সম্ভাবনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-রদ হয়ে গেলেও বাঙালী মুসলমানদের সেই আকাঙ্খা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী মুসলমানের এই চেতনাকে ব্যবহার করে অবাঙ্গালী নেতৃত্ব পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে সেই আকাঙ্খাকে পূরন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মুসলমান জনসাধারণ আবেগতাড়িত হয়ে ব্যাপকভাবে সে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল কিন্তু নেতৃত্বের সেই প্রতিশ্রুতির পেছনে যে কোনো সত্য নেই, এ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মম কথাটি প্রমাণ হতে বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছেও বেশীদিন লাগেনি। পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ ভাষা-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তার সকল জবাব দিয়েছিল। যে-জবাবের যৌক্তিক পরিনতি ঘটেছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে।'' আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলনঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃঃ ৫৮।

৩৫. সাক্ষাৎকার ঃ কলিম শরাফী, ২৭.৭.১৯৯৭।

৩৬. ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, লোকবক্তৃতামালা-৭, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ১১।

৩৭. সাক্ষাৎকারঃ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ১৫.১০.১৯৯৭।

৩৮. বশীর আল হেলাল, 'ভাষা আন্দোলনের চরিত্র বিচার', *সুন্দরম*, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০০-জৈষ্ঠ্য ১৪০১, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৯৪।

৩৯. ''সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষাকে প্রাধান্য না দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। তথচ উর্দু পাকিস্তানের কোন লোকেরই ভাষা নয়। পুরো পাকিস্তানে উর্দু কেউ বলেনা। পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পসতু বলে, উর্দু বলেনা। উর্দু বলতো পাকিস্তানে আগত রিফিউজীরা। বস্তুত, বাঙালিদের দমনের জন্য বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু সেটা যে সহজে হবেনা, হয়নি তা বলাই বাহুল্য।'' সাক্ষাৎকারঃ কলিম শরাফী, *প্রাগুক্ত* ।

৪০. ''বস্তুত, ১৯৫২-তে ছাত্রদের উপর গুলি চলার পর একটা লোকাল সাপোর্ট তৈরী হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, মানুষ পুলিশকে সপোর্ট করছে না, ধর্মঘট করতে বল্লে দোকান-পাট বন্ধ রাখছে। ছাত্ররা মাইক্রোফোনে প্রচার চালাচ্ছে, সেসময় বাধা দিচ্ছে না। এমনকি পুরনো ঢাকার মহল্লা সর্দাররাও ছাত্রদের সমর্থন/সাহায্য করছেন। আমি একদম নাম উল্লেখ করে বলছি, সিদ্দিক বাজার এলাকার সর্দার ছিলেন মতি সর্দার, মুসলিম লীগের সংগে জড়িত ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ফরমার্লি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি ভালো বাংলা বলতে পারতেন না। কিন্তু গুলি চলার পর পুরোপুরি ছাত্রদের সমর্থন করলেন। আরেকটি মহল্লা নারিন্দা ও একটি ভাল সমর্থন

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। অথচ পুরনো ঢাকার মহল্লা ছিল '৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে।'' সাক্ষাৎকার ঃ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

৪১. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা ১৯৮৩, পৃঃ ৩০।

৪২. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৭।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৪।

৪৪. আরবীতে বাংলা ভাষার হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৫-২১৮।

৪৫. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০।

৪৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৯-২২১।

৪৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৭৫২-৭৫৪।

৪৮. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৪, ২২৪-২২৫ এবং ২২৭।

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২৭।

৫০. এর পেছনে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রচার, এর আর্দশ, স্বরূপ নির্মাণে সে সময় বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিদের প্রয়াস পটভূমি হিসেবে প্রেরণা যোগায়। বিশেষত চল্লিশের দশকে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৩-১২৪।

৫১. এ প্রসংগে কবি ফররুখ আহমেদের কথা উল্লেখযোগ্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই* ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৪৪-৪৭।

৫২. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, *বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৫।

৫৩. দেখুন, *প্রাগুক্ত*, ১১৫। ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬।

৫৪ কামাল লোহানী, *প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, সমাজ-চেতনা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৬-১৭।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুবলীগের কালচারাল স্কোয়াডের সংগে যুক্ত হলেন বরিশাল ও রংপুর থেকে আগত যথাক্রমে আলতাফ মাহমুদ ও নূরুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া অজিত রায়ও রংপুর থেকে ঢাকা আসেন। এরা সকলেই বিশেষত গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছিলেন। ১৯৫২-র আগষ্ট মাসে (২২-২৪) কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন' -এ পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ ঢাকা আর্ট গ্রুপ, অগ্রনী শিল্পী সংসদ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এরপর প্রায় পুরো বছর জুড়ে মানুষকে উজ্জীবিত করার মানসে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদের সাংস্কৃতিক স্কোয়াড সারা দেশ ব্যাপী গণসাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। চট্টগ্রামে গণনাট্য সংস্থা (পরিবর্তিত নাম প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ) পাবনার 'শিখা সংঘ' বরিশালে শিল্পী সংঘ' সাংস্কৃতিক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কামাল লোহানী, 'গণসঙ্গীত চর্চা ও আমাদের রাজনীতি', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৬৮ এবং শেখ লুতফর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩-৬৪।

৫৫. এর সংগে যুক্ত ছিলেন সতীশ পাকড়াশী (১৮৯৩-১৯৭৩), রমেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), কিরনশঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), সরদার ফজলুল করিম (১৯৫২) প্রমুখ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, শেখ লুতফর রহমান, সাঈদ-উর রহমান, বশীর আল হেলাল, কামাল লোহানী, প্রমুখের উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ।

৫৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪-২৫।

৫৭. প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, 'ভাষা আন্দোলন ও তমদ্দুন মজলিশ', *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৮ (পাদটীকা); বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

৫৮. তমদ্দুন মজলিশের লক্ষ্য সম্পর্কে দেখুন, সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৯। এছাড়াও সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার পটভুমি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪-১৯।

৫৯. সংগঠনটির উদ্যোক্তা, কর্মকান্ড সম্পর্কে দেখুন, কামাল লোহানী, 'গণসঙ্গীত চর্চা ও আমাদের রাজনীতি', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৯।

৬০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬১. সংগঠনটির গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে ফয়েজ আহমদ বলেন, প্রগতি লেখক সংঘের মাধ্যমে প্রধানত বামপন্থী প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, মুক্ত-বুদ্ধি চিন্তার অনুসারীরা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি মূলত সরকারের দমননীতির কারণে। সুতরাং এরাই পরবর্তীতে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফর্মে জড়ো হলেন। যাদের অধিকাংশই ছিল তরুণ। সে সময় তাদের কেউ জায়গা দেয়নি। তখন সওগাত সম্পর্কে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন তাঁর পত্রিকা অফিসে (সওগাত) তাদের কার্যক্রম চালাবার জন্য স্থান করে দেন। সংসদ সওগাত অফিসে পাক্ষিক সাহিত্য সভায় আয়োজন করত সেখানে প্রধানত প্রগতিশীল সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সমালোচনা হত। এই সংগঠনের সংসদ কেন রাখা হয় - এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকারীরা অর্থাৎ যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু দলটির নাম সে সময় রাখা হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। সেরকমভাবে সাহিত্য সংসদও যখন গঠিত হয় তখন এর নামকরণ করতে হয় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। বস্তুত, সরকারের কাছে রিপোর্ট ছিল যে বামপন্থী অনুসারী প্রগতি লেখক সংঘের উচ্ছেদকৃতরাই এটি গড়ে তুলেছে। এর সাথে যুক্তরা হলেন কাজী মোতাহার হোসেন (সভাপতি), ফয়েজ আহমেদ (সম্পাদক), হাসান হাফিজুর রহমান, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবদুল গনি হাজারী, শামসুর রাহমান, আতোয়ার রহমান, আনিসুজ্জামান, আতাউর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, অজিত গুহ, খালেদ চৌধুরী, খান সারওয়ার মোর্শেদ, হাবিবুর রহমান, সৈয়দ নুরুদ্দীন, কামরুল হাসান, আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, প্রমুখ আরো অনেকে। সাক্ষাৎকারঃ ফয়েজ আহমেদ, মার্চ, ১৯৯৭।

৬২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শেখ লুতফর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬১।

৬৩. বাফা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মাহমুদ নুরুল হুদা, *আমার জীবন স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৯৯।

৬৪. সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন ১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস। (সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ৫৫)। আর রেজোয়ান সিদ্দিকীও সন-তারিখ একই লিখেছেন (যদিও পাদটীকা সাঈদ-উর রহমানের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন) তবে এসংগে যুক্ত করেছেন সামরিক শাসনের পর এটি গঠিত হয়। কিন্তু সংগঠনটির সম্পাদক আবদুল কালাম শামসুদ্দীন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন ১৯৫৯ সাল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রথমোক্ত দু'জন (যেহেতু তারা এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন) বিশেষত সাঈদ-উর রহমানের বক্তব্য গ্রহণ করে সংগঠনটিকে এ সময়পর্বের আলোচনাভুক্ত করেছি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৯।

৬৫. দৈনিক আজাদ, ঢাকা,২৭.৪.১৯৫৮। উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।

৬৬. ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৬২।

৬৭. আজাদ, ১.১.১৯৪৯, উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৯।

৬৮. সাক্ষাৎকারঃ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

৬৯. দেখুন, বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১। এছাড়া সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৮-১৬১।

৭০. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০১।

৭১. দেখুন, বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৪।

৭২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ২১২।

৭৩. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০১।

৭৪ দৈনিক আজাদ, ঢাকা ২৬.৪.১৯৫৪, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৩।

৭৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৮।

৭৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৮।

৭৭. দেখুন, ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬২।

৭৮. শতবার্ষিকী আয়োজনকারী বিভিন্ন সংগঠনগুলির জন্য দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩৭।

৭৯. সাপ্তাহিক সৈনিক, উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।

৮০. ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তীতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত হয়। এতে বিদ্রোহীরা দিল্লীর মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। সুতরাং উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এটি বিশেষ তৎপর্যবাহী বলে গণ্য।

৮১. সাপ্তাহিক সৈনিক, উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৮৫।

৮৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*।

৮৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫২; সৈয়দ জামিল আহমেদ, 'নাটক ও নাট্যকলা', *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪-১৯৭১ (৩য় খন্ড), ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৪৯৯-৫৯১।

৮৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৬-৩৪৮; সৈয়দ জামিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০১-৫০৪।

৮৬. মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকটি ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে সর্ব প্রথম মঞ্চস্থ হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কারণ তিনি সেসময় কারাগারে বন্দী ছিলেন। তিনি ও তার সঙ্গী অন্যান্য রাজবন্দীরা মিলিতভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সৈয়দ জামিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০২।

৮৭. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৭-১২৮।

৮৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, করুনাময় গোস্বামী, 'সঙ্গীত', *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪-১৯৭১ (৩য় খন্ড), *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪৫-৫৪৬; নাজিম সেলিম বুলবুল, *আমাদের মুক্তি সংগ্রামে গণ-সঙ্গীতের ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ২০-২১; শামসুজ্জামান খান, কল্যানী ঘোষ, *গণ-সঙ্গীত*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ১-১৫।

৮৯. ১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় নিখিল ভারতীয় সম্মেলন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সংক্ষেপে আই পি টি এ এই সম্মেলনেই গঠিত হয়। দেখুন, কামাল লোহানী, 'গণ-সঙ্গীত চর্চা ও আমাদের রাজনীতি' *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৬। করুণাময় গোস্বামী, 'সঙ্গীত', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪৫-৫৪৬।

৯০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫। করুনাময় গোস্বামী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪৬।

৯১. শামসুজ্জামান খান, কল্যানী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯।

৯২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৯।

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩। এছাড়াও বিস্তারিত বিবরনের জন্য দেখুন, করুনাময় গোস্বামী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪৭-৫৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৯৪. ১৯৫০ সালের দিকে 'শিল্পী সংসদ' নামে একটি গণ-সঙ্গীতের দল পুরনো ঢাকায় গঠিত হয়। এছাড়াও 'বালুচর' ও 'মস্তানা' নামক আরো কিছু গণ-সঙ্গীত গোষ্ঠী গড়ে উঠে। ভাষা আন্দোলনের পর অসংখ্য গণ-সঙ্গীত গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখুন, শেখ লুতফর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৭-৪৮, ৫৬, ৬০।

৯৫. এ প্রসংগে শেখ লুতফর রহমান লিখেছেন, ''ঘুম ভাঙ্গানো গানের রেশ থামতে না থামতেই শোনা গেল বাংলা ভুলে দেশবাসীকে উর্দু বলতে হবে, আমরা সংখ্যায় বেশী, --- তাই সেই '৪৮ সালেই এ ঘটনার প্রতিবাদ করি --- এ গানটি গাওয়ার ভেতর দিয়ে।'' বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪-৩৬ এবং ৬০।

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫।

৯৭. শামসুজ্জামান খান, কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩।

৯৮. গানটি হল, ''ভুলব না, ভুলব না এ একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না/লাঠি, গুলি আর টিয়ার গ্যাস, মিলিটারী আর মিলিটারী/ভুলব না।'' বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শামসুজ্জামান খান, কল্যানী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩-৬৪।

৯৯. এসব গণ-সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শামসুজ্জামান খান, কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*; শেখ লুতফর রহমান,*প্রাগুক্ত*; নাজিম সেলিম বুলবুল,*প্রাগুক্ত*

১০০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শামসুজ্জামান খান, কল্যানী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৫-৬৯।

১০১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কামাল লোহানী, *প্রগতিশীল সংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, প্রাগুক্ত, শামসুজ্জামান খান, কল্যানী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, নাজিম সেলিম বুলবুল, *প্রাগুক্ত* ।

১০২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শেখ লুতফর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০-৫৫।

১০৩. হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন ঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, ঢাকা, ১৯৯০,পৃঃ ১০।

১০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০।

১০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

১০৬. সাক্ষাৎকারঃ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

১০৭. *প্রাগুক্ত* ।

১০৮. ওয়াহিদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২-২৩।

১০৯. ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১১।

১১০. ওয়াহিদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামরিক শাসনের অভিঘাত
(১৯৫৮-১৯৬৫)

১

প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ২৪ অক্টোবর আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ২৭ অক্টোবর রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন। আইয়ুব খান ২৮ অক্টোবর এক সরকারি আদেশ জারীর মাধ্যমে নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীর পদ বাতিল করেন। এভাবে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অবসান এবং একনায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসনের উত্থান ঘটে। এ ধরনের ঘটনা পাকিস্তানে ছিল এই প্রথম যা সবাইকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল। অবশ্য রাজনীতিবিদদের আচরণেও জনমানুষের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এর ফলে দেখি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তখনই কোন প্রতিবাদ হয়নি। বরং অনেকেই একে স্বাগত জানিয়েছিল। এর একটি কারণ হল, সামরিক শাসন সম্পর্কে মানুষের সম্যক ধারণাও ছিলনা। কিন্তু মূল ব্যাপারটি হল এই, জন্মের পর অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক শাসনের (সামরিক-বেসামরিক) ক্ষমতা দখলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তারই চূড়ান্ত পরিণতি আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল।[১]

অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতাদখলের পর অন্যান্য দেশের সামরিক জান্তাদের মত আইয়ুব খানও একটি গণতান্ত্রিক মুখোশ পড়তে সচেষ্ট হন। এবং সে সঙ্গে উদ্যোগী হন যাতে কেউ এই গণতন্ত্রের বিরোধিতা করতে না পারে।[২] বস্তুত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত এসব পদক্ষেপসমূহ ছিল তাঁর একনায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসন তথা আমলা শাসনের বৈধতা প্রমাণ ও ক্ষমতা সংহতকরণেরই বিভিন্ন কৌশল মাত্র। এজন্য দেখি, আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে পোডো ও এবডো আইন, মৌলিক গণতন্ত্র,'৬২-তে সংবিধান প্রণয়ন ৬৫-তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করছেন এবং এসব সত্ত্বেও সম্কট দেখা দিলে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন। এরই আলোকে দেখা যায় তাঁর বাঙালি

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্বেষ নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত, বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে তাঁর গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহ ছিল দৃষ্টিভঙ্গীজাত যা বলা চলে ১৯৪৭ থেকে সামরিক শাসন জারীর পূর্ব পর্যন্ত কালপর্বেরই পুনরাবৃত্তায়ন।[৩] ফলে জনগণের মোহ কাটতে দেরী হয়নি। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন স্থবিরতা বিরাজ করছিল তখন সাংস্কৃতিক কর্মীরাই প্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসেন। ''এসব কর্মকান্ডের মৌল বক্তব্যটি ছিল জাতি হিসেবে বাঙালির স্বাতন্ত্র চিহ্নিত ও সংহতকরণ এবং এর দ্বারা জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ যা অন্তিমে সহায়তা করবে সামরিক শাসন উৎখাত ও গণতন্ত্র আনয়নে যার অন্য অর্থ ছিল সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা।''[৪]

এখানে আমি প্রথমে ১৯৫৮-৬৫ সাল পর্যন্ত আইয়ুব খান কি ভাবে ক্ষমতা সংহতকরণের প্রচেষ্টা চালান এবং তার বিপরীতে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিক্রিয়া কি ছিল তা আলোচনা করব। পরে এ পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অলোচিত হবে।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন

১৯৫৯ সালে ডিসেম্বরে আইয়ুব খান ''মৌলিক গণতন্ত্র'' আদেশ জারী করেন। উদ্দেশ্য সামরিক শাসনে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে তা তুলে ধরা।[৫] এবং এ লক্ষ্য পূরণে ''তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থক-গোষ্ঠী সৃষ্টি করা।[৬]'' অতঃপর তাঁর ক্ষমতাকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখাতে চান সামরিক শাসনে গণমানুষের সমর্থন রয়েছে। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং পাকিস্তানের উভয় অংশ হতে নির্বাচিত আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত আস্থা ভোটের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারীতে তিনি পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭৯,৮৫০। মোট প্রদত্ত ভোট সংখ্যা ছিল ৭৮,৭২০ (৯৮.৪ শতাংশ)। পক্ষে ছিল ৭৫২৮৩ (৯৫.৬ শতাংশ), বিপক্ষে ২,৮২৯ (৩.৯ শতাংশ), বাতিল ভোট ছিল ৬০৮ (০.৮ শতাংশ)।[৭] এখানে উল্লেখ্য যে, ''ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনের আগে আইয়ুব দু'টি বিধান জারী করেছিলেন। এর একটি হলো 'পাবলিক অফিসেস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার' (পোডো) এবং অপরটি 'ইলেকটিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার' (এবডো)। এ দু'টি বিধানের বলে, আইয়ুবের সম্ভাব্য

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদের নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলো। মহকুমা প্রশাসক ও সার্কেল অফিসাররা নির্বাচন পরিচালনা করলেন অতি যত্নের সঙ্গে। এর অর্থ, আইয়ুবের পক্ষে যাতে ভোট পড়ে তার জন্য প্রশাসনকে ব্যবহার করা।''[৮]

যাই হোক, মৌলিক গণতন্ত্রীরা এই পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে একটি সংবিধান প্রণয়নের অধিকার প্রদান করে।

খ. সংবিধান প্রণয়ন

পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আইয়ুব খান সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী এগারো সদস্যের একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন পাকিস্তানের উভয় অংশে সফর করে প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ে সচেষ্ট হন। এই সুযোগ গ্রহণ করে ''পূর্ব পাকিস্তানে ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ১৩ টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ''[৯] স্বায়ত্বশাসন, সংসদীয় গণতন্ত্র, ফেডারেল শাসনতন্ত্র, যুক্তনির্বাচন এং ১৯৫৬ সনের সংবিধানের পক্ষে তাঁদের মত প্রদান করেন।[১০] মূলত, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণেরও কাম্য ছিল এসব যার সারমর্ম হচ্ছে সামরিক শাসনের বিলোপ সাধন। পশ্চিম পাকিস্তানেও দেখা যায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা, মৌলিক গণতন্ত্র ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনের কঠোর সমালোচনা করে শাসনতন্ত্র কমিশনের নিকট একটি স্বারকলিপি পেশ করেন।[১১] পত্র পত্রিকায় এসব বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ, আইয়ুব খান সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে সাংবাদিকদের উপস্থিতি এবং এসব বক্তব্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। যদিও ইতোপূর্বে আইয়ুব খান মত ব্যক্ত করে বলেন ''তাঁর নিজের মতামত যাই হোক না কেন, শাসনতন্ত্র কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এবং উক্ত কমিশন দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে সুপারিশ করবে তা তিনি মেনে নেবেন।''[১২] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, ১৯৬১ সালে শাসনতন্ত্র কমিশন প্রদত্ত রিপোর্টে যখন বলা হল ''পাকিস্তানের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয়''[১৩], তখন স্বভাবতই আইয়ুব খান তা উপেক্ষা করেন। কারণ, গণতন্ত্রের আবরণে তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাচ্ছিলেন। অতএব, ১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর নতুন একটি কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

গঠন করেন তাঁর পছন্দ মাফিক সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন সংবিধান ঘোষিত হয় এবং ৮ জুন তা কার্যকর হয়। স্বভাবতই এই সংবিধান ছিল অগণতান্ত্রিক অর্থাৎ জনমতের প্রতিফলন এতে ঘটেনি, বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের দাবী উপেক্ষিত হয়। এই সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। রাজনৈতিক দল, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন বিধান এতে ছিলনা। এবং অমুসলমানের প্রেসিডেন্ট হবার অধিকার পূর্বের ন্যায় খর্ব করা হয়। মোট কথা, এই আইয়ুবী সংবিধানে জাতীয় সংসদের কোন ক্ষমতাই ছিলনা, বরং সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে প্রদান করা হয়।[১৪] ১৯৬২ সালের মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা নির্দলীয়ভাবে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সামরিক শাসনামলে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনেও 'এবডো' প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের শীর্ষস্থানীয়, অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এছাড়াও অনেকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। ফলে রক্ষণশীল রাজনীতিবিদেরা নির্বাচনে জয়লাভে সক্ষম হন। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিতদের অনেকেই পরবর্তিতে আইউব খানের ক্ষমতা দৃঢ়করণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন।[১৫] ১৯৬২ সালের ৮ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সামরিক শাসন তুলে নেয়া হয়।

গ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৯৬৫

১৯৬২ -র সংবিধানে প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর নির্ধারিত হয়। যেহেতু মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সুতরাং, সে হিসাবানুযায়ী ৩ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। বস্তুত, এটিও ছিল তাঁর ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণের আরেকটি পদক্ষেপমাত্র। কেননা, এর মাধ্যমে তিনি '৬২-র সংবিধানের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে চান।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় প্রধান দুজন প্রার্থী আইয়ুব খান ও 'মাদারে মিল্লাত' ফাতেমা জিন্নাহ্‌র মধ্যে। উল্লেখ্য, সামরিক শাসনের অবসানের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (কম্বাইনড অপোজিশন পার্টি সংক্ষেপে 'কপ') গঠন করে এবং এই নির্বাচনী জোট তাঁদের প্রার্থী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে মনোনয়ন প্রদান করে। আইয়ুব বিরোধীরা বিশেষত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী অর্থাৎ ছাত্র, বুদ্ধিজীবী সমাজ এতে সমর্থন ব্যক্ত করেন।[১৬]

নির্বাচনে বিরোধী পক্ষকে নাজেহাল করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইতোপূর্বে মার্চ মাসে নির্বাচনের কথা বলা হলেও অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে তা ২রা জানুয়ারী এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। উদ্দেশ্য বিরোধীপক্ষকে নির্বাচনী প্রচারণায় কম সুযোগ দেয়া।[১৭] তদুপরি, আইয়ুব খান সরকারি তহবিল, প্রশাসন, প্রচার মাধ্যমকে তার নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করে।[১৮] ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ চাঁদাস্বরূপ আদায় করা হয়।[১৯] কনভেনশন মুসলিম লীগও তাঁদের প্রার্থী আইয়ুব খানকে জয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।[২০] বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়। এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহ্‌র বিরুদ্ধে নিজের জয় সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিল বিধায় পুনরায় সামরিক শাসন জারী সহ নির্বাচনের ফলাফল অমান্য করার হুমকিও দেন।[২১] স্বভাবতই ফলস্বরূপ নির্বাচনে আইয়ুব খান বিজয়ী হন।[২২] আইউব সমর্থনপুষ্ট অধিকাংশ মৌলিক গণতন্ত্রীরা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার্থেই তাঁকে ভোট প্রদান করে জয়যুক্ত করে। উল্লেখ্য, আইউব খান ঢাকা শহরে পরাস্ত হন[২৩] যা গণতন্ত্রীকামী মানুষের সামরিক শাসন বিরোধী ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল।

ঘ. পাক ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমেই শুরু হয় এই যুদ্ধ। সতের দিন স্থায়ী হবার পর জাতিসংঘের নির্দেশে ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন হয়। অবশেষে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে উভয় পক্ষ তাসখন্ড শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু পুরো যুদ্ধকালীন সময় পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল। এতে বাঙালিদের মনে অসন্তোষ দেখা দেয় যুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে।

১ .২।। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসনজারীর পর রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক কার্যক্রম, সভা-সমিতি, ১৯৫৬-র সংবিধান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা, সাধারণ নির্বাচন (১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য) সহ সকল প্রকার মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। এই সময় এবডো, পোডো আইনের মাধ্যমে বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। বস্তুত, রক্ষণশীল রাজনৈতিক ধারার অনুসারী সামরিক শাসক আইয়ুব খানের লক্ষ্যই ছিল গণতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটন করা এবং তাঁর উত্থান ছিল পাকিস্তানী আমলা শাসনের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি। আইয়ুব খান অনায়াসে তাঁর ক্ষমতা দৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সফল হন।

এর বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক ধারার অন্তর্ভুক্ত মধ্যপন্থী, বামপন্থী রাজনীতিবিদ তথা রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশ্যে জোরালো প্রতিবাদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। সামরিক শাসনের দমননীতি সহজেই রাজনীতিবিদদের ভীত করতে সক্ষম হওয়ায় এই সময় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এক ধরনের স্থবিরতা নেমে আসে। কিন্তু এর পাশাপাশি দেখা যায় অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদেরা ব্যর্থ হলেও রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালি ছাত্র সমাজ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এবং তাদের এই আন্দোলন রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন ছিলনা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক কর্মীরাই এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ গড়ে তোলে এবং তারাই ছাত্রদের উদ্দীপনা যুগিয়েছে।[২৪] ছাত্র অসন্তোষ ক্রমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক রূপ নিতে থাকে। এই সময় সামরিক শাসন উৎখাত করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে সম্ভাবনা ছিল, রাজনৈতিক দল তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেননি। প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের আন্দোলন সূচিত হয়। এবং সামরিক শাসনসহ সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার-বৈষম্যের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল এটি। ক্রমে ছাত্ররা বন্দী ছাত্র-রাজনীতিবিদদের মুক্তি, আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান, মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্রের দাবীতে ধর্মঘট, ঘেরাও কর্মসূচী, দেওয়াল লিখন (পোষ্টারিং), জনসমাবেশসহ বিভিন্নভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। ক্রমবর্ধমান এ আন্দোলনে ভীত হয়ে তা প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। এতে মফস্বল, গ্রামাঞ্চল হতে ঢাকায় আগত ছাত্ররা স্ব স্ব এলাকায় ফিরে যায়। ফলস্বরূপ, তাদের মাধ্যমে সেখানেও সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন সঞ্চারিত হয়।[২৫] কিন্তু রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ততাহীনতার জন্য এই আন্দোলনের সাফল্য সীমিত হয়ে পড়ে।

১৯৬২ সালে শরীফ শিক্ষা কমিশনকে কেন্দ্র করে পুনরায় ছাত্র আন্দোলনের সূচনা ঘটে।[২৬] এবং এটি ব্যাপকতা লাভ করতে থাকলে সরকার কমিশনের বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন। এ পর্যায়েও দেখা যায়, ছাত্রদের আবেদন সত্ত্বেও রাজনীতিবিদেরা আন্দোলনে যোগ দেননি। এই আন্দোলনকালীন সময়ে সোহরাওয়ার্দী মুক্তি লাভ করেন। আমরা দেখি ১৯৫৮-৬৫ এই সময়কালে সামরিক শাসন ও এর অবসান - সব সময়ই ছাত্র সমাজ স্বৈরাচারী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একে ফলপ্রসূ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হন।[২৭] এই পুরোটা সময় (১৯৫৮-৬৫) তাঁদের নমনীয় আচরণের কারণে গণতন্ত্র সহ সকল ন্যায্য দাবী পুনরুদ্ধার পিছিয়ে গেছে। সামরিক শাসনামলে দমননীতির জন্য তাঁরা সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হননি। তবে একেবারে প্রতিবাদ জানাননি তাও নয়। সীমিতভাবে হলে এই প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, প্রথম শাসনতন্ত্র কমিশনের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে নয় নেতা ও তেরোটি সংগঠনের সংসদীয় গণতন্ত্র, ফেডারেল শাসনতন্ত্র, যুক্তনির্বাচন, '৫৬-র সংবিধান কার্যকর করার কথা তুলে ধরার মাধ্যমে। এছাড়া সামরিক শাসন সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বেশ কিছু বাঙালি যোগ দেন সামরিক শাসনের স্বরূপ তুলে ধরে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ থাকায় নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু পোডো এবং এবডো প্রয়োগ করে শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। যাই হোক, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল জাতীয় পরিষদের কোন ক্ষমতাই নেই। কারণ নবগঠিত মন্ত্রীসভা জাতীয় পরিষদের কাছে নয়, বরং প্রেসিডেন্টের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। স্বভাবতই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবুও জাতীয় পরিষদে বাঙালি সদস্যরা

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যবদ্ধভাবে মৌলিক অধিকার পূণঃপ্রতিষ্ঠা, বিনা বিচারে আটকের ক্ষমতা বিলোপ, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, রাজবন্দীদের মুক্তি, বাজেট ও অর্থ বিলের ওপর ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে সাবলম্বীকরণ ইত্যাদির দাবী জানায়। আইয়ুব খান তাঁদের ঐক্য বিনষ্ট করার কৌশল স্বরূপ সংবিধান সংশোধন করে তাঁর মন্ত্রীসভায় পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচজন সদস্যকে নিয়োগ দান করেন।[২৮] উল্লেখ্য সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হলে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এবং তারা পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের কাছে সংসদে সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরাসহ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করার অনুরোধ জানায়।[২৯] ইতোপূর্বে সদস্যরা সকল অন্যায়-অবিচার-বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে বাঙালিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে প্রতিশ্রুতিগুলো হলো-

"১. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্য দূর করা হবে।

২. বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে সব অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিকার করা হবে।

৩. সকল রাজবন্দীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করা হবে।

৪. রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দানের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হবে।

৫. পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা হবে।"[৩০]

পূর্ব পাকিস্তানের জনমানসের আশা -আকাঙ্খার প্রতিভু এই দাবীসমূহ কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট না হয়ে বরং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সদস্যদের অবহিত না করেই এই পাঁচজন মন্ত্রীসভায় যোগ দেন।[৩১] বস্তুত, ১৯৫৪'র নির্বাচনে পরাজিতরাই এই মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। এর বিরুদ্ধে অন্যান্য অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা সমালোচনা করে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করেন যাকে বলা চলে আইয়ুব খানের প্রতি এক ধরনের বিরুদ্ধাচারণ। এটি তাঁর এক ধরনের পরাজয় ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এই সত্যটিই প্রকট হয়ে ওঠে যে, আইয়ুব খানের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত এবং নিজ ক্ষমতা সংহতকরণের লক্ষ্যে ইচ্ছেমাফিক সংবিধান সংশোধন করেছেন এবং আরো করবেন। এক্ষেত্রে উচিত -অনুচিতের প্রশ্ন অবান্তর মাত্র। সে সাথে এটিও সত্যি যে, রাজনীতিবিদদের নমনীয়তা, আপোষকামীতার ফলে আইয়ুব খান তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও তাঁদেরই কারণে তিনি সংবিধান সংশোধন করে তার

Dhaka University Institutional Repository

শাসনতান্ত্রিক দর্শন''[৩২] পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক যে রাজনীতিবিদেরা আইয়ুব বিরোধী এই ক্ষমতাকে গণমানুষের আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়নে প্রয়োগ করেননি বা সমর্থ হননি।

১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। এর ফলে সামরিক শাসনামলের পদক্ষেপসমূহের অবসান হয়নি। তবে ধীরে হলেও পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে থাকে। সুতরাং, আইউব খান ক্ষমতা দৃঢ়করণে পূর্বের পদক্ষেপগুলো ছাড়াও নতুন পন্থা গ্রহণ করেন। বস্তুত, ক্ষমতা সংহতকরণ ও ইচ্ছানুযায়ী তা প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক দল গঠন তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।[৩৩] যদিও তিনি রাজনৈতিক দল গঠনের বিরুদ্ধেই ছিলেন এবং সামরিক শাসনামলে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশেষত জনমতের চাপে সরকার কাঠামো ও রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত নীতি সংশোধনে বাধ্য হন। পূর্বেকার রাজনৈতিক দলসমূহের পুনরুজ্জীবন ও নতুন রাজনৈতিক দল গঠন সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে পাশ করা হয়।[৩৪] তবে রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে তাঁর জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য এ আইনে বলা হয় এদের পুনরুজ্জীবন হবে শর্তযুক্ত। বিশেষত এর মাধ্যমে যে সব রাজনীতিবিদ এবডো বা নিরাপত্তা আইনে দন্ডিত হয়েছেন তাঁদের রাজনৈতিক দলে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।[৩৫] উদ্দেশ্য শীর্ষস্থানীয় প্রধান রাজনীতিবিদদের রাজনীতির বাইরে রাখা। ফলে সামরিক শাসনের অবসান ও রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আইন পাস সত্ত্বেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে সহসা পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে দেখা যায়, জামায়াতে ইসলামী, নিজাম-ই-ইসলামী প্রভৃতি ইসলামী মৌলবাদী দলসহ কয়েকটি ক্ষুদ্র দল পুনরুজ্জীবিত হয়। ইতোপূর্বে ১৯৬২-র ২৪ জুন বিভিন্ন দলের নয়জন রাজনীতিবিদ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আইউবী সংবিধানের সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান সংবিধানে গণমানুষের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি। কারণ, এটি গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণয়ন করা হয়নি। সুতরাং জনসমর্থনহীন এই সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এই বিবৃতি উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও আইউব খান একে আমলে নেননি।[৩৬] জেল থেকে মুক্তিলাভের (১৯ আগষ্ট) পর সোহরাওয়ার্দী এই বিবৃতি অর্থাৎ ''শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের'' প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৩৭] এ লক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর পূর্ব ও পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের ৫৪ জন রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সংক্ষেপে এন ডি এফ) নামক একটি দলহীন জোট গঠিত হয়। সরকার সমর্থক কনভেনশন মুসলিম লীগ বাদে প্রায় সব দলের সমর্থন লাভে এটি সক্ষম হয়।[৩৮] একমাত্র ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ছাড়া বিভিন্ন দলের মধ্যে এরূপ ব্যাপক ঐক্য পূর্ব পাকিস্তানে দেখা যায়নি। স্বভাবতই গণমানুষ এতে আশান্বিত হয়েছিল, ভেবেছিল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে পূর্বের ন্যায় রাজনীতিবিদদের এই ঐক্য, সম্মিলিত প্রয়াস ব্যর্থ হবেনা। এন ডি এফ -এর জনসভাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ সমবেত হয়ে সমর্থন জানাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ফ্রন্ট কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি। এর সম্ভাব্য কারণ সমূহ ছিল-

"১. নেতৃত্বের প্রশ্ন এবং এ সম্পর্কে মৈতেক্যের অভাব,
২. কর্মসূচীর প্রশ্ন এবং এ সম্পর্কে মৈতেক্যের অভাব,
৩. আদর্শগত অন্তর্বিরোধ
৪. সোহরাওয়ার্দী, নূরুল আমীন ও আরো অন্যান্য নেতার দীর্ঘ অসুস্থতা ও বার্ধক্য
৫. রাজনীতিতে 'এবডো' দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণের ওপর আইনগত নিষেধাজ্ঞা এবং আইন অমান্য করার প্রশ্নে মতবিরোধ।"[৩৯]

উল্লেখ্য, ফ্রন্টভুক্ত প্রধান নেতৃবর্গের অনেকেই এবডো আইনে দন্ডিত হওয়ায় তাঁদের রাজনৈতিক দলে যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা নতুন আইন সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের পুরুজ্জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ এতে নেতৃত্ব তাঁদের কাছ থেকে তরুণ নেতৃত্বের কাছে চলে যাবে।[৪০] বিশেষত সোহরাওয়ার্দীর অভিমত ছিল, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। যা এন ডি এফ -এর মতো বহুদলীয় জোটের দ্বারাই সম্ভব। সেজন্য তিনি একক রাজনৈতিক দল গঠনের বিরোধী ছিলেন।[৪১] কিন্তু দল গঠনের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শেখ মুজিব লন্ডনে যান সোহরাওয়ার্দীর সম্মতি লাভের আশায়। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন।[৪২] সোহরাওয়ার্দী ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলোর অনুপস্থিতিজনিত কারণে ১৯৬৩ সাল নাগাদ রাজনৈতিকভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন সম্ভব হচ্ছিল না। যাইহোক, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর (৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩) ফলে এই বিরোধিতা অনেকাংশেই হ্রাস পায়। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও মুসলিম লীগ ভেঙ্গে এর একাংশ নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব দল 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' গঠন করেন (১৯৬২-র ৫ সেপ্টেম্বর)। এ দলের প্রাদেশিক সংগঠক নিযুক্ত হন প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম। মুসলিম লীগের বাদবাকী অংশ 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' নামে পরিচিতি লাভ করে। খাজা নাজিমউদ্দীন এর সভাপতি নিযুক্ত হন।[৪৩] বিজয়ী হবার মানসে আইয়ুব খান তাঁর দলকে শক্তিশালী করে তুলতে থাকেন। এ কাজে তিনি সরকারি অর্থ, প্রচার মাধ্যমকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন। তদুপরি রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবনের সুযোগে জামায়াতে ইসলামী, নিজাম-ই- ইসলামীসহ কয়েকটি ক্ষুদ্র দল পুনরুজ্জীবিত হয়। এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহের অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁদের হাতে চলে যেতে থাকায় তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপর্যুক্ত কারণসমূহ প্রগতিপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোকে পূনরুজ্জীবিত হতে উৎসাহী করে। যার জন্য দেখা যায় ১৯৬৪ সালের প্রথম পাদে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ পুনর্গঠিত হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করে দলের প্রধান রাজনীতিবিদদের মধ্যে পুনরায় ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এন ডি এফ এবং ৩৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন।[৪৪] এন ডি এফ-এর সভাতে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪) সরকারের প্রতি পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষিত করার কথাও বলা হয়।[৪৫] এসব বিরোধিতা, মত পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলো পুনরায় একে একে পূনরুজ্জীবিত হয় একমাত্র কৃষক শ্রমিক পার্টি বাদে। এটি এন ডি এফ-কে আঁকড়ে থাকে। রাজনৈতিক দলের পুনরুত্থান ও কার্যক্রম স্বভাবতই আইয়ুব খান ও তাঁর অনুগত পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খানকে ভীত করে তোলে। সরকার কর্তৃক নানা প্রকার দমন, বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হবার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে থাকে। কারণ বিগত পাঁচ বছরে সামরিক দমননীতির কারণে এর নেতা-কর্মীদের অনেকে কারারুদ্ধ, অনেকে আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ, ন্যাপে যোগ দিয়েছে।[৪৭] এসব সত্ত্বেও দেখা গেল আওয়ামী লীগ অল্প সময়েই এ লক্ষ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। এবং মূলত এই সময়েই সরকার বিরোধী দৃঢ় রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনার মাধ্যমে একজন সুদক্ষ নেতা ও সংগঠক হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থান, বিকাশ ঘটতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্গঠিত হবার পর বামপন্থী দলগুলোর অন্যতম ন্যাপ তথা এর নেতা মাওলানা ভাসানী সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী জানালেও কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর তাঁর ভূমিকা কিছুটা রহস্যপূর্ণ, নমনীয় বা আপোষমুখী বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। কেননা তিনি একদিকে যেমন এন ডি এফ-এর প্রতি সমর্থন জানান, অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গেও সংযোগ রাখছিলেন। উল্লেখ্য, কপ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর নিস্ক্রিয় আচরণ ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। উপরন্তু তিনি সরাসরি কখনোই আইয়ুব খানের বিরোধিতাও করেননি। যা এক অর্থে আইয়ুব খানের প্রতি সহযোগিতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তিনি ন্যাপকে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক না রেখে বরং সচেষ্ট হন পাকিস্তানের উভয় অংশে এর কার্যক্রম বিস্তারে।[৪৮] অপর বামপন্থি দল কম্যুনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ফলে পার্টি কর্মীরা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেই এ সময় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৬৪ সালের মে মাসে পুরোটা সময় ধরে ঢাকায় এই আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবী আদায়ে শ্রমিকরা সোচ্চার থাকে। আওয়ামী লীগও এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল।[৪৯]

একটি ঘটনা এ সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে সাড়া জাগায়, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৬৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মাদারে মিল্লাত ফাতেমা জিন্নাহ্ পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঈদ বাণীতে বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক নির্বাচনই হচ্ছে রাজনৈতিক শিক্ষার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সরকারপন্থি কনভেনশন মুসলিম লীগ একে দুঃখজনক, উস্কানীমূলক বলে বিবৃতি দিলেও আওয়ামী লীগ সহ প্রায় সকল বিরোধী দল এর প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে পাল্টা বিবৃতি দেয়। সরকারি দলের বক্তব্যের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে নিন্দা জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ছাত্রলীগ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ।[৫০]

১৯৬৪ সালের ১১ মার্চ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনসহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'। এ লক্ষ্যে সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠন ও আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।[৫১] সরকারি বাধা সত্ত্বেও মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। উল্লেখ্য, ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন রোখার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

মোনায়েম খান 'জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন' (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন সংক্ষেপে এন এস এফ) গঠন করে। ছাত্র নামধারী তাঁর এই অনুগত বাহিনী বিভিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রাবাসগুলোতে সন্ত্রাস কায়েম করে।[৫২] আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে এ সময় চৌদ্দশত স্কুল ও চুয়াত্তরটি কলেজ বন্ধ ঘোষিত হয়, গ্রেফতার হয় বারো শত ছাত্র। এই আন্দোলনের বার্তা যাতে জনগণের কাছে না পৌঁছাতে পারে, তাদের উদ্দীপ্ত করতে না পারে সেজন্য সংবাদ পত্রের কণ্ঠ পূনরায় রোধ করা হয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছাত্র আন্দোলন বাধ ভাঙা জোয়ারের মত সারা পূর্ব পাকিস্তানকে প্লাবিত করে। বস্তুত, ছাত্র আন্দোলন ও গণতন্ত্র পূনরুদ্ধারের আন্দোলন হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়েছিল।[৫৩] আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৬৪ সালের ৫ জুন ১১ দফা দাবী উত্থাপিত হয়।[৫৪] পরবর্তীতে এর ওপর ভিত্তি করেই তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী প্রণীত হয়ছিল।

১৯৬৪ সালের জুন মাসে সরকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ (১৯৬৫ সাল) ঘোষণা করেন। এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রার্থী মনোনীত হন আইয়ুব খান (১৯ আগষ্ট, ৬৪)। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলের পুনরুত্থানে ভীত হয়ে তিনি নির্বাচনে তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালের ১৭ এপ্রিল 'নির্বাচক সমিতি বিল' (ইলেকটোরাল কলেজ বিল) পাশ করেন। এ বিল অনুসারে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বস্তুত, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্যের সুযোগ নিয়ে তিনি এই আইন পাশে সক্ষম হন।[৫৫] এবং ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ সত্ত্বেও রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো আইয়ুবের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ১৯৬৪ -র ২৬ জুলাই কপ গঠন করে।[৫৬] এবং ফাতেমা জিন্নাহকে তাঁদের প্রার্থী মনোনীত করে। নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো হিসেবে নয় দফা ঘোষিত হয়। নয় দফার মূল বিষয়বস্তু ছিল- গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনসহ সকল প্রকার নিবর্তনমূলক আইনের অবসান।[৫৭] বস্তুত কপ -এর মূল লক্ষ্য ছিল আইয়ুব শাসনের উৎখাতের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পূনরুদ্ধার করা। 'সম্মিলিত বিরোধী দল' ও ছাত্র সমাজ ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে সারা প্রদেশব্যাপী

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণা চালায়। ১৯৬৪ সালের ১৩ জুলাই পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে শেখ মুজিব আইয়ুব খানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন যে, ''আইয়ুব যদি প্রেসিডেন্টের দখলকৃত পদ থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নেন, তা'হলে বর্তমান ব্যবস্থাতেই শতকরা ২০ ভাগ ভোটও তিনি পাবেন না। যে-কোন সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেই তিনি হেরে যাবেন।''[৫৮] সেই সঙ্গে তিনি অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য-আগ্রাসনের কথাও তুলে ধরেন। ফলস্বরূপ, পরের দিন থেকে শুরু হয়ে যায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ধর -পাকড়। উল্লেখ্য, এ সময় মাওলানা ভাসানী লাহোর গিয়ে গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, সংবাদপত্র ও বাক স্বাধীনতার দাবী তুলে আইয়ুব খানকে সমর্থন-সহযোগিতার পক্ষে বক্তব্য রাখেন।[৫৯] কিন্তু তাঁর মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের এটি অজানা থাকার কথা নয় যে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের কাছে এসব দাবী জানানো ছিল অবান্তর মাত্র। এ সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল এবার হয়তো রাজনীতিবিদেরা বাস্তবিকই আইয়ুব খানকে উৎখাত করে স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবেন। কিন্তু নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পরাজয় সে পথরুদ্ধ করে দেয়। অর্থাৎ রাজনীতিবিদেরা পুনরায় ব্যর্থ হন। তাঁরা মৌলিক গণতন্ত্রীদের সম্পূর্ণ বশীভূত করার ক্ষেত্রে আইয়ুবী কৌশলের কাছে পরাস্ত হন। উল্লেখ্য নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য বিরোধী জোটের ছিলেন। এবং নিজেদের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে অনেক মৌলিক গণতন্ত্রী আইয়ুবের পক্ষে ভোট দেয়নি। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের (প্রাপ্তভোট ৭৩.৬%) তুলনায় পূর্ব অংশে (প্রাপ্ত ভোট ৫৩.১%) আইয়ুব খান ভোট কম পেয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ''সরকারি দলের কর্মীরাই স্বীকার করেছিল, নির্বাচনে সরকার জিতেছে, কিন্তু জনগণকে হারিয়েছে।''[৬০]

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে যদিও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের পক্ষেই জয়গান গেয়েছে। কিন্তু সে সঙ্গে এটিও সত্যি যে যুদ্ধশেষে তারা অনুধাবন করেছে যে পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধকালীন সময়ে সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল, এবং এ বিশ্বাস তাদের দৃঢ় হল কেন্দ্রীয় শাসকরা আসলেই বাঙালিদের সর্ব বিষয়ে বঞ্চিত করতে চায়। এক্ষেত্রে এমনকি পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে থাকলো কি অধিকৃত হল সে বিষয়ে তাঁদের কিছুই যায় আসেনা। অর্থনৈতিক বঞ্চনা শোষণ-সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রাসন এসব কিছুর সাথে যুক্ত হল এই অনুভূতি। এই ক্ষোভপ্রসূত অনুভূতি দেখা যায় আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করেন। বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে কাংখিত লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়, সূচিত হয় নতুন অধ্যায়ের।

১.৩ ১৯৫৮-৬৫।। রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ণ

১৯৫৮-৬৫ কালপর্বের রাজনৈতিক ধারার উপর্যুক্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা যায় -

১. স্বৈরাচারী সামরিক শাসক আইয়ুব খানের উত্থান ছিল একাধারে কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের দ্বন্দ্ব - দায়িত্বহীনতার অনিবার্য পরিণতি। সামরিক শাসনের সুবাদে রক্ষণশীল রাজনৈতিক ধারার অনুসারী আইয়ুব খান গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হন।

এর বিপরীতে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা দলসমূহ সামরিক শাসনামলে (১৯৫৮ থেকে '৬২-র ৮ জুন পর্যন্ত স্থায়ী) আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন বা বলা চলে এক্ষেত্রে সচেষ্ট হননি। অবশ্য এ সময় সকল প্রকার রাজনৈতিক দল, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি বাঙালি ছাত্র সমাজ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এ সময় গড়ে তুলেছিল। সামরিক শাসন বা এর অবসানকালে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি-দমননীতি সত্ত্বেও ছাত্ররা সব সময় এ ব্যাপারে সোচ্চার ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নমনীয় আচরণের কারণে রাজনীতিবিদেরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসেননি। বস্তুত, ''বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন ছিল সামরিক শাসন জারীর পরে প্রথম সার্থক গণআন্দোলন। ঐ আন্দোলনে সামরিক শাসন সম্পর্কে জনগণের ভয়ভীতি ভেঙ্গে যায়। তারা আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে শরিক হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। এটাই ছিল বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্য।''[৬১] সামরিক শাসনের অবসানের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থবিরতা কেটে যেতে থাকে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রীক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো ছিল-আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে এস পি), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী,

Dhaka University Institutional Repository

নিজাম-ই-ইসলামী। এ সময়পর্বে এখানে নতুন কোন রাজনৈতিক দলের উত্থান হয়নি। অর্থাৎ এখানকার রাজনীতি ধারার খুব একটা বদল হয়নি বলা যায়। অবশ্য মুসলিম লীগের একাংশ নিয়ে আইয়ুব খান গড়ে তোলেন নিজস্ব দল 'কনভেনশন মুসলিম লীগ'। বস্তুত, ক্ষমতার লোভে মুসলিম লীগের গুরুত্বহীন নেতা-কর্মীদের নিয়েই দলটি গড়ে তোলা হয়। আইয়ুব সৃষ্ট এই প্রক্রিয়াটি পরবর্তীকালে এখানে যে কোন সামরিক শাসনকালের জন্য উদাহরণস্বরূপ কাজ করেছে। অর্থাৎ এই একই প্রক্রিয়ায় তাঁরা তাঁদের সমর্থক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী গড়ে তুলতে সব সময়ই সক্ষম হয়েছে।[৬২]

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ, দ্বন্দ্ব এ সময়েও ছিল। তবে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, রাজনীতিবিদদের কাছে আমলা শাসন কাম্য নয়। বস্তুত, সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিজনিত কারণে তাঁরা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি।[৬৩] সুতরাং প্রয়োজনের সময় তাঁরা আইয়ুবের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এই সম্মিলিত প্রয়াস ব্যর্থ হয়। প্রায় প্রতিটি দলের বক্তব্য প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হলেও কিছু দলের বক্তব্যের সুর এক্ষেত্রে ছিল নমনীয়। তাঁরা পকিস্তানের সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট ছিল। এছাড়াও অনেক দল, নেতৃবৃন্দের মধ্যে দোদুল্যমানতাও পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই বিভিন্ন সময় সরকারের প্রতি আপোষমুখী মনোভাবও দেখিয়েছেন। যেমন এ পর্যায়ে বামপন্থী দলগুলোর অন্যতম ন্যাপের আপোষকামী ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য। যে ন্যাপ নেতা ভাসানীর নেতৃত্বে মূলত একসময় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' তার সাম্প্রদায়িক চরিত্র ('মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে) বর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের স্থলে জাতিগত দ্বন্দ্বের বিকাশে সহায়তা করেন।[৬৪] আবার ভাসানীই পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে 'আসসালামু আলাইকুমও' বলেছিলেন। অথচ তিনি সে অর্থে আইয়ুবের বিরোধিতা করেন নি। যা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঝন্ঝামুখর পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রকামী বাঙালি জনগণের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। এ সময় অপর বামপন্থী দল কমিউনিষ্ট পার্টি গোপনে ন্যাপে অনুপ্রবেশ করে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবিদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। একাজে তাঁদের নীতি ও কৌশলকে বিলোপবাদী প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ রূপ বলা চলে। যে প্রক্রিয়ার বিকাশের মধ্য দিয়ে পার্টি ক্রমে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। মোট কথা, ন্যাপ বা কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক এ সময় জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট,

Dhaka University Institutional Repository

যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় রাজনীতির মুল গতিপথ থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ব্যর্থতা জনিত কারণে দুটি দলই চিহ্নিত হয় অপ্রধান রাজনৈতিক ধারা হিসেবে।[৬৫]

কিন্তু এর বিপরীতে দেখা যায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাপিয়ে আওয়ামী লীগ ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে এবং এর অন্যতম নেতা শেখ মুজিবের অভূতপূর্ব উত্থান, আপোষহীন মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে থাকে। বস্তুত, জাতিগত নিপীড়নের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণও আইউব তথা স্বৈরাচারী শাসন থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কর্মসূচী বিশেষত ছয় দফার মধ্যে বাঙালির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায় এটি সহজে জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। সরকার ব্যাপকভাবে দমননীতির আশ্রয় নিয়েও আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রমনা বাঙালি জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় সংগ্রামের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

২ . সংস্কৃতির পাকিস্তানীকরণ প্রচেষ্টা

সামরিক শাসক আইয়ুব খানও বাঙালি সংস্কৃতির পাকিস্তায়ন বা পাকিস্তানীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আইয়ুব খান তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অভিন্ন। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই সামরিক শাসন জারীর পর পুনরায় বাঙালি সংস্কৃতির মেরুদন্ড বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং নামে মাত্র হলেও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে শাসকবর্গ বাধ্য হয়। কিন্তু সামরিক শাসনজারীর ফলে শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়। এ সুযোগে পাকিস্তানপন্থীরা পূনরায় সচেষ্ট হয় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এর বিরুদ্ধে সংস্কৃতিসেবীদের প্রতিবাদের কারণে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ অগ্রসর হতে সাহসী হয়নি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন সুদৃঢ় রাখা তথা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য একান্ত অপরিহার্য ছিল ভিন্ন সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অধিকারী, তুলনামূলকভাবে রাজনীতি সচেতন ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানী হিসেবে গড়ে তোলা। এজন্য প্রয়োজনে বাঙালি সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন ছিল প্রয়োজনীয়। আর অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে পূর্বের মতই প্রথমে বেছে নেয়া হয় বাংলা ভাষাকে। তবে এজন্য নতুন উপায় বা কৌশল অবলম্বন করা হয়। স্বৈরশাসক আইয়ুব খান জাতীয় সংহতি বা ঐক্যের নামে প্রথমেই সচেষ্ট হলেন বাংলা ও উর্দুর সংমিশ্রণে রোমান হরফে একটি জাতীয় ভাষা প্রণয়নে। এর পাশাপাশি ইসলামীকরণের নামে বাংলা ভাষা সংস্কার ও রবীন্দ্র বিরোধিতা শুরু হয়। অলিখিতভাবে হলেও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় মেয়েদের কপালে টিপ দেয়ার ওপর।[৬৬] উপরন্তু ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে জাতীয় পুনর্গঠন দপ্তর (ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন সংক্ষেপে বি এন আর) নামে একটি গবেষণা সংস্থা খোলা হয়। উদ্দেশ্য লেখক, সাংবাদিকদের দ্বারা আন্তঃলিক ভাষায় বেতার, পত্রিকা, পুস্তিকা, নাটিকা, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নিরন্তর প্রচারণা চালিয়ে ত্রাণকর্তা হিসেবে সামরিক সরকারের প্রতি জনসমর্থন গড়ে তোলা। অর্থাৎ জনগণকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা সংহতকরণ। এখন আইয়ুব খান গৃহীত বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপসমূহ এবং এর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীরা কিভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

ক. জাতীয় ভাষা প্রণয়ন ও বাংলাভাষা সংস্কার প্রচেষ্টা

বাংলা ভাষার প্রতি আইয়ুব খানের মনোভঙ্গি তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন ছিলনা। সুতরাং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও এর পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হন। কিন্তু জনমতের কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য শুধুমাত্র বাংলা ভাষার সংশোধন, পরিবর্তন সম্ভব নয় বিধায় এসঙ্গে উর্দুকেও সংযুক্ত করা হয়। এবং বলা হয় বাংলা ও উর্দুর সমন্বয়ে রোমান হরফে একটি জাতীয় ভাষা প্রবর্তন করা হবে। যুক্তি হিসেবে যদিও উল্লেখ করা হয়, উভয় অংশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, সংহতি রক্ষার কথা।[৬৭] কিন্তু উদ্দেশ্য বাঙালির স্বজাত্যবোধ খর্ব করে তাদের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েমের লক্ষ্যে পাকিস্তানী হিসেবে গড়ে তোলা। বাংলা একাডেমী ও শিক্ষা কমিশন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর হয়। এ লক্ষ্যে বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ''ভাষা সংস্কার কমিটি।'' বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এসব ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টাকে সাংস্কৃতিক কর্মী, সংস্কৃতিসেবীরা প্রত্যাখান করে। বিশেষত ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে।[৬৮] এবং ১৯৫৯-৬২ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।[৬৯] সব সময়ের মত এবারও ২১ শে ফেব্রুয়ারী প্রেরণার ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫৯ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[৭০] এই প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল পরবর্তী বছরগুলোর ২১ শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত এক সভায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষা ও ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও অধ্যাপক আবদুল হাই ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিরুদ্ধাচারণ করেন।[৭১] এমনকি ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আবেদন ছিল ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শ্লোগান।[৭২] এভাবে সামরিক শাসনামলে সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রতিবাদের মাধ্যমে আইয়ুব খানের কুটকৌশল নস্যাৎ করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

খ. পাকিস্তান লেখক সংঘ (Pakistan Writers' Guild)

সামরিক শাসনামলে দেশের সংহতি রক্ষা ও ইসলামের নামে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি তথা বাঙালিদের পাকিস্তানীকরণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পাকিস্তান লেখক সংঘ। বস্তুত, তৎকালীন শিক্ষা সচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব কতিপয় উর্দু লেখকের সহযোগিতায় ১৯৫৯ সালের ২৯-৩১ জানুয়ারী পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে আমন্ত্রিত দুই শতাধিক অতিথির মধ্যে পঞ্চাশজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের।[৭৩] তন্মধ্যে কয়েকজন অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। সম্মেলনে আয়োজকদের মূল বক্তব্য ছিল, ইসলামী আদর্শ অনুসারে পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যচর্চা হচ্ছে সাহিত্যিকদের প্রধান দায়িত্ব-কর্তব্য।[৭৪] এই সম্মেলনেই গঠিত হয় পাকিস্তান লেখক সংঘ।[৭৫] পাকিস্তানী সাহিত্য রচনায় লেখকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় কয়েকটি পুরস্কার ঘোষিত হয়- লেখক সংঘের পুরস্কার (১০ টি, প্রতিবছর ৩১ জানুয়ারী প্রদত্ত), আদমজী পুরস্কার (১৯৬০), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩), ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার (১৯৬৪)। তদুপরি ১৯৬৪ সালে সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ''প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড ফর প্রাইড এন্ড পারফরমেন্সেস''ঘোষিত হয়।[৭৬]

আইয়ুব খান স্বৈরাচারী শাসন সংহতকরণের মানসে পাকিস্তানী আদর্শকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে লেখক-সাহিত্যিকদের এভাবে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন। সরকার সাহিত্যের বিকাশের লক্ষ্যে লেখক সংঘের জন্য বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতির বিকাশের ধারাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা। কেননা এক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রবণতা যদি লক্ষ্য করা যায় তা হলে শুরুতেই যেন তা দমন করা যায়। লেখক সংঘের মাধ্যমে সরকারের প্রয়াস কিছুটা সফল হয়েছিল। অনেকেই এর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এর বিপরীতেও দেখি আইয়ুব বিরোধী প্রগতিপন্থী লেখক-সাহিত্যিক তথা সংস্কৃতিক কর্মীদের প্রচারণা অব্যাহত ছিল। ক্রমে ১৯৬২-র দিকে এসে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এর সঙ্গে যুক্ত অপেক্ষাকৃত নবীন, প্রগতিশীল লেখক-সাহিত্যিকেরা নিজস্বতা, স্বকীয়তা বজায় রেখে সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম আরম্ভ করেন।[৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

২.১ পাকিস্তানীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

ক. রবীন্দ্র বিদ্বেষ বনাম রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে শাসকবর্গ প্রথম থেকেই হিন্দু তথা ভারত বিদ্বেষের নামে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে পাকিস্তানী ভাবধারায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা স্বরূপ আইয়ুব আমলে রবীন্দ্র বিরোধিতা শুরু হয়। এর মূল উদ্দেশ্য যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ধারাকে বিনষ্ট করা তা সহজে অনুমেয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সাহিত্যকর্মের অস্তিত্ব বাঙালির প্রাণের গভীরে প্রোথিত। ফলে সুক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবে বাঙালির ভাষা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্টের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৬১ সাল ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হলেও পাকিস্তানে ভিন্ন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিশ্চিত ছিল সরকার কোন অনুষ্ঠান করতে দেবেনা। প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করলেও সরকার এ ব্যাপারে তৎপর ছিল। কারণ এর কিছু সময় আগে বিনা অজুহাতে কয়েকজন সংস্কৃতিসেবীকে গ্রেফতার করা হয়।[৭৮] উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা। সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলা একাডেমী অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে বিরত থাকে। পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও এসময় বিভিন্ন স্থানে সভার আয়োজন, লেখালেখি করে রবীন্দ্র বিরোধী প্রচারণা চালায়।[৭৯] সরকার ও তাঁর তল্পিবাহকদের এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক কর্মীদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নিরুৎসাহীত করা সম্ভব হয়নি। ঢাকা সহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকা শহরে গঠিত বেশ কিছু কমিটি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়[৮০] -

১. বিচারপতি এস এম মুর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির চার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়ন।[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

২. আহমেদুর রহমান (ভীমরুল), মোখলেসুর রহমান (সিধু), আনোয়ার জাহিদ, মিজানুর রহমান (ছানা), সাইফউদ্দিন মানিক প্রমুখ পূর্বাঞ্চল কমিটি (গুপিবাঘা) গঠন করে আটদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাটক, রবীন্দ্রাঙ্কিত চিত্রের (মুদ্রিত) প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তিনশ' গান গাওয়া হয়েছিল। এই পূর্বাঞ্চল কমিটিই গড়ে তোলে ছায়ানট।[৮২]

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) কার্জন হলে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বেগম সুফিয়া কামাল ও অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন।[৮৩]

৪. প্রেসক্লাবের প্রভাবশালী কয়েকজন সাংবাদিকও এ লক্ষ্যে একটি কমিটি[৮৪] গঠন করেন এবং তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে সিম্পোজিয়াম, নাটক-মনুঞায়ন, চিত্র-পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। [৮৫]

উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক কর্মীরা অক্লান্ত ও নিরলসভাবে একই জায়গায় একই পরিচালানায় রিহার্সেল করে এসব বিভিন্ন কমিটির অনুষ্ঠানগুলিকে সার্থক করে তোলেন।[৮৬] ঢাকা ছাড়াও মফস্বল শহরগুলোতেও জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। বস্তুত, জন্ম শতবার্ষিকী পালন বিষয়ে সরকারের বিরূপ মনোভাবের ফলে এই অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে একটা গণজাগরণের আবহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ হয়ে ওঠে বাঙালি এবং বাংলা-মুখী। বস্তুত,''পাকিস্তানী যুগে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাকে স্তব্ধ করে দেবার পর, দীর্ঘ এক দশকের ব্যবধানে, পরোক্ষ ও অঘোষিত হলেও রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন ছিল ঐ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিত্বের দ্বিতীয় প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।''[৮৭] যার ফলে ১৯৬১ সালে সরকারের রবীন্দ্র তথা হিন্দু বিদ্বেষ সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথসহ সকল অমুসলমান কবি-সাহিত্যিক-সঙ্গীতকারের রচনা প্রচার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়। এবার সরকার অনেকখানিই সফল হলেন। কারণ যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে বাঙালির মনে পুনরায় পাকিস্তানী মানসিকতা প্রবিষ্ট করতে পশ্চিমা শাসকশ্রেণী সক্ষম হয়। এর

Dhaka University Institutional Repository

ফলে পাকিস্তানের প্রতি সংহতিবোধ অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় বিভিন্ন শিল্পী -সাহিত্যিকদের রচনায় পাকিস্তানপন্থী আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন সংগঠনও গড়ে তোলেন।[৮৬] আর এই সুযোগে সরকার সাম্প্রদায়িকতা পূণর্জাগরণে সচেষ্ট হয়। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ভারত থেকে বই আমদানী ও পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বই-এর পূণর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ হয়। সংস্কৃতিসেবীদের দাবীর মুখে সরকার যুদ্ধ শেষে বাধ্য হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। এভাবে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রচনার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু এরই ফলে এখানকার প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়ন ঘটে এবং ক্রমে প্রাক-পাকিস্তান যুগের অমুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাবলী পূর্ব পাকিস্তানে পূণর্মুদ্রিত হতে থাকে।[৮৯]

খ. বাংলা নববর্ষ পালন

বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ বাঙালি জনগণ নববর্ষ হিসেবে পালন করে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের অবস্থান সত্ত্বেও এই উৎসব ধর্ম ভিত্তিক নয়। অর্থাৎ একটি সার্বজনীন উৎসব হিসেবে বাঙালি জনগণ এটি পালন করে থাকে।[৯০] কিন্তু পাকিস্তান আমলে এই উৎসবকে হিন্দুয়ানী নামে উৎখাতের প্রচেষ্টা চলে। ''বাঙালির অর্থনীতিক বর্ষ ছিল বৈশাখ থেকে চৈত্র। এই ব্যবস্থাকে ভাঙ্গার জন্যে আইয়ুব আমলে একে নিয়ে যাওয়া হয় জুলাই-জুনে।''[৯১] বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর এভাবে আক্রমণের ফলে ষাটের দশকে বাংলা নববর্ষ এক নতুন মাত্রা পরিগ্রহ করে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল হয়ে ওঠে। বাঙালি প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি উপাদানস্বরূপ পুনরায় নববর্ষ পালন করতে থাকে। এবং এটি রাজনৈতিক আন্দোলনেও যুক্ত করে এক নতুন মাত্রা।[৯২] ১৯৬৪ সালে (বাংলা ১৩৭১) ১লা বৈশাখে রমনার বটমূলে (আসলে অশ্বত্থমূলে) ছায়ানট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে নববর্ষ পালন করে। অন্যান্য সংগঠনসমূহের উদ্যোগেও বর্ষবরণ উৎসব পালিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হতে থাকে যা ছিল শাসকবর্গের সাম্প্রদায়িকতা, বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। অবশেষে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ১লা বৈশাখ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়।[৯৩] এভাবে আমরা দেখি যখনই সরকার বাঙালির স্বজাত্যবোধকে খর্ব করার

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা, জাতীয়তাবোধ ততই প্রবল হচ্ছে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে একটা আবহ তৈরী করছে। আর এই চেতনার পূণর্জাগরণে সাংস্কৃতিক কর্মী তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনবদ্য।

২ .৩ সংগঠন ও সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ

এই সময় পর্বে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠলেও তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে 'ছায়ানট'। অন্যদিকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মাত্র ২ টি। নিম্নে এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল।

ক. ছায়ানট

সরকারের ভ্রুকুটি, বিরূপতা উপেক্ষা করে ১৯৬১ সালে সফলভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। এই সাফল্যকে স্থায়ী ভিত্তি প্রদানের জন্য কতিপয় সাংস্কৃতিক কর্মী উপলব্ধী করেন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালের প্রথম দিকে ''ছায়ানট'' নামক সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৯৪] এ প্রসঙ্গে এর অন্যতম উদ্যোক্তা ওয়াহিদুল হক বলেন, ''চড়ুইভাতি করবার ছলে পূর্বাঞ্চল কমিটির সকল নেতাকর্মীরা মিলিত হলেন জয়দেবপুরে। খাওয়া শেষে বসা হল ম্যানেজারের বাংলার আঙিনায়। সিদ্ধান্ত হল ঢাকায় ফিরে আমরা সমিতিবদ্ধ হব এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালায় খুলে দেওয়া দরজাটিকে ব্যবহার করব বাঙালিত্বে, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে পৌঁছাবার জন্যে।''[৯৫] ঢাকায় ফিরে মোখলেসুর রহমানের (সিধু) র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বাসায় পূনরায় বৈঠক করেন, এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নামকরণ করেন সাঈদুল হাসান।[৯৬] প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমৃত্যু এর সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। সহ-সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী, ও সাঈদুল হাসান। এর প্রথম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিসেস ফরিদা হাসান। সহ-সম্পাদক সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিক ও মিজানুর রহমান (ছানা), কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মোখলেসুর রহমান (সিধু)। অন্যান্য সদস্যরা হলেন মিসেস মহীউদ্দীন, আহমেদুর রহমান (ভীমরুল), কামাল লোহানী,

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুন প্রমুখ।[৯৭] দল যাই দাঁড়াক না কেন সমমনা সকলে মিলে কাজ করে যেতে থাকেন। পরবর্তী সম্পাদক কামাল লোহানীর মতে, ''বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর গণসংস্কৃতির বিকাশমান ধারাকে অব্যাহত রাখার মানসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সংগঠন।[৯৮] ১৯৬২-৬৩ সাল নাগাদ সংগঠনটি ৩টি বড় ধরনের কাজের মাধ্যমে তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট ভুমিকায় কার্যকরভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়[৯৯] -

প্রথমত, বাংলা ১৩৭০ সনের (১৯৬৩) ১লা বৈশাখে[১০১] ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, [১০০]

দ্বিতীয়ত, একই বছর (১৯৬৩) প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত অঞ্চলের জনগণের সাহায্যার্থে গান গেয়ে তহবিল সংগ্রহ এবং বেসরকারিভাবে সবচেয়ে বড় ত্রাণ অভিযান প্রেরণ ও পরিচালনা,

তৃতীয়ত, সঙ্গীত প্রসারের লক্ষ্যে গানের আসর আয়োজনের মাধ্যমে শ্রোতৃমন্ডলী গড়ে তোলা।

বস্তুত, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইবার শিল্পী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। সনজীদা খাতুন, আবদুল আহাদ, কলিম শরাফী, বজলুল করিম, সোহরাব হোসেন প্রমুখের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু প্রতিভাধর সঙ্গীত শিল্পী এই বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে। ছায়ানট আয়োজিত পাঁচটি বড় উৎসব- পঁচিশে বৈশাখ, ২২ শে শ্রাবণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ও ১লা বৈশাখের মাধ্যমে খুব সহজেই বাঙালির মাঝে বাঙালিত্ববোধ তৈরী করে। এছাড়াও পালিত হত নজরুল জন্মতিথি। ছায়ানটের অনুষ্ঠানে দিন দিন শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ ক্রমে বাঙালি নিজ উৎস সন্ধানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। এতে সরকার স্বভাবতই নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। হিন্দুয়ানির অভিযোগে বন্ধ হল শারদোৎসব, স্তিমিত হয়ে পড়ে বসন্তোৎসবও। কিন্তু ১লা বৈশাখের উৎসবকে সরকার বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৬৪ সালের (বাংলা ১৩৭১) ১লা বৈশাখে রমনা বটমূলে (আসলে অশ্বত্থমূলে) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ছায়ানট আয়োজিত কর্মপ্রয়াস সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়। কারণ, বাঙালিত্বের টানে প্রবল উৎসাহের সাথে বাঙালি জনগণ এই অনুষ্ঠানে-উৎসবে যোগদেয়। ফলস্বরূপ এ দিনটি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সরকারি ছুটির দিন হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষিত হয়। এভাবে এটি বাঙালির জাতীয় উৎসবের অনন্য স্বীকৃতি লাভ করে। এখনও ছায়ানট প্রতিবছর এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।[১০১]

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছায়ানটের কর্মপ্রয়াস এত বিস্তৃত যে একে সংক্ষেপে বর্ণনা করা কঠিন। যদি মনে করা হয় এর কর্মকান্ড শুধুমাত্র গানের মধ্যে সীমিত ছিল, তাহলে ভুল হবে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, ১৯৬৩ সালের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ছায়ানট এগিয়ে যায়। ঐ বছরই ছায়ানটের কর্মীরা ''পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ'' গঠন করে, উদ্দেশ্য সুস্থ চলচ্চিত্র গড়া। এছাড়া ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধেও এর ভূমিকা ছিল অনন্য।[১০২]

১৯৬৪ -র শেষ পাদে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যদিও তাঁর মহিমা কীর্তনের জন্য টেলিভিশন চালু করেন। কিন্তু নিয়মিত অনুষ্ঠান করার সুযোগ নিয়ে ছায়ানট বাঙালি সংস্কৃতির বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। ক্রমে দেখা গেল, ''উৎসবে অনুষ্ঠানে আসরে রেডিওতে টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন অপ্রতিরোধ্য সমাজ তার উজ্জীবক ধ্বনিতে ম' ম' করছে।''[১০৩] সরকার ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সুযোগে যুদ্ধকালীন এবং পরবর্তী সময়ের জন্যেও রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে পুনরায় বাঙালির সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এর পক্ষে সায় জানায়। কিন্তু স্বৈরাচারী সামরিক সরকার সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিবাদের কারণে সীমিত পরিসরে হলেও রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারে বাধ্য হয়। এভাবে ছায়ানট অন্য কথায় সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিরলসভাবে তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে বাঙালিত্বে মাতিয়ে অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, বাঙালি বিদ্বেষী স্বৈরাচারী সামরিক শাসক পক্ষান্তরে পাকিস্তানবাদীতার বিরুদ্ধে নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষায় ভয়হীন চিত্তে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ওয়াহিদুল হক বলেন, ''এভাবে বাঙালিয়ানার বানে ভাসিয়ে রাখে ছায়ানট গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত।''[১০৪]

খ. ঐকতান

এই সংগঠনটি সম্পর্কে কামাল লোহানী বলেন, ''১৯৬৩ সালে চাকুরীজীবী ও সংস্কৃতিসেবী নাসিরউদ্দিন, শহীদ উদদাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ রফিকুল ইসলাম, তাঁর ক'ভাই, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক ও শিল্পী আতিকুল ইসলাম, ফারুকুল ইসলাম গড়ে তুললেন 'ঐকতান'। বিষয়ভিত্তিক, ঋতুসঙ্গীত কিংবা অনুষ্ঠানভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন একে। এর ভূমিকা বঙ্গ সংস্কৃতিচর্চায় অনস্বীকার্য।''[১০৫] বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হকের মতে, ''এই দলের সম্মেলক গানের একটি সুন্দর মান ছিল। তেমনি ছিল এদের মঞ্চে আবির্ভাব ও উপস্থিতির ব্যাপারটা- সাদা শাড়ীতে-জামাতে-পাজামা-পাঞ্জাবীতে ও চুলে জড়ানো সাদা ফুলের মালাতে মিশে এক শুভ্রশুচি গম্ভীর প্রাণভরানো পরিবেশ সৃষ্টি হত। হাতে হাতে বিলি হত অত্যন্ত রুচিমান অনুষ্ঠানপত্র। 'ছায়ানট'র বন্ধ্যা থাকবার কালে ও অনিশ্চিত প্রথম পদক্ষেপের সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার-প্রসারে সবচাইতে অগ্রসর ও উল্লেখযোগ্য- বলতে গেলে একমাত্র কাজই করেছে 'ঐকতান'।''[১০৬]

উপর্যুক্ত উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক সংগঠনসমুহ ছাড়াও ১৯৬২ সালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বহুব্রীহি, সুন্দর, বৈকালিক, অবকাশ, সূর্য সৈনিক, কৌণিক, স্পন্দন, কালচক্র।[১০৭]

সম্মেলন

ক. ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ

১৯৬৩ সালের ২২-২৮ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদযাপিত হয়। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা যৌথভাবে একে সার্বিক অর্থানুকুল্য প্রদান করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক-ছাত্রদের সৃজনশীল কর্মোদ্দীপনাই অনুষ্ঠানটির সফল আয়োজন সম্ভব করেছিল। বস্তুত, সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীসহ আগ্রহান্বিত জনমানুষকে হাতে কলমে যতটুকু সম্ভব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে পরিচিত করা। অর্থাৎ বাংলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে 'চার দেয়ালের পরিধি, পুঁথির পরিবেষ্টন ও গবেষণার অনুবীক্ষণ থেকে বিস্তৃত করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে' দিয়ে 'ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতুহল, শ্রদ্ধা আর চেতনা বৃদ্ধি' করা।[১০৮] সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে কয়েকটিভাগে বিন্যস্ত করা হয়- প্রদর্শনী, কবিতা-গদ্য-নাটক থেকে পাঠ, আলোচনা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রদর্শনী আবার চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল- ভাষার

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন এবং মুদ্রণের ইতিহাস।[১০৯] এতে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি মূল্যবান নিদর্শনের সঙ্গে উৎসাহী হাজার হাজার সাধারণ মানুষ পরিচিত হন। এছাড়াও সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে তারা উপভোগ করেন প্রাচীনকাল থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত কবিতা-গদ্য-নাটক পাঠ, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞানদীপ্ত আলোচনা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে বিভাগীয় প্রধান ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেন-

প্রাচীন কালে যেমন পূর্ব বাংলাতেই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গোড়াপওন হয়েছিল, তেমনি এই উপমহাদেশের মধ্যে পূর্ব বাংলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম সে ভাষা-সাহিত্য পাঠের জন্য স্বতন্ত্র বাংলা বিভাগ চালু হয়, এদেশেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় ভূষিত এবং এখানেই স্থাপিত হয়েছে এই ভাষা-সাহিত্যের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান।[১১০] ''এর একটা অদৃশ্য ইঙ্গিত হচ্ছে যে, 'বাংলা ভাষার যাবতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের ভার বিধাতা এদেশের মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন'।''[১১১] আলোচনার শেষপ্রান্তে তিনি দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সর্বক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, যেমন- ভাবের আদান-প্রদান, চিঠি-পত্র, সকল প্রকার নিমন্ত্রণপত্র, দোকানের নাম, গাড়ীর নম্বর-ফলক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে পাঠদানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার করার প্রতি আহবান জানান।[১১২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সপ্তাহব্যাপী এই অভিনব আয়োজন সর্বসাধারণের মধ্যে অনুপম সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। প্রতিদিনকার অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। শুধু আলোচনার মাধ্যমে নয়, প্রদর্শনীর মাধ্যমেও এটি বাঙালির সামনে তার হাজার বছরের গৌরবময়, সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের স্বরূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, প্রদর্শনীর প্রবেশপথে একটি পোস্টারে লিখিত ছিল চট্টগ্রামের কবি আবদুল হাকিমের (সতের শতক) বিখ্যাত চরণ কয়টি ঃ

যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
নিজদেশত্যাগী কেন বিদেশ ন জায়।।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি।।[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত সম্মেলনের যাবতীয় কর্মপ্রয়াস বাঙালির স্বজাত্যবোধ, জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছিল।

খ. ১৯৬৪ সালের নাট্য সম্মেলন

বাংলা একাডেমী ১৯৬৪ সালের ১৩-১৮ নভেম্বর ছ'দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এর উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে নাটক ও নাট্য আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সে সময় ব্যাপক ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য সম্মেলনের এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবি-নাট্যমোদী মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সম্মেলনকে শুধু সে সময়কার পূর্ব পাকিস্তান নয়-বর্তমান বাংলাদেশেও নাটকের পূর্ণ বিকাশে পথনির্দেশক হিসেবে নির্দ্বিধায় চিহ্নিত করা যায়।[১১৪]

২ .৪ নাটক ও গণসঙ্গীত

ক. নাটক

সংস্কৃতির পাকিস্তানীকরণের বিরুদ্ধে এক নিরব প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় নাটকের ক্ষেত্রেও। আগের পর্বে যেমন পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের নাটকেরও আধিক্য ছিল, বর্তমান পর্বে তার একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বনফুল, শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণের রচনার নাট্যরূপ বা তাঁদের লেখা মঞ্চস্থ হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু এরি মধ্যে চলে আসছিলেন জসিমউদ্দিন, শাহাদাৎ আলী খান, আসকার ইবনে শাইখ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ। লক্ষনীয় যে এসব নাটক মঞ্চস্থ করছিল বিভিন্ন ছাত্র সংসদ ও ক্লাব। তালিকা দেখেই অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ের ঢাকা শহরের তুলনায় এ ধরনের সমিতি, ক্লাব বা সংঘের সংখ্যা কম ছিলনা। আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই গণ্য করা হয় সভাসমিতিকে। কারণ ''সামাজিক সংঘাতেই তার সৃষ্টি।''[১১৫] বিনয় ঘোষ মনে করেন, ''স্বাধীনতা, অবাধ আত্মপ্রকাশের ও পরস্পর মিলনের অধিকার'' সৃষ্টি করে সভাসমিতি।[১১৬] মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, ''পূর্ব বঙ্গের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যশ্রেণীর মতামত সংগঠনে, সামাজিক সংস্কার ও সমাজে সচলতা সৃষ্টির ব্যাপারে উনিশ শতকের সভাসমিতিগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।"[১১৭] আমার আলোচ্য সময়েও এ ধরণের সভাসমিতিগুলি ঢাকার উঠতি এলিটদের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠছিল এবং সাংস্কৃতিক সজীবতা সৃষ্টিতেও সহায়ক ছিল। যে কারণে, এ সময়ে পাকিস্তানীকরণ বিষয়ক বা 'ইসলামী বিষয়বস্তু' মূলক নাটক আমরা প্রায় দেখিনা। এই যে বর্জন, এবং তা সচেতনভাবেই তাও ছিল সংস্কৃতি সেবীদের একধরনের প্রতিবাদ (দেখুন পরিশিষ্ট) সামরিক শাসন চলাকালেই সংস্কৃতি সেবী-সাংস্কৃতিক কর্মীরা রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নেন। এই উৎসব উদযাপন উপলক্ষে 'ড্রামা সার্কল' রবীন্দ্রনাথের তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করে - রাজা ও রাণী, তাসের দেশ ও রক্তকরবী। "১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী শক্তি তথা সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের সকল অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে ......'ড্রামা সার্কল'-এর এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রতিবাদী।"[১১৮]

খ. গণসঙ্গীত

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

384630

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর ফলে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলে তার প্রভাব গণসঙ্গীত চর্চার ওপর পড়েছিল। কারণ, রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা, প্রচন্ডতাই গণসঙ্গীত চর্চার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক। বস্তুত, সামরিক শাসন সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় বাঙালি বুঝতে পারেনি এটি ছিল আসলে তাদেরই দমনের জন্য শাসকগোষ্ঠীর একটা নতুন ও অভিনব ব্যবস্থা।[১১৯] কিন্তু সামরিক শাসনের স্বরূপ বুঝতে সমাজের প্রাগ্রসর অংশের বেশী দেরী হয়নি। কিন্তু আইয়ুব খানের দমননীতির কারণে ষাট দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত গণসঙ্গীত গাওয়া সম্ভব হয়নি। এই সময় শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশ মোতাবেক তাহজিব তমদ্দুন প্রকাশ করে এমন গান গাইতে হতো। ক্রমে এরই সুযোগ নেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা। তারা এমন সব গান নির্বাচন করে গাইতে আরম্ভ করেন যেগুলিকে শাসকগোষ্ঠী ইসলামীমূলক, নিরীহ প্রকৃতির বলে ভাবতো। কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে ইসলামীমূলক-নিরীহ এসব গানের মাধ্যমেই জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় জাগ্রত-ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন তারা।[১২০] "শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে প্রথম থেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। তাঁদের ভাষ্য বা অভিযোগ এটি ভারতীয় তথা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে 'এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়ে পরিস্থিতিকে বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সাথে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলকে জোরে শোরে গাইতে লাগলেন। কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল-নজরুল গজল লিখেছেন তাঁদের ভাষায়, ইসলামী গান লিখেছেন প্রচুর। সুতরাং তমদ্দুন তাঁর গানে কবিতায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।''[১২১] এ সময় গাওয়া নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এধরনের কিছু গান ছিল নিম্নরূপ [১২২] -

১. ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

২. চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগণে বাজ মাদল .....।

৩. নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
খুলে যাবে এই দ্বার
জানি জানি, তোর বন্ধন-ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারে বার।।

৪. ওরে নূতন যুগের ভোরে
দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা
সময় বিচার হবে
ওরে নূতন যুগের ভোরে।।

৫. দূর্গম গিরি কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার হে .....।

৬. আমার দেশের মাটি
ও ভাই, খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।

কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে। ঢাকায় এই উপলক্ষ্যে গঠিত হয় বেশ কয়েকটি কমিটি। সাংস্কৃতিক কর্মীরা স্থির করেন এই বিভিন্ন কমিটির অনুষ্ঠানগুলি তারাই করে দেবেন। একটানা অনুষ্ঠান চলে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। প্রায় তিনবছর পর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশবিহীন বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেল যেন মানুষ। সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

বিরূপতার কথা জানতে পেরে বাঙালির সাংস্কৃতিক, জাতীয়তাবাদী চেতনা ঐক্যবদ্ধ হয়।

জন্মশতবার্ষিকীর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই গাওয়া হয় ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'', ''স্বার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে'', ''ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা''। এভাবে গণসঙ্গীতের অভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতই নতুন চেতনার অনুসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। ওয়াহিদুল হক বলেন,''একটা জাতীয় সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের এক নম্বর অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল রবীন্দ্র সঙ্গীত।''[১২৩] এর পর প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে গাওয়া হত ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি,'' গুরু সদয় দত্ত রচিত, ''আবার তোরা মানুষ হ, অনুকরণ ভেদি কায়মনে বাঙালী হ'। এ সব গান বাঙালিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে দারুণভাবে অনুপ্রাণীত করেছিল। শতবার্ষিকীর সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর গণসঙ্গীত বিভাগটি মধ্য ষাটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এভাবে ক্রমে একটা আবহ, পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যার ফলে পুনরায় গণআন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে একে সংহত করতে হয়েছে, ধরে রাখতে হয়েছে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। আর এই পুরো সময় কালটি জুড়ে প্রধানত রবীন্দ্র সঙ্গীতই শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।[১২৪] ইসলামী আদর্শের নামে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রচেষ্টা, ভারতীয়, হিন্দুয়ানীর অভিযোগে রবীন্দ্রনাথের স্থলে ইকবাল ও সংকীর্ণভাবে নজরুলকে প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস হার মানল। সামরিক সরকারের ভ্রুকুটি, দমন সব কিছুই উপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে এভাবে জনমানসকে উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত করে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

২ .৫ ১৯৫৮-৬৫।। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ঃ মুল্যায়ণ

১৯৫৮ -৬৫ পর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃতভাবে ছিল সজীবতাহীন। সামরিক আইন জারীর পর যেভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা দলগুলোর প্রতিবাদ করা উচিত ছিল সেভাবে তাঁরা তা করেনি। সামরিক শাসন

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাহারের পর রাজনৈতিক নেতারা আবার প্রতিবাদের কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের মতবিরোধ কোন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সহায়ক ছিলনা। ফাতেমা জিন্নাহ্‌র নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক নেতারা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেও ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পরাজয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মনে এক ধরনের হতাশা নামে। অন্যদিকে, '৬০ সাল পর্যন্ত ছাত্ররা ''সরাসরি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নামেনি। কিন্তু যখনই সুযোগ এসেছে তা যতো সীমিতই হোক তা সদ্ব্যবহার করে সামরিক শাসণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।[১২৫]'' তবে, '৬০ সালের পর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাই ছিল বেশি সচল এবং প্রতিবাদমুখর। সামরিক শাসনামলে বাঙালিকে পাকিস্তানী করার জন্য সুক্ষভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এলক্ষ্যে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, লেখক-সংঘ, প্রেসট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, এজন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এসব প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর মহিমা প্রচারের লক্ষ্যে একটি স্তাবক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে তুলতে চায়। একই লক্ষ্যে টেলিভিশন চালু করা হয়। এভাবে বাঙালি সংস্কৃতিকে ইসলামী আদর্শের নামে পাকিস্তানীকরণের প্রচেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী মেতে ওঠেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ভুলিয়ে দিতে চায় তারা যে বাঙালি, ভিন্ন জাতিসত্ত্বা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অধিকারী। সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ, প্রয়াস একদম ব্যর্থ হয়নি।

অন্যদিকে সামরিক শাসনামলে দমন-পীড়ন সত্ত্বেও এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রগ্রতিশীল সংস্কৃতি সেবীরা সোচ্চার প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। সংস্কৃতির প্রতি সরকারি চক্রান্তে বাঙালির সাংস্কৃতিক, জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো সুদৃঢ় হয়। সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে বাঙালি এসময় তার বিভিন্ন লোকজ উৎসব পালন করতে থাকে। যেমন- নববর্ষ, বসন্ত উৎসব, নবান্ন উৎসব। এভাবে তারা অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধানে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, শক্তি অর্জন করছে। তবে মনে রাখা দরকার পিছনে ফিরে তাকানোর মানে পিছনে ফিরে যাওয়া নয়। বরং অতীত ঐতিহ্যের আলোকে সুন্দর সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে যাওয়া। লক্ষণীয় যে, এসব উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা একত্রিত হচ্ছে মুক্ত পরিবেশে, বদ্ধ পরিবেশে নয়। এটি এক ধরনের প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নববর্ষে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শুরু করছে উৎসব। যাকে সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ চিহ্নিত করে।[১২৬] এর বিপরীতে নজরুলকে দাঁড় করাবার প্রয়াস পায় যদিও সংকীর্ণভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় হিন্দুয়ানী শব্দ বাদ দিয়ে একে ইসলামী রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। পাঠ্য বইতে এসব সংযোজিত করে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পাকিস্তানী ভাবধারায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সামরিক শাসনামলে যখন রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থবিরতা বিরাজ করছে, তখন সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের এ সমস্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। এভাবে তারা তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিদ্রোহের ভাষা গড়ে তোলে সক্রিয়ভাবে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা সুনির্দিষ্ট মাত্রা, লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। শাসক শ্রেণীর বাধা উপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক কর্মীরা এভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়, জনগণকে বাঙালি করে এগিয়ে নিয়ে যায়। রাজনীতিবিদেরা যখন দেখেছেন বাঙালি জাতি একত্রিত হচ্ছে, তখন তারা যোগ দিয়েছেন। ফলে বাঙালির জাগরণকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি।

এ প্রতিবাদ কীভাবে সংঘটিত হচ্ছিল এবং ক্রমে তা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গা হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল যে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ''আমাদের কিন্তু ক্রমে জানা হয়ে যাচ্ছিল যে, নিছক অনুষ্ঠানের কর্মকান্ড নয়, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের আপন স্বার্থে প্রতিরোধের প্রাকার নির্মাণ। পুরনো ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে বড় একটা আশ্রয় পাওয়া গিয়েছিল। আর পাটুয়াটুলিতে লয়াল স্ট্রীটে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের 'সওগাত' অফিসে। এছাড়া কখনো ওয়ারীপাড়া র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটের কোনো বাড়িতে, মাহবুব আলি ইনস্টিটিউট, রমনা এলাকায় ঢাকা হলে, কার্জন হলের বারান্দায়, ইউনিভার্সিটিতে মধুর রেস্তোরাঁয়- এই সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কতিপয়ে মিলে পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি করা হত। এই কতিপয় ছিল কারা ? প্রায় সবাই তরুণ কিশোর। বলেছি, মোটে সহজ ছিল না ঐ সমুদয় কর্ম। মুরুব্বিয়ানার ঝান্ডাবরদার তারা চোখ রাঙাতেন, হুমকি দিতেন। আর লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডারা ধাওয়া করত। .... কেবল রাজধানী নগরী ঢাকাতেই নয়, বাইরেও চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, সিলেটে, রাজশাহীতে, বগুড়ায় নানা জেলা শহরে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সমূহ দানা বেঁধে উঠেছিল।''[১২৭] তিনি আরো লিখেছেন, '' '৬১ তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী-প্রতিরোধের সংগ্রামে ঐতিহাসিক মাইলস্টোন। প্রারম্ভকাল থেকেই দৃঢ় সংকল্পে ব্যাপক আয়োজনে এগিয়ে এল ছায়ানট। লক্ষ্য করব ছায়ানটের রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, পয়লা বৈশাখ, বর্ষা মঙ্গল,

Dhaka University Institutional Repository

শারদোৎসব, বসন্তোৎসব এই সমুদয় উদ্যোগ-আয়োজনের মূল সুরটি কি ছিল। নতুন করে এবং ব্যাপকতর প্রসারে জানান হল- ষড়ঋতু প্রকৃতির দেশ আমাদের মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ ; এবং আরো, দেশজ চেতনা আর বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী থেকে ছায়ানট, একা নয় ছায়ানট এই দশকের গোড়ার দিকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদযাপন এবং দর্শক জুড়ে বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, সবার কর্মকান্ড-কতো যে স্রোত, সব এসে মিশেছে যুক্ত বেণীর মূল ধারায়।''[১২৮]

সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড বা অন্যকথায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল এ পর্বে- বাঙালির শেকড় খোঁজা। পাকিস্তান যে ইকবাল বা খন্ডিত নজরুল চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিল বা রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ করেছিল তার লক্ষ্য ছিল এই শেকড়ের কথা ভুলিয়ে মনোজগতে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করা। রাজনীতিবিদরা এক্ষেত্রে সে অন্বেষণে তেমনভাবে এগোননি যেভাবে এগিয়েছেন সংস্কৃতিকর্মীরা। এই যে নিজের ভাষার জন্য রক্ত দেয়া, বাঙালি সংস্কৃতিকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের অবলম্বন করা ও পাকিস্তানী আধিপত্যের বিরুদ্ধে যেভাবেই হোক না কেন নিজেকে তুলে ধরা- এ কাজগুলো সংস্কৃতিকর্মীরা সম্পন্ন করেছেন, তুলে ধরেছেন যা পরবর্তী পর্বে আরো সংহত হয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রণোদনা যুগিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ৩৬। এছাড়াও দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৬-১৯৬৬', *বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৮৬-৯১।

২. মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*,, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ২৯। এছাড়া দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯১-৯২।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৩৪।

৪. মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫।

৬. ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৫৬। এছাড়া বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৪-১৫৬।

৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ (১৯৫৩-১৯৯৩)*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৬২-৬৩।

৮. মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬। এছাড়া দেখুন, ঐ, *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, পৃঃ ৩৬।

৯. ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৭। এবং পাদটীকা-২২, পৃঃ ১৭০।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৪।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৪।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৫।

১৩. মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*,, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬। এছাড়াও দেখুন ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৯-১৬২। এছাড়া দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৫-৯৬।

১৫. বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তমিজউদ্দিন খান, আবদুস সবুর খান, রমিজ উদ্দিন আহমেদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী, মশিউর রহমান, আবদুল মোনায়েম খান, আবদুল জব্বার খান প্রমুখ পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (১৯৪৭-১৯৭১), ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১১২। বিস্তারিত এছাড়া দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৬ এবং ১০৩।

১৬. অবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৯।

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৩।

১৮. প্রশাসন যন্ত্রকে নির্বাচনে ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা যায়, 'সরকারি কর্মচারীরা পৃষ্ঠপোষকতা ও চাপের সাহায্যে আইয়ুবের নির্বাচনী সভাগুলিতে লোক জড়ো করেছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোট।' দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, পৃঃ ৩৭। এছাড়াও দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৩। এ উদ্দেশ্যে প্রেসট্রাস্ট গঠিত হয়, টেলিভিশন চালু করা হয়। দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১২। সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৭৩।

১৯. ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১২। সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৩-৭৪।

২০. এ প্রসঙ্গে আবদুল হক লিখেছেন, 'মোটের ওপর, যেমন করে হোক, আইয়ুব খানকে জয়ী করার জন্য সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ও কনভেনশন লীগ চেষ্টা করছে, তাদের মতে আইয়ুব খান যোগ্য লোক, কাজেই তাকে নির্বাচিত করার জন্য যত হীন পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, তাতে কোন দোষ নেই।' দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৮। স্বাভাবিক তাঁবে নির্বাচন হলে আইয়ুব খানের পরাজিত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি বিরোধী দলীয় প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময়ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল অবলম্বন করেন যাতে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন। দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯১-৯২।

২১. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭।

২২. আইয়ুব খান মোট ভোট পান ৪৯,৯৫১ (পূর্ব পাকিস্তানে ২১,০১২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৮,৯৩৯) টি; অপরদিকে, মিস্ জিন্নাহ পান ২৮,৬৯১ (পূর্ব পাকিস্তানে

Dhaka University Institutional Repository

১৮,৪৩৪ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১০,২৫৭) টি ভোট। অর্থাৎ ৬৩.৩% ভাগ ভোট বেশী পেয়ে আইয়ুব খান বিজয় লাভ করেন। আর মিস্ জিন্নাহ পেয়েছিলেন ৩৬.৩% ভোট।

নির্বাচনের ফলাফলের জন্য দেখুন, ডঃ প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩ ; মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩ ; আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৪।

২৩. ড. প্রীতিকমুার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৫।

২৪. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩।

২৫. সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার ও ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরনের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪-২৫।

২৬. আইয়ুব খান কর্তৃক ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে দশ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন অন ন্যাশনাল এডুকেশন গঠিত হয়। এটি শরীফ কমিশন নামে পরিচিত। এতে পূর্ব পাকিস্তানের চারজন সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোমতাজুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আবদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ রশীদ। কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগষ্ট তার সুপারিশ পেশ করে। এর মূল বক্তব্য ছিল, সর্বস্তরে ব্যাপক শিক্ষা সংকোচন, ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলকসহ উর্দুকে জনগনের ভাষায় পরিণত করা। এই রিপোর্ট ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হলে ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আন্দোলন শুরু করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭-২৮ এবং পাদটীকা ২১, ২২ পৃঃ ৫১। ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০১ এবং পাদটীকা ৩৭, পৃঃ ১৪৯।

২৭. এ প্রসংগে প্রবীণ রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দীর কথা উল্লেখ করা যায়। মুক্তিলাভের পর ''তিনি নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করে সবাই মিলে ''গণতন্ত্র উদ্ধারের'' জন্য প্রচার আন্দোলন চলুক। তিনি, সে সময়, ছাত্র সমাজের জঙ্গী সংগ্রাম আর খুব বেশী অগ্রসর হোক - সেটা পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু সে সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিরাট জনসভা সত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

''গণতন্ত্র উদ্ধার'' করা যায়নি।'' দেখুন, মোহাম্মদ ফরহাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ৪।

২৮. ইতোপূর্বে সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা মন্ত্রী নিযুক্ত হলে সদস্যপদ হারাবেন বলে বিধান ছিল। এখন সংবিধানের সংশোধনী অনুসারে তারা উভয় পদে আসীন থাকতে পারবেন। উদ্দেশ্য পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ সদস্যদের মধ্যেকার ঐক্য বিনষ্ট করা, আইয়ুব খান তাঁর প্রতি সম্ভাব্য বিরোধীতা এড়ানোর উদ্দেশ্য এই অপকৌশলের আশ্রয় নেন। নব নিযুক্ত পাঁচজন মন্ত্রী ছিলেন - খান আবদুস সবুর, আবদুল মোনায়েম খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এবং ওয়াহিদুজ্জামান। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, অবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৩-৭৫। এছাড়াও দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।

২৯. দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭।

৩০. দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭২।

৩১. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭।

৩২. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৪।

৩৩. কারণ সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ''ফলে আইয়ুবের প্রধান রাজনৈতিক বাহনটিই হলো অন্তর্হিত। এতদিন তিনি দলের বিকল্প হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে আসছিলেন। আজ তাই তিনি হয়ে পড়লেন বাহনবিহীন। দলবিহীন মৌলিক গণতন্ত্রীরা কিংবা জনসংযোগবিহীন আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক দলের বিকল্প হতে পারার প্রশ্নই ওঠে না।'' দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৯।

৩৪. সরকার কর্তৃক ১৯৬২-র ৩০ জুন রাজনৈতিক দল **[Political Parties Bill 1962]** বিল উত্থাপিত হয়। এবং ১৪ জুলাই এটি পাস হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২; পৃঃ ১৭০-১৭২।

৩৫. অন্যান্য বিধিনিষেধের মধ্যে ছিল- এসব দলকে হতে হবে ইসলামী মতাদর্শ বিশ্বাসী, পাকিস্তানের সংহতি নিরাপত্তা বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত না হওয়া সহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট হতে পারবে না। বস্তুত, স্বায়ত্বশাসনের দাবি, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আদর্শকে যথাক্রমে পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলাম বিরোধী বলে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস ছিল এটি। দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০০-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. বিবৃতি প্রদানকারীরা হলেন - কৃষক-শ্রমিক পার্টির হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিঞা), ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা), আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মুসলিম লীগের নুরুল আমীন, নিজাম-ই-ইসলামীর পীর মোহসেনউদ্দিন আহমেদ (দুদু মিঞা), ন্যাপের মাহমুদ আলী। নয় নেতার এই দাবী ৮ জুলাই, ১৯৬২ ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ঘোষিত হয়। দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৬। ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০০। মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০। এছাড়াও দেখুন আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩।

৩৭. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৬।

৩৮. ''এতে পাকিস্তানের দুই অংশের অনেকগুলো দল- যথা আওয়ামী লীগ, কে এস পি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নিজাম-ই-ইসলাম শামিল হলো।'' দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০২-১০৩।

৩৯. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮২।

৪০. এ প্রসংগে আবদুল হক লিখেছেন, ''প্রকাশ্যে বলা না হলেও 'এবডো'ভুক্ত নেতৃবৃন্দ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁরাই এক সময় নেতা ছিলেন, তার ফলে তরুণতর নেতারা নেতা হয়ে উঠবেন। এই কারণেই রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবনের বিরোধিতা করছিলেন।'' দেখুন, *ঐ*, পৃঃ ৮৭।

৪১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৫ এবং ১২২।

৪২. সোহরাওয়ার্দী ১৯৬৩ সালে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৬।

৪৩. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০। আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৮।

৪৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৭-১১৮ এবং ১২২-১২৩।

৪৫. ''এন ডি এফ - এর এ- সভাতে বলা হয়, আওয়ামী লীগের পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আওয়ামী লীগ থেকে সরে গেছেন। সুতরাং এখন থেকে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক। তাই সরকারের উচিত এধরনের একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠনকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। তারা আভাসে ইঙ্গিতে এও বললেন যে, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জন্য একটি আত্মঘাতী সংগঠন বলেই এন ডি এফ- এ আসেনি।'' দেখুন আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৯-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. ঐ, পৃঃ ১১৭।

৪৭. ঐ, পৃঃ ১২৩ ও ১২০।

৪৮. ঐ, পৃঃ ১২০, ১২৩ এবং ১৩০-১৩১।

৪৯. ঐ, পৃঃ ১২৬।

৫০. ঐ, পৃঃ ১২০-১২১ ও ১২৪-১২৫।

৫১. 'ভোটাধিকার কমিটি' কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সুপারিশের ভিত্তিতে 'নির্বাচক সমিতি বিল' (ইলেকটোরাল কলেজ বিল) মার্চ, ১৯৬৪ সংসদে উত্থাপিত হয়। এর প্রতিবাদে সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৮।

৫২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ঐ, পৃঃ ১০৪।

৫৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২-৩৩। ড. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৯-১১০।

৫৪. ১১ -দফা দাবীসমূহ ছিল -...

"১) ফেডারেল অব পাকিস্তান নামে সত্যিকার অর্থে ফেডারেল পদ্ধতির প্রণয়ন।

২) বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েম ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন।

৩) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারি উচ্চপদে মেধা অনুসারে বাঙালিদের নিয়োগ।

৪) পাকিস্তানের উভয় অংশে বৃহৎ শিল্পকারখানা জাতীয়করণ।

৫) মোহাজেরদের জন্য সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়ন।

৬) ফেডারেশনে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ সাধনে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি প্রণয়ন।

৭) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থনীতি প্রণয়ন।

৮) পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন।

৯) বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবনিকাশ ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার প্রদেশের হাতে ন্যস্তকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১০) পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর প্রতিষ্ঠাসহ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন।

১১) ছাত্রদের দাবী দাওয়াসহ শ্রমিক-কৃষকদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরন।''

দেখুন আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৭।

৫৫. দেখুন, মুনতাসীর মামনু ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২।

৫৬. কপভুক্ত দলগুলি ছিল- আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নিজাম-ই-ইসলামী। দেখুন, আবু আল সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১-১৩২।

৫৭. নয় দফা ছিল নিম্নরূপ -

''১) একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন;

২) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা;

৩) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আইন ও বাজেট প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান;

৪) প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিধান;

৫) প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসকরণ;

৬) শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ;

৭) আইনের সাংবিধানিক বৈধতা যাচাইয়ের ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টকে প্রদান;

৮) সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি;

৯) নিবর্তনমূলক সকল আইনের বিলুপ্তি।''

উদ্ধৃত ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭।

৫৮. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩০।

৫৯. *ঐ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০।

৬০. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল এবং বাংলাদেশ*, পৃঃ ৩৭।

বস্তুত, মৌলিক গণতন্ত্রীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইয়ুব খানকে ভোট দেবে, এটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ আইয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থায় রাজনীতির সংগে সংগে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণও যুক্ত ছিল। আইয়ুব খানকে ভোট না দেয়ার অর্থ এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া। তদুপরি, আইয়ুবের পক্ষে ভোট দেয়ার প্রবল চাপতো ছিলই। তা সত্বেও অনেক মৌলিক গণতন্ত্রী আইয়ুবের পরিবর্তে ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেন, যদিও তিনি জয়ী হতে পারেননি। নির্বাচনে প্রদত্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভোটের (৯৯.৬২%) মধ্যে আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৩.৬% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫১.১% পেয়েছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ৪৬% -এর বেশী মৌলিক গণতন্ত্রী তাকে ভোট দেননি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, পৃঃ ৩৩। ঐ, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃঃ ৩৩।

৬১. ড. রঙ্গলাল সেন, 'ষাটের দশকে বাংলাদেশ ও বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,' *গৌরবের চল্লিশ বছর ১৯৫২-৯২*, ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা ১৯৯৩, পৃঃ ১০০। এছাড়াও ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খন্ড)*, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬২. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২১।

৬৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, পৃঃ ২৪।

৬৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে*, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ১২।

৬৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *ঐ*, পৃঃ ১৪।

৬৬. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ২২।

৬৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Mohammad Ayub Khan, *Friends not Masters*, Karachi, 1967.

৬৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, 'আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর, ১৯৭৪।

৬৯. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২।

৭০. দৈনিক ইত্তেফাক ২২.২.১৯৫৯।

৭১. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি- সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃঃ ৭৭।

৭২. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১১২-১১৩।

৭৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৮, ডঃ প্রীতিকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬, এবং রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৫-১১৭।

৭৫. পাকিস্তানের লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি, শপথনামা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৮।

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৯।

৭৭. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৭।

৭৮. কে জি মোস্তফা, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ গ্রেফতার হন। দেখুন, ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৯।

৭৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, দৈনিক আজাদ, ৮.৫.১৯৬১, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯-৮০।

৮০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবদুল্লাহ আবু সাঈদ, 'নীরব সংঘ' ও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী', *বিদায়, অবন্তী !* ঢাকা, ১৯৯৫।

৮১. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮১।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ''আমরা শতবার্ষিকী কমিটি গঠন করলে হাইকোর্টের বিচারপতি মুর্শেদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এতে এলেন। সরকার তাঁকে সরাসরি নিষেধ করতে পারছেনা তাই বল্ল, তাঁদের কাছে খবর আছে ভারতীয় দূতাবাস এসব অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করবে। তিনি কিন্তু এতে পিছিয়ে গেলেন না। বরং আমাদের বল্লেন যে অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকা তিনি সংগ্রহ করে দেবেন। এমনকি অনুষ্ঠান শেষে যখন কিছু দেনা রয়ে গেল তখনও তাঁর এক আত্মীয়কে চিঠি দিয়েছিলেন এ টাকাটা তুলে দেবার জন্যে।''

সাক্ষাৎকার ঃ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ১০.৯.১৯৯৭।

৮২. ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, লোক বক্তৃতামালা -৭, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, আগষ্ট ২০০০, পৃঃ ২৯।

৮৩. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. ওয়াহিদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮।

৮৫. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮১।

৮৬. এ প্রসঙ্গে ওয়াহিদুল হক লিখেছেন, ''সমস্ত শিল্পীরা মিলে ঠিক করলেন তাঁরা এক জায়গায় মহড়া দেবেন, এক সাথে অনুষ্ঠান তৈরী করবেন। বিভিন্ন কমিটির নামে সেই অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। ..... তিন বছর বন্ধ থাকার পর মানুষজন যেন মুক্তি পেয়েছে- সমাজই মুক্তি পেয়েছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। ..... একে বাধা দিলে সংঘাত এবং আন্দোলন নির্ঘাত। ..... বাংলাদেশ এক লাফেই যেন কোথায় চলে গেল। এতগুলো বছর ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ হ্যামিলনের বংশীবাদক হয়ে টানলেন সকলকে। ..... সামরিক আইন বজায় থাকতেই দেশটা যেন অনুষ্ঠানের দেশ হয়ে দাঁড়াল এবং অনুষ্ঠান মাত্রেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য বিশেষ জায়গা।''

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ওয়াহিদুল হক, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ পূর্বধারা', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৩২-৩৩৩।

৮৭. আবদুল্লাহ আবু সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭।

৮৮. এসময় গঠিত হয় National Writers War Front Abd Ullah Academy এবং সমবায় লেখক সংঘ সমিতি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০২-১০৩।

৮৯. ডঃ আনিসুজ্জামান, 'রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক', *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৯১।

৯০. মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের উৎসব*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ৯০।

৯১. বুলবন ওসমান, 'বাংলাদেশ-পরিস্থিতিঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,' *রক্তাক্ত বাংলা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

৯২. মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৩।

৯৩. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৪।

৯৪. এ প্রসঙ্গে ওয়াহিদুল হক লিখেছেন, ''ছায়ানট প্রকৃতপক্ষে শতবার্ষিকী উত্থিত সাংস্কৃতিক বেগ ও বাঙালীর আত্মআবিষ্কারের অনিরুদ্ধ যাত্রারম্ভের সংগঠিত রূপ।'' ওয়াহিদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৪।

৯৫. ঐ, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।

৯৭. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩১।

৯৮. কামাল লোহানী, 'গণসঙ্গীতচর্চা ও আমাদের রাজনীতি', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৭৩।

৯৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ওয়াহিদুল হক, 'রবীন্দ্র সঙ্গীতঃ পূর্ব ধারা', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৭। এ ছাড়াও দেখুন, ঐ, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯-৩০।

১০০. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৩।

১০১. ওয়াহিদুল হক, 'রবীন্দ্র সঙ্গীত ঃ পূর্বধারা' *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৭।

১০২. *ঐ*, পৃঃ ৩৩৭।

১০৩. *ঐ*, পৃঃ ৩৩৮।

১০৪. ঐ, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

১০৫. কামাল লোহানী, *প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, লতিফা কাওসায়েন জীবন স্মারক বক্তৃতা, সমাজ চেতনা, ঢাকা, ১৯৯৮,পৃঃ ২০।

১০৬. ওয়াহিদুল হক, 'রবীন্দ্র সঙ্গীতঃ পূর্বধারা', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৫।

১০৭. মাহফুজ উল্লাহ, 'বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঃ* মাঘ-চৈত্র ১৩৭৮, পৃঃ ১০৩।

১০৮. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮২।

১০৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮০-২৮১।

১১০. দেখুন সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৩।

১১১. *ঐ*, পৃঃ ৮৩।

১১২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭৬।

১১৩. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৩।

১১৪ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ২০৭-২০৮।

১১৫. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সভা-সমিতি*, ঢাকা, ১৯৮৪ পৃঃ ২৩০।

১১৬. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎ সমাজ*, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ৭৪।

১১৭. মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৩।

১১৯. নাজিম সেলিম বুলবুল, *আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে গণ-সংগীতের ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৭৯।

১২০. *ঐ*, পৃঃ ৬১-৬২।

১২১. কামাল লোহানী, 'গণসঙ্গীতচর্চা ও আমাদের রাজনীতি', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৪।

১২২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, নাজিম সেলিম বুলবুল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭-৭৩। এছাড়াও দেখুন, কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫।

১২৩. ওয়াহিদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩০।

১২৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩০-৩৩৪।

১২৫. মুনতাসীর মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২।

১২৬. এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু নন, ব্রাহ্ম ছিলেন, ব্রাহ্মরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন।

১২৭. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, 'প্রতিরোধের সড়ক ধরে এবং রবীন্দ্রনাথ,' *সময়ের মুখ তাঁহাদের কথা*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ৮৩।

১২৮. *ঐ*, পৃঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের দাবি

(১৯৬৬ - ১৯৬৯)

১

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে খানিকটা ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করি। এ সময় বাঙালিদের মনে ভারত বিরোধী একটি মনোভাব যে প্রবল হয়ে উঠেছিল তা অস্বীকার করা যাবেনা। কেন্দ্রীয় সরকারও এ সময়টিকে পাকিস্তানবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিল। এর মূল কথা ছিল- ''ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশের আকাঙ্খাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মকথা।''[১] এ সময় রাজনীতিবিদরা নীরব ছিলেন। ''সৃষ্টিশীল সাহিত্য, সঙ্গীতে, সংবাদপত্রে সর্বক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিরা এতে সায় দিয়েছেন।''[২]

যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতেই হঠাৎ যেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঘুম ভাঙলো। অকস্মাৎ তারা আবিষ্কার করল, তারা প্রতারিত হয়েছে। যুদ্ধের সময় তাদের সীমান্ত ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভারত যে আক্রমণ করেনি তা' ছিল ভাগ্য। এ মনোভাব ক্ষোভের সৃষ্টি করল এবং এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল বা তা সংহতরূপে প্রকাশ পেল শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা ঘোষনায়। অন্যদিকে, যুদ্ধের সময় বাঙালিরা যে একাত্মতা দেখিয়েছিল শাসকগোষ্ঠী সে মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে বাঙালির ভাষা-সাহিত্যের ওপর আবার আক্রমণ শুরু করল। এবং সংস্কৃতিসেবীরাও এর বিরুদ্ধে আবার লড়াই-এ অবতীর্ণ হলেন। এই পর্বের প্রধান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলেই তা স্পষ্ট হবে। নিম্নে ক্রমানুয়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৬-দফা ঘোষণা এই সময়কালের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এর মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে সফলভাবে রাজনৈতিক রূপ দিতে সক্ষম হন বা রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে সক্ষম হন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ লাহোরে একত্রিত হন। উদ্দেশ্য আইয়ুব খানের তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধীতা করা। ৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের বৈঠকে শেখ মুজিব ৬-দফা উপস্থাপন করেন। কিন্তু অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিরোধীতার কারণে এটি আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে শেখ মুজিব ঐ স্থান ত্যাগ করেন। এবং ঐ দিনই লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ৬-দফা ঘোষণা করেন।[৩] ৬-দফার রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ[৪]-

১ নং দফা

''ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।''

২ নং দফা

''ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।''

৩ নং দফা

এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে তম্মধ্যে যে- কোনও একটি গ্রহণ করলেই চলবেঃ

''ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা- অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবেনা, আন্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অন্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) দুই অন্ঞলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অন্ঞলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।''

৪ নং দফা

''সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আন্ঞলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবেনা। আন্ঞলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইব।''

৫ নং দফা

এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের ব্যবস্থা করা হয় ঃ

''১) দুই অন্ঞলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

২) পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে,

৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অন্ঞল হইতে সমান-ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অন্ঞলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশ ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আন্ঞলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।''

Dhaka University Institutional Repository

৬ নং দফা

এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী-বাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আওয়ামী লীগের প্রধান নেতারা ৬-দফার বিরোধীতা করেন। কারণ এই দাবিসমূহ উপস্থাপনের পরই তারা এ সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের তরুণ অংশসহ পূর্ব বাংলার জনমানুষ একে সানন্দে গ্রহণ করে। বস্তুত, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী এই অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসিত স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তে শুধুমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ মেনে নিয়েছিল, সমর্থন করেছিল। ভেবেছিল, নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক আমলের সকল প্রকার শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্টতা সত্ত্বেও প্রথম থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে তারা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্ব লাভ করেনি। উপরন্তু, পুনরায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শিকার হয়। ফলে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনসহ ন্যায্য অধিকারের দাবী উত্থাপিত হলেও লাহোর প্রস্তাবের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দাবী জানায়নি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা দলসমূহ। কিন্তু এই দাবীই ক্রমশ বেগবান হয়ে ওঠে এবং অবশেষে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ৬-দফা দাবী হিসেবে ঘোষিত হয়। লাহোরে ৬-দফা ঘোষনার পর (৬ ফেব্রুয়ারী) শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন (১১ ফেব্রুয়ারী)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ এর বিরোধীতা করলেও তরুণ নেতা-কর্মীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে এটি সমর্থ হয়। অবশেষে ৬-দফা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি (১৩ মার্চ) ও কাউন্সিল অধিবেশনে (১৮-১৯ মার্চ) অনুমোদন লাভ করে। এবং ওয়াকিং কমিটির সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬-দফা ঘোষিত হয়।[৫]

কিন্তু ইতোপূর্বেই আওয়ামী তরুণ নেতা-কর্মীদের নিরলসভাবে প্রচারনার ফলে এটি পূর্ব বাংলার সর্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। সকলের কাছে এটি সমাদৃত হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র জনসভা করে ৬-দফার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানাতে থাকেন। এ লক্ষ্যে কম সময়ের ব্যবধানে সকলকে অনুপ্রাণীত করে তুলতে সক্ষম হন। " প্রায় সর্বত্রই শেখ

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব ছুটছেন, প্রায় প্রতিটি জনসভাতেই তিনি বলতেন, ওরা আমাকে বেশি সময় দেবেনা। আমার অবর্তমানে ৬-দফার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সত্যিই শেখ মুজিব এর পর সময় পেয়েছিলেন মাত্র ৫ সপ্তাহের মতো। মাত্র ৩৫ দিনে তিনি ৩২ টি জনসভা করেছিলেন।"[৬]

অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যেমন- কাউন্সিল মুসলিম লীগ, এন ডি এফ, জামায়াতে ইসলামী, নেজাম-ই-ইসসলামী এবং ন্যাপ নেতা ভাসানী ৬-দফাকে সমর্থন করেননি। কিন্তু তাঁরা উপলব্ধী করতে পারেননি যে এটি জনগণের কাছে এতটা সমাদৃত হবে। বস্তুত, তাঁদের আচরণে, কার্যপদ্ধতিতে দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা একদিকে বলছেন যে তাঁরাও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন চান। কিন্তু তা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় এবং অবশ্যই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে। উল্লেখ্য বাঙালি স্বায়ত্বশাসনের দাবী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে জানিয়ে আসছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক মনোভাব, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কারণে বাঙালির প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। রাজনীতিবিদেরাও এক্ষেত্রে সফলভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এ সময় রাজনৈতিক দলগুলো মৌখিকভাবে স্বায়ত্বশাসনের দাবী জানালেও নীতিগতভাবে তাদের নীতি হিসেবে এটি গৃহীত হয়নি।[৭]

যাই হোক, এ সময় আমরা দেখি এন ডি এফ নেতা আতাউর রহমান খান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের তাসখন্দ চুক্তির প্রশংসা করছেন। এবং তাঁর পক্ষ হতে ৫-দফা দাবী সম্বলিত একটি লিফলেট (২১ শে ফেব্রুয়ারী) বিলি করা হয়। এতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, যুক্ত নির্বাচন, অভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, স্বায়ত্বশাসনসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী জানানো হলেও পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের তথা প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়নি।[৮] বস্তুত, পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত সীমানাসহ স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় দীর্ঘ দু'দশকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর সকল প্রকার শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির পুঞ্জিভূত ক্ষোভের প্রথম দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিবাদ স্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা ঘোষণা করেন। আর সে কারণেই এর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বব্যাপী। প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একে 'বিপজ্জনক' বলে আখ্যায়িত করে।[৯] ন্যাপ নেতা ভাসানীও একে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। ফলে এ সময় তাঁর আইয়ুব প্রীতি পুনরায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১০] ছাত্র ইউনিয়নের চীনপন্থী মেনন গ্রুপও ভাসানীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, চীনের সঙ্গে বন্ধুতপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই গ্রুপ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে প্রগতিপন্থী বলে মনে করতেন।[১১] ''তাঁদের এ রণনীতি বা রণকৌশল ১৯৬৮-র শেষপাদে আইউব খানের গদি নড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।''[১২] অবশ্য ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের ৬-দফার সমর্থক অংশ ৬-দফার লিফলেট ছাপানোর কাজে সহায়তা করেছেন।[১৩] ৬-দফার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের পূর্বের অবস্থানেই অটল থাকেন। অর্থাৎ তাঁরা একে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করতে থাকেন। ইতোমধ্যে তাঁরা ৬-দফা আন্দোলন ত্যাগ করার জন্য শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উদ্দেশ্য, ঐক্যবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচী প্রণয়ন।[১৪] শেখ মুজিবের ৬-দফা আন্দোলন ছাড়ার প্রশ্ন ছিল অবান্তর। ফলে বিরোধী দলগুলো ১৯৬৫ সালের ২ মে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (সংক্ষেপে পি ডি এম) নামক একটি জোট গঠন করে। এবং পরবর্তীতে ৮-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৫]

সরকার প্রথমদিকে ৬-দফা আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি। কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রায়শই এরূপ দাবীনামা সম্বলিত কর্মসূচি প্রদান করতো। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে এর প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন তাদের ভীত করে তোলে। আইয়ুব খান একে পাকিস্তানের ঐক্য বিনষ্টের অপপ্রয়াস, বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন। এই অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য তিনি প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগের হুমকী দেন।[১৬] এসময় ক্ষমতা সংহতকরণে গৃহীত পূর্বোক্ত ব্যবস্থাবলীর মহিমা পুনরায় ব্যক্ত করতে থাকেন। অর্থাৎ কেন্দ্রের শক্তি বলবৎ রাখা, সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাসহ পরোক্ষ নির্বাচন কায়েম রাখা।[১৭] পরবর্তীতে তিনি এরূপ বক্তব্যও প্রদানে দ্বিধা করেননি যে, ''নির্বাচন ব্যাপারটা ঠিক ইসলাম সম্মত নয়।''[১৮] তদুপরি, ক্ষমতা সংহত করণের লক্ষ্যে সংবিধানের সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যা প্রতি প্রদেশে ৪০ হাজার থেকে ৬০ হাজারে উন্নীত করা হয়। এছাড়াও ''সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানে এতদিন কোনো

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদে পাঞ্জাবীদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি ছিলোনা, এখন তাদেরকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হলো, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানীদের সে অধিকার দেওয়া হলোনা, কেন্দ্রীয় পরিষদে সংখ্যা সাম্য থেকেই গেলো।''[১৯] যা'হোক, কোনভাবেই ৬-দফা দাবীর অগ্রযাত্রাকে বিনষ্ট করতে সফল না হওয়ায় সরকার শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এর দ্বারা ৬-দফার প্রচারনা, অগ্রযাত্রাকে রোখা সম্ভব হয়নি। বরং সরকারি দমন-নিপীড়ন-বাধার ফলে আওয়ামী লীগ নেতা -কর্মীদের মনোবল আরো দৃঢ় হয়। এবং ৬-দফা আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে যায় সর্বস্তরের মানুষের কাছে। উপায়ন্তর না দেখে সরকার ৮ মে (১৯৬৬) শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অনেক নেতাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে।[২০] এভাবে ১০ মে-র মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ৩৫০০ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী বন্দী হন।[২১] উদ্দেশ্য, নেতা-কর্মীদের অনুপস্থিতিতে ৬-দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, আন্দোলনের গতিধারা অব্যাহতই থাকে। শেখ মুজিব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং ৬-দফার প্রতি সমর্থনে ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক হরতাল আহুত হয়। সবধরণের পদক্ষেপ নিয়েও এই হরতাল প্রতিরোধে সরকার ব্যর্থ হন। পুলিশের গুলিবর্ষণে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বেশ কয়েকজন নিহত হলে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠে।[২২] উত্তেজিত জনগণ শেষ পর্যন্ত থানা থেকে গ্রেফতারকৃতদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে।[২৩] ৭ জুনের হরতালের সাফল্যে ক্ষুব্ধ হয়ে সরকার আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দকেও গ্রেফতার করে। 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক মানিক মিয়া গ্রেফতার হন ১৫ জুন। পরদিন 'ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।[২৪] সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ৬-দফা সংক্রান্ত সংবাদ ছাপানো ছিল এর কারণ।[২৫] এভাবে সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে সচেষ্ট হলেন যাতে ৬-দফা আন্দোলনের বার্তা জনগণের কাছে না পৌঁছায়। এর প্রতিবাদ স্বরূপ ঢাকা ও চট্টগ্রামে সাংবাদিক, সংবাদপত্র কর্মচারীরা সফলভাবে প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। ২১ জুন মর্নিং নিউজ, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান বাদে সকল সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ থাকে।[২৬] পরবর্তীতে হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনের আটকাদেশ ও নিউনেশনের বজেয়াপ্তকরণকে যথাক্রমে বৈধ এবং বিধিবর্হিভুত ঘোষণা করেন। প্রাদেশিক আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

লীগের সভাপতি শেখ মুজিব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার আদেশ বৈধ ঘোষিত হয়।[২৭]

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী সরকারি নির্দেশে আওয়ামী লীগের ৯,৩৩০ জন কর্মী গ্রেফতার হন।[২৮] ''গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ৬-দফা প্রচার করবে এমন একজন আওয়ামী লীগ সদস্যও তখন জেলের বাইরে ছিলোনা, যাও বা দু' একজন ছিলেন প্রকাশ্যে আসতে পারছেন না।[২৯] কিন্তু আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কারণ ইতোমধ্যেই ৬-দফা বাঙালির বাঁচার দাবীতে পরিণত হওয়ায় ৬-দফা আন্দোলন জনগণের সংগ্রামের পর্যবসিত হয়।

১ .২।। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও এর অভিঘাত

৬-দফা ভিত্তিক আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সরকার বাঙালির সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ শুরু করে। এরই ফলস্বরূপ ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ১লা বৈশাখ নিষিদ্ধ করা হয়। আইয়ুব খান পুনরায় জাতীয় ভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা স্বরূপ বাংলা ভাষা সংস্কারের উদ্যোগ নেন। এসময় রোমান, আরবি হরফ প্রবর্তন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রচারণা চালাতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধিজীবি, সাংস্কৃতিক কর্মী-সংগঠন এককথায় সংস্কৃতিসেবীদের দৃঢ় প্রতিবাদে প্রতিটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অতঃপর বাঙালির ৬-দফাভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন সহ সকল ন্যায্য দাবী বানচাল করার নতুন পদক্ষেপ হিসেবে শাসকগোষ্ঠী ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে ৬-দফা প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে (পরবর্তীতে এসংখ্যা ৩৫ -এ উন্নীত হয়) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামক মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাঁদের গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, শেখ মুজিব তখনো কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।[৩০] সরকার ভেবেছিল এই ষড়যন্ত্রের কথা জানলে জনগণ অসন্তোষে ফেটে পড়বে। বরং তারা সরকারি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সোচ্চার হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ এর প্রতিবাদে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু করে। ঢাকা থেকে ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই উম্মাতাল অসন্তোষের বিস্তার ঘটে। ক্রমে ১১-দফা দাবীর ভিত্তিতে ছাত্রদের আন্দোলন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারীতে তীব্র রূপ লাভ করে এবং জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে এটি গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।[৩১] মুলত ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে সর্বস্তরের মানুষ ১৪৪ ধারা

Dhaka University Institutional Repository

অমান্য করে রাজপথে নেমে আসে।[৩২] এসময় ছাত্র-জনতা পুলিশের গুলিতে অকাতরে প্রাণ হারাতে থাকেন। ২০ জানুয়ারী শহীদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ও সেন্ট্রাল ল' কলেজের ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) নেতা আসাদুজ্জামান।[৩৩] ২৪ জানুয়ারী নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান এবং মকবুল, রোস্তম আলী সহ অনেকে শহীদ হন।[৩৪] এতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সর্বস্তরের বাঙালি জনসমাজ। সারা ঢাকা শহরে ক্রমাগত আইয়ুব বিরোধী হরতাল, মিছিল চলতেই থাকে। শাসকগোষ্ঠীর বর্বরতায় প্রতিবাদস্বরূপ ক্ষুব্ধ জনগণ সরকার সমর্থক 'দৈনিক পাকিস্তান' (দৈনিক বাংলা) এবং 'মর্নিং নিউজ' বিল্ডিং-এ অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। এছাড়াও কয়েক স্থানে মুসলিম লীগের অফিস, আইয়ুব খানের কুশপুত্তলিকাসহ তার গ্রন্থ "Friends Not Masters" গ্রন্থটি দাহ করা হয়।[৩৫]

১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি' (ডাক) নামে একটি ঐক্য জোট গড়ে তোলে।[৩৬] এবং ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণার[৩৭] তিনদিন পর (৮-১-১৯৬৯) 'ডাক' ৮-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৩৮] এর মূল বক্তব্য ছিল গণতন্ত্র পুণরুদ্ধার। 'ডাক' নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয়। জোটটি গঠিত হয়েছিল একাধারে ডান-মধ্য-বামপন্থীদের সমন্বয়ে। এতদসত্ত্বেও এতে ৬-দফার প্রতিফলন ঘটেনি।[৩৯] ফলে আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে 'ডাক' ব্যর্থ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ ছাত্রদের ১১-দফা দাবী গ্রহণ করে। কারণ এতে ৬-দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং ক্রমে ঢাকা শহর থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ ফরহাদ লিখেছেন, ''এই সময় থেকেই প্রধানত ১১-দফা কর্মসূচী ও ছাত্রদের সংগ্রামী নেতৃত্ব পূর্ব বাংলায় প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায় ও আন্দোলন ছাত্র নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। সারা পূর্ব বাংলাতেই এই অবস্থা দেখা দেয়। ছাত্র নেতারা কর্মসূচী ঘোষণা করতো -'ডাক' প্রভৃতি অন্যরা তা সমর্থন করতো। জনগণও ছাত্র নেতৃত্বের আহবানে এগিয়ে আসতে থাকে। পূর্ব বাংলায় গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রদের কাছে চলে যায়।''[৪০] মৌলিক গণতন্ত্রীদের অনেকে ছাত্রদের আহবানে পদত্যাগ করে। আবার, অনেককে পদত্যাগে বাধ্য করানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক গণতন্ত্রের অবসান প্রয়োজনীয় ছিল। এভাবে দেখা যায়, ''প্রায় দশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারীর সংখ্যা ছিল ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাত্র।''[৪১] 'ডাক' কর্তৃক সাধারণ নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্তে পদত্যাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৪২] জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় কয়েকজন সদস্যও সে পথ অনুসরণ করেন।[৪৩] আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানেও বিস্তার লাভ করে।

পুলিশ - ইপি আর - সোনাবাহিনীকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করেও সরকার গণ-অভ্যুত্থান দমনে ব্যর্থ হন। অবশেষে ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিরোধী দলকে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য আহবান জানাতে বাধ্য হলেন। সেনাবাহিনীসহ ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় আইয়ুব খানের আগমন উপলক্ষ্যে 'কালো দিবস' পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সর্বত কালো পতাকা টাঙ্গানো হয়। এ দিন ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার সহ মোনায়েম খান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ১১ দফার ভিত্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার চুড়ান্ত ঘোষণা দেয়। কিছু স্হানের নামকরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণ ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ ঘটায়। যেমন আইয়ুব নগর, আইয়ুব গেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নাম পাল্টে রাখা হয় যথাক্রমে শেরোবাংলা নগর, আসাদ গেট, মতিয়ুর পার্ক।[৪৪] এই সময় আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টমেন্টে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনীর বক্তব্য অনুযায়ী পালাতে গিয়ে তিনি নিহত হন। ঢাকা আবার বিক্ষুব্ধ নগরে পরিণত হয়। পুনরায় সেনাবাহিনী নামানো সহ ১৪৪ ধারা, কারফিউ জারী করা হয়। সেনাবাহিনী কর্তৃক আন্দোলন দমনের নামে বাঙালি নিধন চলতে থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেটের আঘাতে হত্যা করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান এমনিতেই বিক্ষুব্ধ ছিল। তাঁর মৃত্যু সংবাদে পরিস্হিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কারফিউ, সেনাবাহিনীর গুলির ভয় বাঙালির থাকলো না । মৃত্যু ভয়ে তারা আর ভীত নয়। বিক্ষুব্ধ জনগণ সরকারি ও মুসলিম লীগের দফতরসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের বাসভবনেও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।[৪৫] স্বভাবতই গোলটেবিল বৈঠক পিছিয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সহ বিরোধী দল উপলব্ধী করতে পারলেন শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া ছাড়া গণ-অসন্তোষ থামানো অসম্ভব। অবশেষে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

মামলা প্রত্যাহার করে নেন এবং শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হয়। এসঙ্গে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করারও ঘোষণা দেন। এটি ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তথা স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের বিশাল বিজয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত গণসম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভুষিত করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ১ম গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১০ মার্চ থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত ৪ দিন ব্যাপী বৈঠকে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা উত্থাপন করেন। 'ডাক' নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও।[৪৬] আইয়ুব খানও স্পষ্টতই এসব মানতে রাজী ছিলেন না। শুধুমাত্র দুটি বিষয় তিনি গ্রহণ করেন- ১. ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। কিন্তু আন্তঃলিক স্বায়ত্বশাসন, এক- ইউনিট বাতিল, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব- পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রধান দাবি স্বীকৃত হয়নি। অর্থাৎ শক্তিশালী কেন্দ্র ও সংখ্যাসাম্য নীতি বলবৎ থাকে। আইয়ুব খান এ সব বিষয়ে আরো আলোচনা চালাবার নামে আন্দোলনকে স্তিমিত করতে চান।[৪৭]

উল্লেখ্য 'ডাক'-এর ৮-দফা কর্মসূচীর প্রথম দুটো দাবী ছিল এগুলি। অন্যান্য বিরোধী দল আইয়ুবী সিদ্ধান্তকে সানন্দে গ্রহণ করে। যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবী আদায়ে উদ্যোগী হলেন না। এ থেকেই তাদের রাজনীতির ধরণ অনুধাবন করা যায়। যদিও এতদিন তাঁরাও নিজেদের স্বায়ত্বশাসনকামী বলে উল্লেখ করছিলেন। স্বভাবতই শেখ মুজিব বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। এবং 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগ সরে দাঁড়ায়। তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় ন্যাপ (মোজাফফর)। ফলে ১৪ মার্চ 'ডাক' ভেঙ্গে যায়।[৪৮] এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় রাজনীতি দুটি সুস্পষ্ট ধারায় পর্যবসিত হয়।[৪৯] একটি ৬-দফা তথা ১১-দফা পন্থী, এর সফল বাস্তবায়নের প্রশ্নে অনঢ়। অন্যটি এর বিরোধী। জনগণ কর্তৃক শেষোক্তরা প্রত্যাখাত, নিন্দিত হন।[৫০]

বঙ্গবন্ধু ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১- দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের ২১ মার্চ সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করেন। এতে

Dhaka University Institutional Repository

পূনরায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক- ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে সাবেক ৪ টি প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী জানান।[৫১] উল্লেখ্য ইতোপূর্বে ২৩ ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে তাঁর সংবর্ধনায় তিনি একই কথা বলেছিলেন।[৫২] এই দাবী স্বভাবতই পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গণ আন্দোলনের ব্যাপকতা পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে পশ্চিম পাকিস্তানেও অভিঘাত হানে। সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে গণমানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের এতদিনকার বঞ্চনা-শোষণ অবসানে অকুতোভয়ে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ইতোমধ্যে আন্দোলনের চাপে আইয়ুবের ঘোরতর সমর্থক মোনায়েম খান পদত্যাত করে ১৯ মার্চ গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তার পরিবার বর্গকে আগেই সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। নতুন গভর্ণর হিসেবে এন. এম. হুদা শপথ গ্রহণ করেন। এতসব সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শেষ পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হলেন এই গণজাগরণকে দমন করে ক্ষমতায় টিকে থাকা অসম্ভব। ফলে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ তিনি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এবং ২৫ মার্চ দেশে দ্বিতীয় বার সামরিক আইন জারী হয়। পতনের সময়ও আইয়ুব খান তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি বিদ্বেষ স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়। কারণ, বাঙালির মানস প্রবণতা বুঝতে পেরেই তিনি জনমতের ঝোঁক অনুযায়ী ক্ষমতা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে দেয়ার চেয়ে সেনাবাহিনীর কাছেই প্রত্যার্পনকে যথোপযুক্ত মনে করেন। কেননা তার অবর্তমানেও এরই মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুত্ব কায়েমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ পাকিস্তান দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।

১.৩ ১৯৬৬-৬৯ সময়কালের ঘটনাবলীর মুল্যায়ণ

১৯৬৬-৬৯ সময়কাল শুধুমাত্র পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য উল্লেখযোগ্য নয়, এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসের জন্যও অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ, অত্যন্ত ঝন্ঝামুখর এ সময়পর্বেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সুনির্দিষ্ট, সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। এবং অন্তিমে মুক্তিযুদ্ধের আগে বাঙালি জাতিকে এই প্রথমবারের

Dhaka University Institutional Repository

মতো ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। বস্তুত, এ সময় বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের দাবি-আন্দোলন জোরালো হয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বা পাকিস্তানি আমলাতান্ত্রিক শাসনের পতন ঘটায়। অর্থাৎ এ সময় পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি নতুন মাত্রা পেয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালির মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য-বঞ্চনাবোধ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী বা কেন্দ্রীয় শাসকবৃন্দ যাই বলেনা কেন, বাস্তবিকই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আন্তরিক নয়। কারণ, যুদ্ধকালীন পুরো সময় পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল। আর এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা ঘোষনায়।[৫৩] প্রাথমিকভাবে এটি ছিল বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের দাবি। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেই বাঙালি নিজ অঞ্চলের শাসনভার নিজ হাতে চেয়েছে। এটি নতুন কিছু ছিলনা। বস্তুত, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তারা এ দাবি জানাচ্ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও বাঙালি পাকিস্তানের উভয় অংশে সংহতি বজায় রাখার জন্য নিজেদের অনেক নায্য অধিকার আদায় থেকেও বিরত থাকে। উদাহরণস্বরূপ উভয় অঞ্চলের সমতা বিধানের আশ্বাসে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেয়। উল্লেখ্য প্রথম গণপরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ২৮। বাঙালি বাংলার পাশাপাশি উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী, প্রতিরক্ষা সদর দফতরসহ অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীকরণ মেনে নেয়।[৫৪] সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে বাঙালি এ সব ছাড় দিয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষনের শিকার হয়। কিন্তু ৬-দফা দাবি সরকার মেনে নিতে অস্বীকার করায় বাঙালি জাতি পুনরায় আন্দোলন শুরু করে।

৬-দফা পাকিস্তানে প্রচন্ড অভিঘাত হানে। এর দুটি দিক ছিল- প্রথমত, কৌশলগত দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় এটি পাকিস্তানের অন্যান্য অনুন্নত প্রদেশ যেমন- সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতিতেও বঞ্চনাবোধ থেকে স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনসমষ্টিও একে বিদ্যমান অবস্থা থেকে তাদের উত্তরণের বিকল্প তথা একমাত্র পথ মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ৬-দফার বিরোধীতা করে বিভিন্ন সময় জোটবদ্ধ হয়ে কর্মসূচি প্রদান করে। এসব জোটভুক্ত দলগুলোর অধিকাংশ ইতোপূর্বে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় বর্তমান সময়ে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। বামপন্থার অনুসারী ন্যাপ নেতা ভাসানীর আইয়ুব প্রীতিও পুনরায় প্রকাশ পায় যখন তিনি ৬-দফার বিরোধীতা করে নিজে ১৪- দফা ঘোষণা করেন।[৫৫] অবশ্য পরবর্তীতে দাবী আদায়ে তাঁর ঘেরাও আন্দোলন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। এবং এটি তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার হাতিয়ারে পরিণত হলেও তা এক সময় ভাসানীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।[৫৬] বস্তুত, আইয়ুব বিরোধী দলগুলো নিজেদের স্বায়ত্বশাসনকামী বললেও তন্মধ্যে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগই ছিল এর অকুণ্ঠ সমর্থক। ফলে দল দুটির গ্রহণযোগ্যতাও জনগণের কাছে বেশি ছিল। কিন্তু আইয়ুবের বৈদেশিক নীতি সমর্থনের ভিত্তিতে ক্রমে ভাসানীর আইয়ুবী ঝোঁক প্রকাশ পায় এবং তা বর্তমান কালপর্বে এসে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী দল ন্যাপে ভাঙ্গন ধরায়। এর প্রভাবে ছাত্র ইউনিয়নও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাসানীর প্রভাব অনেক খানি হ্রাস পায়। ইতোপূর্বে নভেম্বর ১৯৬৭ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাক্তণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পিপলস পার্টি নামক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[৫৭] উল্লেখ্য, ভুট্টোও একদা ৬-দফাকে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচি বলেছিলেন।[৫৮] যাইহোক ভাসানী-ভুট্টো পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে তিন দফা চুক্তি সাক্ষর করে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন।[৫৯]

বিভিন্ন প্রশ্নে বিশেষত ৬-দফাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগেও ভাঙ্গন দেখা দেয়।[৬০] কিন্তু ৬-দফা পন্থী আওয়ামী লীগ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। এতে শংকিত হয়ে সরকার আন্দোলনকে প্রশমিত, বিনষ্ট করার জন্য আওয়ামী লীগের ওপর বিভিন্ন রকম দমন-পীড়ন চালায়। যার অন্যতম উদাহরণ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'।[৬১] রাজনীতি সচেতন, গণতন্ত্রকামী, শোষিত-বঞ্চিত বাঙালির বুঝতে অসুবিধা হয়নি এটি তাদেরকে পূনরায় বঞ্চিত করার একটি অপপ্রয়াস মাত্র। ফলে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে জনগণ। ঢাকা মিছিল-হরতালের নগরে পরিণত হয়। শ্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে সারা শহর ''জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো''। কিছু মিছিলে ''পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চাই'' শ্লোগান দেয়া হয়। অনেক স্থানে দেওয়াল লিখনেও অনুরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য লিখিত দেখা যায়।[৬২] ঢাকা শহর থেকে ক্রমে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান, অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানেও গণঅসন্তোষের প্রসার ঘটে। বস্তুত, অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল তথা নেতৃবৃন্দের দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতার বিপরীতে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন ভূমিকা তাঁকে বাঙালির অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত করে, এবং দলে দলে মানুষ আওয়ামী লীগের পতাকা তলে সমবেত হয়ে কাংখিত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে।

আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর শাসনামলকে (১৯৫৮-৬৮) 'উন্নয়ন দশক' (ডিকেড অফ ডেভেলপমেন্ট) নামে চিহ্নিত করেন। এবং এ লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে পাকিস্তানে বছরব্যাপী ব্যাপক, আড়ম্বরপূর্ণ প্রচারণার আয়োজন করা হয়। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আইয়ুবী শাসনই পাকিস্তান বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। এই প্রচারণার মূল লক্ষ্য ছিল '৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। কিন্তু এ সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে সৃষ্ট দুটি ঘটনা তাঁর ইচ্ছায় ব্যাত্যয় ঘটায়। এগুলি হল ''পূর্ব পাকিস্তানে অগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে লান্ডিকোটালে চোরকারবারী পণ্য নিয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ।''[৬৩] বস্তুত, গণ আন্দোলনের প্রবল প্লাবনকে দমন করার জন্য আইয়ুব খান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা করে ভুল করেছিলেন। এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে এক পর্যায়ে ''শাসনতন্ত্র কোন ঐশী বাণী নয়'' বলতে বাধ্য হন তিনি।[৬৪] কিন্তু গণ আন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি, ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহ সার্বজনীন ভোটাধিকার মেনে নেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারী সরকারি ছুটির দিন সহ আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবেন না বলে ঘোষণা দেন। শেষ পর্যন্ত বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হন।[৬৫] কিন্তু বৈঠকে ৬-দফা অগ্রাহ্য হলে তীব্র জন অসন্তোষের মুখে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। যদিও তাঁর পতনের মাধ্যমে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের আকাঙ্খা পূর্ণতা পায়নি। এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনের ধারাবাহিকতা স্বরূপ পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ সময় অর্জিত কয়েকটি বিষয় আমাদের জাতীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সহায়ক হয়েছিল। আমাদের জাতীয় চেতনার প্রধানতম প্রতীক ২১ ফেব্রুয়ারী সরকারি ছুটির দিন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। উল্লেখ্য, '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীসভা কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হলেও সামরিক শাসন জারীর পর তা রদ করা হয়। তছাড়াও ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবীও আইয়ুব খান মেনে নেন। এসব প্রাপ্তিকে সামনে রেখে বাকী দাবিগুলো পূরণে ঐক্যবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী বাঙালি জাতি দৃপ্ত পদচারণায় অগ্রসর হয়। এবং বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের সার্বজনীন দাবি খুব অল্প সময়েই স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। রচিত হয় বাঙালির জাতির নতুন ইতিহাস। বস্তুত, ''১৯৬৬ থেকে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত শেখ মুজিব পরিচালিত ছয় দফা আন্দোলনই ছিল দেশের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। ওই আন্দোলনই আমাদের নিয়ে যায় স্বাধীনতার দোরগোড়ায়। যা অনিবার্যভাবে এক সময় এক দফা তথা স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়।''[৬৬] বাঙালি আর পাকিস্তানের কলোনি হিসাবে বিদেশী পাকিস্তানীদের শাসন-শোষণ বরদাস্ত করতে রাজী ছিলনা।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রতিরোধের সংস্কৃতি

১৯৬৬-৬৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে গণমুখী আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত, দৃঢ়-সংবদ্ধ হয়েছে। এ সময় গণমানুষকে প্রভাবান্বিত করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা বলা যেতে পারে সাধারণের লড়াইয়ের হাতিয়ারও হয়ে ওঠে সংস্কৃতি। এতে স্বভাবতই শাসকগোষ্ঠী বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে সহায়তাকারী প্রতীকগুলো ধ্বংসের জন্য কঠোর দমননীতির আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৬-দফা প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে ''আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'' দায়ের। অপরদিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র বিরোধীতা তথা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণসহ জাতীয়ভাষা সৃষ্টির নামে বাঙালির সংস্কৃতি বিনষ্টের প্রচেষ্টা নব উদ্যোগে গৃহীত হয় যা ছিল পূর্বের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রয়াসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। বস্তুত, বাঙালি সংস্কৃতি, বিকাশমান জাতীয়তাবাদী চেতনার অসাম্প্রদায়িক রূপটি শাসকগোষ্ঠীকে ভীত করে তোলে। বাঙালিতো রবীন্দ্রনাথকে অর্থাৎ তাঁর রচনাকে তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ভাবতো। বলা যায় রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চেতনার অনুসঙ্গে পরিণত হয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে বর্জন বা নিষিদ্ধকরণ আর বাংলা ভাষার মত একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে পুনর্বার আঘাত হানার যুক্তি হিসেবে বলা যায়, পাকিস্তানী জাতীয় সংহতি রক্ষা নয় বরং উভয় অংশের বৈষম্য থেকে বাঙালিদের মনোসংযোগ অন্যদিকে সরানোই ছিল মূল কারণ। বস্তুত, ভাষা-সংস্কৃতির ওপর হামলা রুখতে গিয়ে বাঙালিরা যত ব্যস্ত থাকবে, মানসিকভাবে হীনমন্যতায় ভুগবে, সে সুযোগে এখানকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার সহ অবাধে ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ প্রক্রিয়া চালানো সহজ হবে।[৬৮]

আমরা দেখেছি স্বায়ত্বশাসনের দাবী হয়ে উঠেছিল বাঙালির সার্বজনীন দাবী। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর বাঙালি এই সময়পর্বে এসে ঐক্যবদ্ধভাবে দাবী আদায়ে সোচ্চার হয়। বস্তুত, সুদীর্ঘ প্রায় বিশ বছরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনা প্রসূত ক্ষোভের প্রচন্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ৬-দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে সরকার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার করতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে আন্দোলন রোধ করা। এই সময় ছাত্র সমাজ এগিয়ে আসে। এবং আন্দোলন এগিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নেয়ার মানসে ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে, ৬-দফা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বস্তরের মানুষ এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে দাবী আদায়ে রাজপথে নেমে আসে। এ সময় বুদ্ধিজীবি, কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী প্রমুখ, সাংস্কৃতিসেবী, সাংস্কৃতিক কর্মীরাও গণ আন্দোলনে সমর্থন যোগান, শামিল হন এতে। কবি শামসুর রাহমান লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ''আসাদের শার্ট''-

''আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখন্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।''

এভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব, ভুমিকা পালনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। এবং তাদের প্রতিবাদের সাথে জনগণও সম্পৃক্ত হয়। সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে মানুষ উদ্দীপ্ত, প্রণোদিত হয়েছে স্বজাত্যবোধ, সংস্কৃতি রক্ষায়। '৬০-এর দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা পূর্বের চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ, এ সময় সীমিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের পরিবৃদ্ধির ফলে শিক্ষা, চাকুরীসূত্রে অধিকসংখ্যক মানুষ মূলত ঢাকাবাসী হলেও গ্রামের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল তাদের। আর উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ, শিক্ষিত প্রজন্মই বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আবেগজনিত উচ্ছ্বাসকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। এভাবে সংস্কৃতির গণমুখীতা বৃদ্ধি পায়। বাঙালিত্বের মন্ত্রণায় অনুপ্রাণীত ঐক্যবদ্ধ গণমানুষ সকল প্রকার ঔপনিবেশিক শোষণ-বৈষম্য অবসানে অগ্রসর হয় এবং '৬৯-এর অভ্যুত্থানের সাফল্য পরবর্তীতে অল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের কাংখিত লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

এ সময় পর্যন্ত সংঘটিত আন্দোলনগুলির ধারাবাহিক বিশ্লেষণে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, এসব হটকারী বা পরস্পরবিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক সৃষ্ট বৈষম্যকে বাঙালি জাতিগত বৈষম্য হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। বৈষম্যের অবসানে বার বার ন্যায্য দাবী অস্বীকৃত হলে অবশেষে বাঙালি ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ''পাকিস্তান'' অস্বীকার করে। এবং অচিরেই

Dhaka University Institutional Repository

শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের অবসান ঘটায়।

নিম্নে এই সময় পর্বে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসন এবং এর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতি সেবী তথা সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে আলোকপাত করা হলো-

২ .১ রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার হ্রাস-নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত বিতর্ক

১৯৬৭ সালের জুন মাসে জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ২০ জুন কথা প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের সরকারি দলীয় নেতা খান আবদুস সবুর ১লা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনকে বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন এটি পাকিস্তানী তাহজীব তমদ্দুনের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং পাকিস্তান রক্ষার নিমিত্তে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক।[৬৯] ২২ জুন বিরোধী দলের সদস্যদের কৃত প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রেডিও, টেলিভিশনে পাকিস্তানী আদর্শ, সংস্কৃতি বিরোধী রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধসহ ভবিষ্যতে রবীন্দ্র সঙ্গীত পুরোপুরি বন্ধের ঘোষণা দেন।[৭০] এর পেছনে শাসকগোষ্ঠীর ভারতীয় তথা হিন্দু বিদ্বেষতো ছিলই, সর্বোপরি ছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি- এই স্বকৃত ভুল অনুধাবন করে বাঙালির পুনরায় বাঙালি হতে চাওয়াকে প্রতিরোধ করা।[৭১] বাঙালির সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম অবদান, প্রভাবের কারণে তাঁর স্থিতি বাঙালির চেতনার গভীরে বিরাজমান। সুতরাং ''পূর্ববঙ্গের মানুষকে বাঙালিত্বের বোধের মধ্যে এনে তাদেরকে একটা ঐক্যসূত্রে বেঁধে প্রচন্ড রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত'' করতে সক্ষম হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত।[৭২] এ সময়ে বাঙালির বিকশিত জাতীয়বাদী চেতনার রূপটি ছিল গণতন্ত্রকামী, অসাম্প্রদায়িক। বস্তুত, পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালি সংস্কৃতি-ঐতিহ্য গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নে বাঙালি মানস প্রবণতায় দোদুল্যমানতা ছিল। কিন্তু '৬০-এর দশকে এসে এই দ্বন্দ্ব-সংকট তারা কাটিয়ে ওঠে। রাজনীতিবিদেরা অনেকক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলেও সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কোনরকম দোটানায় ভুগেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসনামলে স্থবির-বদ্ধ পরিবেশ ঘোচাতে সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে পালিত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সফলতা তথা বাঙালি সংস্কৃতির জাগরণ শাসকবর্গকে ভীত করে। সরকারের রবীন্দ্র বিরোধীতা, তৎপরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্রমে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে রবীন্দ্রনাথ তথা তাঁর সঙ্গীত প্রধানতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ওয়াহিদুল হক লিখেছেন, ''রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাজনীত্যায়ণে কোন ধরনের রাজনৈতিক দলের কোন ভূমিকা ছিলনা। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত- ভাগের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তানে অনিরাকৃত সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ববঙ্গের মানুষের স্বাধিকার অর্জনের ও সেই লক্ষ্যে জাতিসত্তার চেতনায় পৌঁছুবার সংগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গীত সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে। এই ভূমিকায় স্বভাবতই রবীন্দ্রসঙ্গীত পকিস্তানী শাসকচক্রের সবচাইতে পরিহার্য এবং হন্তব্য শত্রুতে পরিণত হয়েছে।''[৭৩]

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এই ঘোষণা বাঙালি সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে তার ধরণ ছিল দুরকম। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দা-প্রতিবাদ জানিয়ে উনিশ জন বুদ্ধিজীবি বাঙালির সংস্কৃতির ওপরে এই আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য সকলের উদ্দেশ্যে আহবান জানান।[৭৪] সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, ''স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩ শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্মতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।''[৭৫] ছায়ানট, ক্রান্তি, সৃজনী, অপূর্ব সংসদ, বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, সংস্কৃতি সংসদ, স্পন্দন, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), আমরা ক'জন, শিল্পী ও সাহিত্য সংঘ, বাণীচক্র, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, পূরবী, ঐকতান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। ঢাকাবাসী কয়েকজন প্রগতিমনা উর্দু কবিও এর প্রতি নিন্দা জানান।[৭৬] ক্রমে এই প্রতিবাদে রাজনীতিবিদেরাও শামিল হন। উল্লেখ্য এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা কারারুদ্ধ ছিলেন। বামপন্থী দল কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে ন্যাপ নেতা মাওলানা ভাসানী এসময় এগিয়ে আসেন। তিনি সরকারের এ ধরনের অপপ্রয়াসকে রোধ করার লক্ষ্যে জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, ''ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জন্ম ঘোষণা করেছে। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই, যারা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন।[৭৭] আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আমেনা বেগম, ন্যাপ (মস্কো পন্থী) সম্পাদক মোহাম্মদ সুলতান প্রমুখ রাজনীতিবিদ পৃথকভাবে সরকারি বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।[৭৮] ক্রমে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ ঢাকার সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে।

অপরদিকে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে পাকিস্তানী পন্থার অনুসারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, সঙ্গীত শিল্পীসহ বিভিন্ন সংগঠন। উনিশজন বুদ্ধিজীবির বিবৃতির সমালোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষকের প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয় ঃ

১৮ জন বুদ্ধিজীবির বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে যে স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকার কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলা ভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতির সম্পর্কে এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।[৭৯]

অপর আরেকটি বিবৃতি দেন চল্লিশজন বুদ্ধিজীবী যাদের অধিকাংশ ছিলেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।[৮০] তাঁরা উনিশজন বুদ্ধিজীবির বিবৃতিকে অত্যন্ত 'মারাত্মক', 'বিভ্রান্তিকর' এবং পাকিস্তানের মূলনীতি বিরোধী উল্লেখ করে বলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বজাধারী রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করেন না।[৮১] ক্রমে একইরূপ বিবৃতি দেন মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে ত্রিশজন বিশিষ্ট মওলানা।[৮২] সেসঙ্গে পয়তাল্লিশ জন সঙ্গীত শিল্পীও এর সঙ্গে যুক্ত হন।[৮৩] রবীন্দ্র বিরোধী উপর্যুক্ত বিবৃতি বক্তব্যের সমর্থনে এগিয়ে আসে তমদ্দুন মজলিশ, পাকিস্তানী ইসলামী ছাত্র সংঘ, পাকিস্তানী জমিয়তে তালাবায়ে আরাবীয়া, রূপায়ন

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি সংসদ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক চেতনাশ্রয়ী সংগঠন ছাড়াও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট এন এস এফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন)। বিভিন্ন সংবাদপত্র একাজে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে।[৮৪] সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র বিরোধীতার স্বপক্ষীয়দের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 'দৈনিক আজাদ'-এ -

''রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল। তাই বিলম্বে হইলেও --- আমরা সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।''[৮৫]

সরকার কর্তৃক গৃহীত এই পদক্ষেপ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণকে পুনরায় আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করায়। স্বভাবতই জয় হয় স্বজাত্যবোধ তথা বাঙালিত্ববোধের। যার ফলে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সরকারি প্রচারণায় সৃষ্ট পাকিস্তানীবোধ নিমেষেই কেটে যায়। ঢাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে ''ক্রান্তি'' ও ''অপূর্ব সংসদ'' এ লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে।[৮৬] বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে ঢাকায় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় একটি সভা। সভায় উপস্থিত বক্তারা ''রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ---এবং বঙ্গ সংস্কৃতির ওপর হামলা ১৯৫২ -র ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।''[৮৭] বেগম সুফিয়া কামাল এ প্রসঙ্গে বলেন, ''রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। তাইতো তিনি বিশ্বকবি। তিনি সবসময় মানবতার কথা বলেছেন। তাঁর অবস্থান আমাদের অন্তরের গভীরে, তাঁর সাহিত্য-গান আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।''[৮৮]

কারিগরী মিলনায়তনে ডঃ কুদরাত-ই-খুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় বক্তাদের প্রদত্ত বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, মূলত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে সরকার পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামে সংস্কৃতির ওপর বিরামহীন আক্রমণ চালাচ্ছে। বহুজাতিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রয়েছে।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি মিছিলের মাধ্যমে ক্রমে একটি আবহ তৈরী হয়ে সর্বত্র পরিব্যাপ্তি লাভ করে। বাঙালির এই জাগরণে সরকার শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র বিরোধীতা থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। তথ্য প্রতিমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে বিবৃতি প্রদান করে তাঁর পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। সে সঙ্গে এও যোগ করেন যে, তাঁর বক্তব্য বিকৃতভাবে সংবাদপত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি সব রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, শুধুমাত্র পাকিস্তানী সংস্কৃতি-আদর্শ বিরোধী গানগুলি প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলেছিলেন।[৯০]

সরকারের এই পশ্চাদপসরণ তথা সাংস্কৃতিক বিজয় অর্জন করেই সাংস্কৃতিক কর্মীরা থেকে গেলেন না। ঐ বছরই রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকীকে (২২ শ্রাবণ ১৩৭৪, ৮ আগষ্ট ১৯৬৭) কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংস্কৃতি সেবীরা সরকারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ঐক্যতান, ক্রান্তিসহ অন্যান্য সংগঠনকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে সাংস্কৃতিক কর্মীরা গঠন করেন ''সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ''।[৯১] এই কমিটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে অনুষ্ঠানে। সমস্ত ঢাকাবাসী যেন এতে উপস্থিত হয়, মিলিত হয়। গান-নাচ-নাটক দর্শক -শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখে। বস্তুত, ঐ সময়কালে বাঙালির জাগরণ তথা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিনষ্ট করার জন্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন দমননীতির কারণে জনমানুষ এমনিতেই বিক্ষুব্ধ ছিল। সুতরাং সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয়-অবলম্বন করে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ বাঙালিত্বের সাধনায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সরকার কর্তৃক এই অনুষ্ঠান বানচাল করার অপপ্রয়াস অনুষ্ঠানে সমাগত জনসমুদ্রের বিশালত্বের স্রোতে ভেসে যায়। সে সঙ্গে ছিল রবীন্দ্রানুরাগী পুরনো ঢাকার সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যপ্রয়াস।[৯২]

অতঃপর ছায়ানটের উদ্যোগে বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য ঢাকা থেকে কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সত্তরজন বুদ্ধিজীবী শিলাইদহে কুঠিবাড়ীতে যান।[৯৩] এইভাবে বাঙালিয়ানার বানে ভাসিয়ে রাখে

Dhaka University Institutional Repository

ছায়ানট গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত।''[৯৪] আর ''এই ঘোর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ডামাডোলে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার অষ্টাদশ মূর্তি নিয়েই যেন সংগ্রামের গানে পরিণত হয়।''[৯৫]

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে আন্দোলন তার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের বইতে। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে তিন দিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল তা শুধু ঢাকায়ই নয়। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকায় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল ''ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে।'' লিখেছেন তিনি; ''এই গানের ভাষাতেই পূর্ব বাংলার রবীন্দ্রচর্চার স্বরূপ ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। আসলে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চরিত্রই প্রতিবাদী। সরকার ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বাধাকে সামনে রেখেই সে আন্দোলন দানা বেঁধেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী সকল আন্দোলনের পশ্চাতেই এই প্রতিবাদী শক্তি কাজ করেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র এরূপ হওয়ায়, তার প্রতি গণসমর্থন এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল পরিমাণে।'' ডঃ মুরশিদ ঠিকই বলেছেন, ''বস্তুত পক্ষে, ১৯৬৭ সালের বিতর্কের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আসন এদেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তর্কাতীতভাবে স্থির হয়ে যায়।''[৯৬] যে কারণে, স্বতস্ফুর্তভাবেই ১৯৭১ সালে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' হয়ে ওঠে বাংলাদেশে জাতীয় সঙ্গীত।

২ .২ বাংলা ভাষা সংস্কার প্রয়াস ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক বাংলা-উর্দুর সমন্বয়ে রোমান হরফে একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টির পরিকল্পনা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা সংস্কারের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেছিল। বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে ঐ কমিটিকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষমতা বাংলা একাডেমীর না থাকায় আলোচ্য সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পাশ করিয়ে সেটি কার্যকর করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-পর্ষদের সদস্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক রেজিস্ট্রারের কাছে কৃত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৬৭ সালের ২৮ মার্চ বাংলা ভাষা, লিপি, বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রফেসর এমিরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ (পরিচালক, বাংলা একাডেমী)।[৯৭]

''এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সর্বস্তরে যতশীঘ্র সম্ভব বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ, অফিস আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা দূরীরকণের জন্য প্রস্তাবিত গতিকে দ্রুততর করা।'' এই কমিটিকে তাদের মত প্রণয়নের সময় বাংলা একাডেমী ও অনুরূপ সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে যে কাজ করেছেন তাকে বিবেচনা করতে বলা হয়।[৯৮] এই কমিটি দ্রুততার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করে এবং ১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী (শেষ বৈঠক) কিছু সুপারিশ গ্রহণ করে। এসময় কমিটির ৩ জন সদস্য লিখিতভাবে এর বিরোধীতা করে বলেন, ''বাংলা ভাষা সংস্কারের আশু প্রয়োজন নেই; একাজে হাত দিলে ভ্রান্তি নিশ্চিতরূপে বিভ্রান্তিতে পরিণত হবে।''[৯৯]

কমিটির গৃহীত সুপারিশসমূহ তিনজন সদস্যের বিরোধী মন্তব্যসহ রেজিষ্ট্রারের কাজে প্রেরিত হয় (২২৩. ৬৮)। ৪ মে রিপোর্টটি শিক্ষা-পর্ষদে পেশ করা হয়। ৩ আগষ্ট সম্পূর্ণ বিষয়টি শিক্ষা-পর্ষদের বৈঠকে আলোচনাকালে উপস্থিত পন্নাশজন সদস্যের মধ্যে দু'জন সদস্য এর বিরোধীতা করেন। অতঃপর সামান্য পরিবর্তন শেষে প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। এবং উক্ত বৈঠকেই এই সুপারিশসমুহ কার্যকর করার লক্ষ্যে শিক্ষা-পর্ষদ আরেকটি উপসংঘ/ কমিটি গঠন করে।[১০০] এই সুপারিশগুলো ছিল বাংলা একাডেমীরই অনুরূপ। কেবল এক্ষেত্রে 'ক্ষ' এর পরিবর্তে 'খ্য' গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।[১০১]

বাংলা ভাষা -লিপি বানান সংস্কারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে বুদ্ধিজীবি-সংস্কৃতিসেবীরা এর পক্ষে -বিপক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

একে সমর্থন করে ৫৮ জন বুদ্ধিজীবি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[১০২] তাঁদের বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''বাংলা ভাষা অবৈজ্ঞানিক, মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহারে অসুবিধা অনেক, সুতরাং দ্রুত শিক্ষা বিস্তার ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের জন্য এর সংস্কার আশু জরুরী।''[১০৩] এর সমর্থনে প্রকাশিত ২৫ জনের সাক্ষর সম্বলিত অপর একটি বিবৃতির শিরোনাম ছিল ''ভাষাকে আমরা জনগণের শিক্ষার উপযোগী সহজ সুন্দর ভাষারূপে দেখতে চাই।''[১০৪] উল্লেখ্য যে, কোন সংগঠন এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়নি।

অপরদিকে এই সংস্কার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ৪১ জন বুদ্ধিজীবি সংস্কৃতিসেবী ''বাংলা হরফের রদবদল বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে'' শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[১০৫] ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ), সংস্কৃতি সংসদ[১০৬], পূর্ব পাকিস্তান নীহারিকা সংসদ, ভৈরবের সাংস্কৃতিক পরিষদ প্রতিবাদ জানায়। রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশও এর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রস্তাবের সমালোচনা করে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১০৭]

১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হামদুর রহমান জাতীয় সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে আরবী হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ করেন।[১০৮]

বাংলা ভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-পর্ষদের উপর্যুক্ত প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়েই রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচারণা পুনরায় আরম্ভ হয়। ১৯৬৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খানের পুত্র ক্যাপ্টেন গওহর আইয়ুব প্রস্তাব করেন যে পাকিস্তানের সংহতির জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যথাক্রমে উর্দু ও বাংলা ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা দরকার। এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী ''দি পাকিস্তান অবজারভার'' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে বাঙালিদের উদ্দেশ্য তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। মার্চের ২ এবং ১৩ তারিখে প্রকাশিত অপর দুটো চিঠিতে বাংলা ও উর্দুর জন্য রোমান হরফ ব্যবহারের সুপারিশ করেন ঢাকার জনৈক প্রকৌশলী এ আর এম

Dhaka University Institutional Repository

ইনামুল হক। তার প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে বেশ কয়েকটি চিঠি ঐ সময় প্রকাশিত হয়।[১০৯]

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পুনর্বার জাতীয় ভাষা প্রতর্বনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য হিসেবে স্বভাবতই আগের মত অভিন্ন সংস্কৃতি, জাতীয় সংহতি রক্ষার কথা বলা হয়।[১১০] ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতা বাণীতে সুস্পষ্টভাবে এমর্মে তাঁর অভিপ্রায় তুলে ধরেন। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সমর্থকবৃন্দ উৎসাহিত হয়ে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানায়।[১১১]

অন্য দিকে পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ, ছাত্র-সংগঠন, বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতিসেবী সহ অপরাপর সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তাদের বক্তব্যের মূল নিযাম ছিল- জাতীয় ভাষা সৃষ্টির নামে আন্ঞলিক ভাষা-সংস্কৃতি তথা রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র-অপচেষ্টা জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দাবী জানান।[১১২]

এ সমস্ত প্রতিবাদের ফলে সরকারের জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ পুনরায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

২ .৩ সংগঠন,সম্মেলন

ক. নজরুল একাডেমী

১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও নজরুল একাডেমীর গঠনতন্ত্র প্রণীত হয় ১৯৬৭ সালের ২৭ আগষ্ট।[১১৩] অতঃপর ১৯৬৮ সালের ২৪ মে শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক আনুষ্ঠানিক ভাবে এর উদ্বোধন করেন।[১১৪]

এই সাংস্কৃতিক সংগঠনের লক্ষ্য ছিল প্রধানত তিনটিঃ প্রথমত, ''মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূত হিসাবে নজরুল ভুমিকাকে চির-জাগরুক রাখা''; দ্বিতীয়ত, ''পাকিস্তানী জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার সকল

Dhaka University Institutional Repository

উপাদানকে আত্মস্থ করা''; তৃতীয়ত, ''মুসলিম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির সংহতি ও বিকাশ সাধন করা''।[১১৫] এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল নজরুলের রচনা সমগ্র সংগ্রহ, সংকলন, গবেষণা, প্রকাশনা, অনুবাদ, নজরুল সঙ্গীত চর্চা-প্রশিক্ষণসহ একাডেমীর লক্ষ্য, কর্মকান্ডের সহায়ক অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ।[১১৬]

১৯৬৭ সালে নজরুল একাডেমী দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ একাডেমীর মুখপত্র ''নজরুল একাডেমী পত্রিকা'' প্রকাশের উদ্যোগ নেন।[১১৭] যাইহোক, নজরুলকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানীত্বের আবরণে বিকৃত খন্ডিত আকারে গ্রহণের মাধ্যমে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়, বাঙালি সত্ত্বার অপরিহার্য অংশ রবীন্দ্রনাথ তথা তাঁর রচনা-সঙ্গীতকে বর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়ে।[১১৮] এ লক্ষ্যে নানা রকম কর্ম প্রয়াস চালানো হলেও গণঅভ্যুত্থানের সময় এর কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[১১৯] পরবর্তীতে এর কার্যক্রম কেবল মাত্র সঙ্গীত শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে।[১২০] এবং তাঁর গানের জনপ্রিয়তা আগের মতই ছিল।

খ. ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী

১৯৬৭ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়, মূলত কামাল লোহানীর উদ্যোগে। সামরিক শাসন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১২১] সংগঠনটি মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার আলোকে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখত।[১২২] এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পল্টন ময়দানে ২১ - ২৩ ফেব্রুয়ারী তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গণসঙ্গীত, নাটক, নৃত্যনাট্য পরিবেশন করা হয়। ঢাকা ও এর বাইরে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সংগঠনটির গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান সে সময় প্রচন্ড আলোড়ন-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল।[১২৩] তথ্য প্রতিমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জন সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রতিবাদে ক্রান্তি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী

১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক-সাংবাদিক কমরেড সত্যেন সেন এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন।[১২৪] এর সাথে যুক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবুল ফজল, রণেশ দাশগুপ্ত, সুফিয়া কামাল, শহীদুল্লাহ কায়সার, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, সন্‌জীদা খাতুন, শেখ লুৎফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, জাহিদুর রহিম, অজিত রায়, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জিতেন ঘোষ, অনিমা সিংহ, আবদুল লতিফ, জ্ঞান চক্রবর্তী, পান্না কায়সার, জহীর রায়হান, সুখেন্দু চক্রবর্তী, গোলাম মোহাম্মদ ইদু প্রমুখ।[১২৫] কমিউনিষ্ট পার্টির সহায়তায় প্রগতিশীল আদর্শ-চেতনাশ্রয়ী সংগঠনটির কর্মকান্ড অচিরেই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, জনপ্রিয়তা লাভ করে। সামরিক শাসন বিরোধী গণ আন্দোলনে উদীচীর ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। বস্তুত, -- বাংলাদেশের গণসঙ্গীতে উদীচী তার শিকড় গেড়েছে, তার মূল প্রোথিত বাংলার মাটিতে- জনতার আর জন-দর্শনের গভীরে, অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় সে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।''[১২৬]

এই সময় পর্বে আরো কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যেমন- সৃজনী, উন্মেষ ইত্যাদি। সাহিত্য, নাটক, গণসঙ্গীত ছিল এদের কর্মকান্ডের ক্ষেত্র।[১২৭]

ঘ. বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সম্মেলন

১৯৬৮ সালের ১৮ - ২৪ অক্টোবর ৭ দিন ব্যাপী ''আমাদের সাহিত্য'' পর্যায়ে বাংলা একাডেমী একটি ব্যাপক সম্মেলনের আয়োজন করে। উল্লেখ্য আইয়ুব খানের শাসনের ১০ম বর্ষ পুর্তিকে ''উন্নয়ন দশক'' নামে আখ্যায়িত করে বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান-কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিরামহীনভাবে প্রচারণা চালানো হয়। যা'হোক, আলোচ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। ৭টি বিষয়ে আলোচনা পর্ব সীমাবদ্ধ রাখা হয়- কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য এবং সাময়িক পত্র।[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. মহাকবি স্মরণোৎসব এবং আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান

১৯৬৮ সালে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা মহাকবি স্মরণোৎসব (৫-৯ জুলাই) ও আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের (২০-২১ অক্টোবর) আয়োজন করে। উল্লেখ্য সরকারি পৃষ্টপোষকতায় সৃষ্ট লেখক সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম সকলের নিকট নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। ক্রমে এর পূর্বাঞ্চল শাখার সঙ্গে জড়িত হলো প্রধানত অসাম্প্রদায়িক, গণতন্ত্রকামী মধ্যবিত্তশ্রেণীর তরুণ প্রজন্ম। স্বভাবতই সংঘের কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন আসে।[১২৯]

বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের খ্যাতিমান ৫ জন কবি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মহাকবি স্মরণোৎসব। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক আবুল হাশিম বলেন, ''সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক বস্তু নয়। সাহিত্য এক শিল্প। যে কোন শিল্পকেই যে কোন আদর্শের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব।''[১৩০] তিনি আরো বলেন, ''যাহারা ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের ওকালতী করিতেছেন, তাঁহারা শুধুই মূর্খ নহেন, দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিতও। তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম। তাঁহারা একটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্র-বিরোধীতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।''[১৩১]

নজরুল দিবসের মধ্যদিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। শেষোক্ত দিনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল কাদির। তিনি বলেন, ''নজরুল ছিলেন নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামী কবি। বাংলা সাহিত্যে তিনি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রথব প্রবক্তা।''[১৩২]

মহাকবি স্মরনোৎসব অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়। প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা, গান, নাটক, নৃত্যনাট্য উপস্হাপনের মাধ্যমে এটি ঢাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে যথেষ্ট পরিমানে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। অনুষ্ঠানের এই সাফল্য স্বভাবই পাকিস্তানী, প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রোধসন্ঞার করে।[১৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বাঞ্চল লেখক সংঘের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল 'আফ্রো-এশিয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। পঠিত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, এই দুই মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক শোষণ মুক্তির সাধনাই এশিয়া-আফ্রিকার সাহিত্যে প্রধানত বিষয়রূপে বিবৃত হয়েছে। এছাড়াও দুই মহাদেশের কবিদের অনুদিত কবিতার পাঠ, চীনা অপেরার বাংলা রূপান্তর মঞ্চস্থসহ ''অপরাজেয় ভিয়েতনাম'' শীর্ষক গণসঙ্গীতের আয়োজন ছিল এই অনুষ্ঠানে।[১৩৪]

লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপবাদ মোচন করে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়।[১৩৫] এ প্রসঙ্গে ডঃ মুরশিদ লিখেছেন, ''দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই অসম্ভব ভিড় হয়। সাহিত্য সভায় এরূপ জনসমাগম সে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নত মানকেই নির্দেশ করে। কিন্তু, পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ হওয়া উচিত। জনগণের এই সাহিত্য এবং সঙ্গীতপ্রীতি বোধহয় তাদের প্রতিবাদী মনোভাবেরই পরিচায়ক।''[১৩৬]

২ .৪ নাটক ও গণসঙ্গীত

ক. নাটক

১৯৬৬-৬৯ সময়পর্বে মঞ্চস্থ নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাঙালী নাট্যকারদের নাটকই বেশী মঞ্চস্থ হচ্ছে। শুধু মঞ্চে নয়, টেলিভিশনে প্রচারিত নাটকও সকলের মধ্যে প্রভাব ফেলে। এ সময় মঞ্চস্থ অধিকাংশ নাটকগুলিই ছিল সামাজিক। সে সঙ্গে এসময় নাট্যচর্চায় অন্য একটি ধারা লক্ষ্যনীয়, যেসব নাটকের স্বর প্রতিবাদী বা মানুষের কথা এসেছে সেগুলি মঞ্চস্থ হচ্ছে বারে বারে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন মানুষকে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। ফলে যেসব নাটকে প্রতিবাদী সুর দেখা যেত তার সঙ্গে মানুষ একাত্মতা অনুভব করছে। বস্তুত, পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও পূর্ব পাকিস্তানের মানবতাবাদী গণতন্ত্রকামী বাঙালির ''সংঘর্ষ দেশকালে যেমন সুস্পষ্ট ; তেমনি নাট্যচর্চা তথা নাটকের ধারায় এই চেতনা ক্ষীণ হলেও অনুপস্থিত নয়। ---৬৯-এর প্রবল গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু গণমুখী নাটক মঞ্চায়িত হয়। জীবন-ঘনিষ্ঠ বিরায়ত কিছু নাটকও এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

মন্বন্তর হয়।''[১৩৭] সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী ম্যাক্সিম গোষ্ঠীর 'মা'-এর একাধিকবার মন্বন্তরূপ দেয়। এর অপর দুটি মন্বন্তরূপ হচ্ছে গোর্কীর 'বিপ্লবের টুকরো ছবি' ও জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন'। এ সময় মন্বন্তর অপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল। 'আলোর পথযাত্রী'[১৩৮] 'স্বপ্ন ভঙ্গ', 'মানচিত্র', 'অনুবর্তন' 'কালিন্দী', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'দায়ী কে' প্রভৃতি (দেখুন পরিশিষ্ট)।

এ সময়পর্বে সফলভাবে নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পত্র-পত্রিকা, শিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্তশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে ঢাকায় স্থায়ী রঙ্গবন্ধ প্রতিষ্ঠার দাবিও জানানো হয়।[১৩৯]

খ. গণসঙ্গীত

আলোচ্য সময়ে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনকে উজ্জিবিত করে গণসঙ্গীত। আগে উল্লেখ করেছি, পন্বাশ দশকে যাঁরা ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, ঢাকায় পন্বাশ দশকে তাঁরা গণসঙ্গীতের চর্চা শুরু করেন। সে চর্চা বিকশিত হয়ে ওঠে আলোচ্য কালপর্বে।

এই সময় বাংলাদেশের কবিরা গণসঙ্গীত লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের গান যা আগে সাধারণভাবে গীত হতো তার কিছু কিছু কোরসে বিভিন্ন সভা-জমায়েতে গাওয়া হতো। এগুলি গণসঙ্গীতে পরিণত হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা', 'স্বার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের, 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা', কাজি নজরুলের, 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'দুর্গম গিড়ি কান্তার মরু' ইত্যাদি। এমনকি চল্লিশ দশকে গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের গাওয়া সলিল চৌধুরী ও ভুপেন হাজারিকার লেখা ও সুরারোপিত, গাওয়া অনেক গান গাওয়া হতে থাকে।

এ সময় গণসঙ্গীত আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, পাশ্চাত্যে গীত অনেক গানের অনুবাদে। ষাটের দশক ছিল আন্দোলনের দশক। ঐ সময়, ইউরোপ জুড়ে চলছে ছাত্র আন্দোলন, সারা বিশ্বে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও ভিয়েতনাম বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

লেখা হচ্ছিল সব যুদ্ধ বিরোধী বা শান্তির পক্ষের গান। ছাত্র ইউনিয়ন প্রভাবান্বিত সংস্কৃতি সংসদ, সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠিত উদীচী এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে জোন বেজের গাওয়া 'উই শ্যাল ওভারকাম' -এর বাংলা ভাষ্যটি ইংরেজি সুরেই গাওয়া হতো। গাওয়া হতো 'ইন্টারন্যাশনাল' -এর বাংলা ভাষ্য। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত দেশগুলোর জনগণের সঙ্গে একতা, সহমর্মিতাসূচক বহু গণসঙ্গীতও রচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'অপরাজেয় ভিয়েতনাম' শীর্ষক চৌদ্দটি গণসঙ্গীত এ সময় প্রচন্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সময়পর্বে উল্লেখযোগ্য আরো কিছু গণসঙ্গীত হল-

সিকান্দার আবু জাফর রচিত (কবিতা), শেখ লুৎফর রহমান সুরারোপিত ও গীত ''জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবেই'' গণসঙ্গীতটি ১৯৬৬ সালে সংস্কৃতি সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণের খোলা মঞ্চে গাওয়া হয়।[১৪০] মরণজয়ী এই গানটি মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত অন্যতম প্রধান গণসঙ্গীতে পরিণত হয়।[১৪১] এ সময়কার আরেকটি জনপ্রিয় গান হল ''চলছে মিছিল, চলবে মিছিল।''[১৪২]

রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ক্ষুব্ধ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিরা ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আয়োজন করে একটি সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের। এতে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গণসঙ্গীত গাওয়া হয়। আনুমানিক দশহাজার দর্শক-শ্রোতার সমাবেশ ঘটে এই অনুষ্ঠানে। এভাবে বাঙালির প্রতিবাদী চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।[১৪৩]

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন সম্বলিত ৬-দফা দাবী ঘোষিত হয়। এটি ছিল মূলত সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশস্বরূপ। রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপকতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই যেন এ সময় থেকে ক্রমে গণসঙ্গীতের রচনা-গায়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৪৪] এ সময়কার একটি বিখ্যাত গান হল

''ডিম পাড়ে হাসে খায় বাঘডাসে
শুনছনি ভাই শুনছনি

Dhaka University Institutional Repository

বুঝছনি ভাই বুঝছনি
আসল কথা বুঝছনি ?''[১৪৫]

১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে পুনরায় সাংস্কৃতিক কর্মী, ক্রান্তি, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, সংস্কৃতি সংসদসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় ক্রান্তির গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠানগুলো আগ্রহের সৃষ্টি করে।[১৪৬] ছায়ানটের উদ্যোগে জাহিদুর রহিম প্রমুখ মিলে বিভিন্ন সণসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গণমুখী গান গাইতেন। ক্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীত ''জনমুক্তির রাজনীতিতে এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়।''[১৪৭] এ সময় পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সংঘ কর্তৃক পল্টন ময়দানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গাওয়া বিখ্যাত গান ''আমরা স্পার্টাকাসেরও ভাই'' জনমনে প্রবল সাড়া জাগায়।[১৪৮] ১৯৬৮ সালেই লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা আয়োজিত আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে ''অপরাজেয় ভিয়েতনাম'' শীর্ষক ১৪ টি গণসঙ্গীত গাওয়া হয়। খুলনার ''সন্দীপন'' গোষ্ঠী পরিবেশিত গানগুলো নিবেদিত হয় এশিয়া-আফ্রিকার বিশেষত ভিয়েতনামের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তিকামী জনগণের উদ্দেশ্যে।[১৪৯] এসব গান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার ইঙ্গিতবাহী ছিল।[১৫০] এই গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - 'দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও একটি নাম/ মুক্তি পাগল রক্তস্নাত-ভিয়েতনাম', 'কমরেড, এই রাত আঁধিয়ার', 'গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল চৌকিদার', 'আকাশের সে কপোত/ আর ডানা পত পত করেনা', 'ধ্বংসের পরোয়ানা শোনো কি/ সায়গন হাইফং আকাশে,' 'শান্তি না সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম' (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট)। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশে আমাদের গণসঙ্গীতের চর্চা যেন তার আপন ঠিকানা খুজে পায়।[১৫১]

এভাবে সময় ক্রমে ১৯৬৯ -এর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। গণআন্দোলন পরিণত হয় তীব্র গণ অভ্যুত্থানে। ''গণ-আন্দোলনের দাবীতে পরিকল্পিতভাবেই সংগঠিত হয়েছিল সৃজনী, উন্মেষ।''[১৫২] প্রচুর গণসঙ্গীত রচিত হতে থাকে। এ সময় দেশময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুটি গান হল ''বাংলার কমরেড বন্ধু /এই বার তুলে নাও হাতিয়ার'' এবং ''আসাদ জোহা শত শহীদের রক্তনিশান দেখেছি/ তাইতো মোরা

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছু ভুলে এক মিছিলে মিলেছি।'' এছাড়াও আবু বকর সিদ্দিকের ''বিপ্লবের রক্তে রাঙা ঝান্ডা ওঠে আকাশে /সর্বহারা জনতার জিন্দাবাদ বাতাসে,'' ''ব্যারিকেড বেয়োনেট বেড়াজাল'', ''মার্কিনী লাল ইয়াংকিরা চায় কি হে রক্ত'',[১৫৩] ''পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে'', প্রভৃতি গান এ সময় প্রচন্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১৫৪] আবুবকর সিদ্দিক এ সময় প্রায় দু'শত গান রচনা করেন।[১৫৫] গণসঙ্গীতের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে তখন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলিত। বিভিন্ন স্থানে নিরলসভাবে গণসঙ্গীতের আয়োজন করে সাংস্কৃতিককর্মীরা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে চলেছেন।[১৫৬]

''বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা/ আজ জেগেছে সেই জনতা'', ''জাগো জাগো জাগোরে বাঙালি ভাই/ আর কতকাল থাকবি ঘুমে/ দেখরে চেয়ে নিশি নাই/ তোরই ঘরের সোনাদানা লুইটা নিল অন্য ভাই'', নজরুলের বিভিন্ন সংগ্রামী গান যেমন ''কারার ঐ লৌহ কপাট'', ''মোরা ঝন্ঝার মত উদ্দাম'', ''তোরা সব জয়ধ্বনি কর'', সুকান্তের ''অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভুমি,'', আব্দুল লতিফের ''রফিক শফিক বরকত নামে/ বাংলা মায়ের দুরন্ত কটি ছেলে স্বদেশের মাটি রঙীন করেছে/ আপন বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে'', ''ও আমার এই বাংলা ভাষা/ এ আমার দুখ ভুলানো বুক জুড়ানো/ লক্ষ মনের লক্ষ আশা''। এমনি সব বাণী-সুরে প্রাণস্পর্শী গানে সমগ্র বাঙালি উন্মাতাল।[১৫৭] এসবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল ''জনতার সংগ্রাম চলবেই''।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর পর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিরাজমান স্থবিরতা কাটাতে প্রথমে এগিয়ে আসেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। এই সময় একুশে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে হলেও গণসঙ্গীত চর্চা টিকিয়ে রাখেন তাঁরা। সরকারি দমন তৎপরতা সত্ত্বেও '৬১-তে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাফল্য ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করে তোলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে। তীব্র ছাত্র আন্দোলনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান রাজনৈতিক দলগুলোর পুনরুজ্জীবনে বাধ্য হলেন। ক্রমে বাঙালি স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে সোচ্চার হতে থাকে। এ সময় অন্যান্য রাজনৈতিক দল-নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের নেতায় পরিণত হন। তাঁর প্রণীত ৬-দফা দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। যা অবশেষে রূপ নেয় ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আমরা দেখছি সামরিক শাসন থাকাকালীন বা এর অবসান- সব সময়ই সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে গান, নাটক প্রভৃতি কর্মোদ্যোগের দ্বারা মানুষকে লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন। এ সময় সাংস্কৃতিক সংগ্রামে দুটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে- প্রতিক্রিয়াশীল যারা পাকিস্তানী আদর্শের সমর্থক আর অন্য ধারাটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, গণতন্ত্রকামী। শেষোক্ত ধারাটিই ক্রমে দৃঢ়, শক্তিশালী হয়ে অবশেষে জয়লাভ করে।[১৫৮] কারণ, অনেকক্ষেত্রে রাজনীতিবিদেরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলেও প্রগতিশীল আদর্শের অনুসারী সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনরূপ দো'টানায় ভুগেননি। স্বভাবতই রক্ষণশীল, পাকিস্তানপন্থীরা বিশেষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। এটিই হচ্ছে এই সময়পর্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. মাহেনও, মার্চ, ১৯৬৭, উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১০৩।

২. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৬।

৩. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৪১। মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩।
এছাড়াও আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের জন্য দেখুন, Shyamali Ghosh, *The Awami League*, Dhaka, 1990. এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পাকিস্তানী লেখকদের কিছু প্রবন্ধে। দেখুন, হাসান গারদেজি ও জামিল রশিদ (সম্পাদিত), *পাকিস্তান ঃ ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৮৬। পাকিস্তানের এক সময়ের নীতি নির্ধারকরাও মূলত একই কথা বলেছেন। দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *সেইসব পাকিস্তানী*, ঢাকা, ১৯৯৯।

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান, 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী', *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ২৯-৩০।
হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ঃ দলিল পত্র*, ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২ পৃঃ ২৬০-২৬৯।

৫. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৩।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৭।

৭. আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ*, ১৯৫৩-'৯৩, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১১১।

৮. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪২।

৯. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১০।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৯৩-১৯৭।

১১. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫।

১২. ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. দেখুন আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫১-১৫২।

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫১।

১৫. ১৯৬৬ সালের ২ মে প্রতিষ্ঠাকালে এর গঠনতন্ত্র বা সাংগঠনিক কাঠামো, কমিটি সম্পর্কিত কিছুই নির্ধারণ করা হয়নি। ৬-দফা বিরোধী দলগুলোর চাপে অবশেষে ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে নিখিল পাকিস্তান পি ডি এম গঠনের কথা ঘোষিত হয়। এতে শামিল দলগুলো ছিল - এন ডি এফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়েতে ইসলাম, নিজাম-ই-ইসলাম, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৬। পি ডি এম -এর ঘোষনাপত্র, সাংগঠনিক কাঠামো, ৮-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৪-২৯২।

১৬. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১১।

১৭. *ঐ*, পৃঃ ১১১।

১৮. *ঐ*, পৃঃ ১২০।

১৯. *ঐ*, পৃঃ ১২৫।

২০. গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫০। এছাড়া ও দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩

২১. দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫১।

২২. সরকারি প্রেসনোট অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ১১ জন। যদি জনসাধারণ্যে প্রচলিত গুজব অনুযায়ী এ সংখ্যা ছিল ৩০ জন। দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৪।
সরকারি প্রেস নোট সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭০।

২৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫২।
৭ জুনের হরতাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫২-১৫৩। আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩-১১৪।

২৪. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৫।

২৫. *ঐ*, পৃঃ ১১২।

২৬. *ঐ*, পৃঃ ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. *ঐ*, পৃঃ ১১৭।

২৮. আবু আল সাইদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৬।

২৯. *ঐ*, পৃঃ ১৫৩।

চাকুরী, ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকরাও নানাভাবে হয়রানীর সম্মুখীন হতেন। তাদের পরিবারের সদস্যরাও এই আওতার বাইরে ছিলেন না। যেমন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিক আমেনা বেগম কর্তৃক ৬-দফার স্বপক্ষে প্রচারণার অপরাধে তার স্বামীকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। স্ত্রীকে একাজ হতে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৬। আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৮।

৩০. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০০।

৩১. ১১ দফা দাবী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০২ - ২০৪। ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৯-১৬০।

৩২. ২০-২৪ তারিখের আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মোহাম্মদ ফরহাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৮-৫৩।

৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ডঃ মোহাম্মদ হাননান, পৃঃ ১৬৪-১৬৫, পাদটীকা, ২৪৪। এছাড়াও দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৩, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭১।

৩৪. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭১।

৩৫. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৪।

৩৬. ৮ টি বিরোধী দলের সমন্বয়ে 'ডাক' গঠিত হয়। দলগুলো ছিল- এন ডি এফ, জামায়েতে ইসলামী, নিজাম-ই-ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নসরুল্লাহ খান), আওয়ামী লীগ (৬-দফা পন্থী), ন্যাপ (ওয়ালী), জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত পাঁচটি দল ছিল পি ডি এম ভুক্ত। ন্যাপ (ভাসানী) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি এতে যোগদান করেনি। এছাড়াও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭০-১৭১। ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০০-২০১ মোহাম্মদ ফরহাদ, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৪-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. ১৪ জানুয়ারী ১৯৬৯-এ ছাত্রদের ১১-দফা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হলেও ৫ জানুয়ারী লেকেই মূলত এর প্রচারণা শুরু হয়ে গেছিল। দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭০।

৩৮. ডাক ৮- দফা দাবী সম্বলিত কর্মসূচী ঘোষণা করে। এখানে উল্লেখ্য, আবু আল সাঈদের গ্রন্থে তিনি এই দাবীর সংখ্যা ৫ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, এই সংখ্যা ছিল ৮। এই ৮ -দফা দাবী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০০-৪০১, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩১-১৩২

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ৫ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে ঃ

> "১. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ;
>
> ২. ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠা ;
>
> ৩. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ;
>
> ৪. জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন ;
>
> ৫. এক- ইউনিটের বিলোপ ।"

দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৯

৩৯. "মাত্র কিছু দিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন নেতা নির্বাচনের পক্ষে এবং এমন কি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী দাঁড় করানো সম্পর্কেও কথাবার্তা বলছিলেন। --- কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই পরিস্থিতি বদল হয়ে গিয়েছিল। কাসুরী উদ্যোগী হয়ে ন্যাপের সভায় "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" প্রত্যাহারের দাবীতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ থেকেও এ-রকম সরাসরি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। কাসুরী উপযাজক হয়ে শেখ মুজিবের এ্যাডভোকেট নিযুক্ত হন এবং শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেন। অথচ কাসুরী আসলে চরমভাবে ৬- দফা বিরোধী ছিলেন।

এটা বুঝতে কষ্ট হয়না যে, কিছু একটা উপরতলা থেকে ঘটছিল, যারজন্য বয়কটের পক্ষে দক্ষিণপন্থীরা এত ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল এবং শেখ মুজিবের সঙ্গেও সমঝোতা চাচ্ছিল।"

দেখুন, মোহাম্মদ ফরহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০-৪১।

৪১. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২।

৪২. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৬।

৪৩. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৫।
সরকার দলীয় সদস্যদের মধ্যে অনৈক্য সম্পর্কে দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৭।

৪৪. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯।

৪৫. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭৩।
এখানে উল্লেখ্য, ডঃ শামসুজ্জোহার হত্যাকান্ডের তারিখ আবু আল সাইদ ১৭ ফেব্রুয়ারী বলে উল্লেখ করলেও অন্যান্য বইতে এই তারিখ ১৮ তারিখ বলে উল্লেখিত হয়েছে। দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০ ; ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৫।

৪৬. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৫-২০৬।

৪৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫০-১৫১ ; ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৬; মোহাম্মদ ফরহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৫।

৪৮. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫১।

৪৯. ১৪ ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় ছাত্ররা শেখ মুজিবের মুক্তি সহ ১১-দফার দাবীতে শ্লোগান দিতে থাকে। জনসভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ যেমন- নরুল আমীন সহ পি ডি এস-এর কাউকেই ছাত্ররা বক্তৃতা দিতে দেয়নি। উপরন্তু মনি সিং -এর মুক্তি দাবী সম্বলিত ব্যানারের ওপর জামায়াত কর্মীদের ''লা-ইলাহা ইল্লালাহ'' ব্যানার লাগাতে বাধা দেয়া হয়। এর পর থেকেই জামায়াতে ইসলাম ১১ দফা, প্রগতি, বিরোধী প্রচরণা শুরু করে। এবং এলক্ষ্যে ''ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ'' গঠিত হয়। দেখুন, মোহাম্মদ ফরহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৫।

৫০. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৬।

৫১. *ঐ*, পৃঃ ২০৬।

৫২. ''শেখ মুজিবের বক্তৃতার মূল কথাটা ছিলো সার্বজনীন বয়স্ক ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার ভিত্তিতে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানে এক-ইউনিট ভেঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে সাবেক প্রদেশসমূহ প্রদেশিক স্বায়ত্বশাসনসহ যার ফেডারেশন গঠন। তিনি ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি সমর্থন জানালেন এবং বললেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফার অন্তর্ভুক্ত।'' দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৭।

৫৩. কাউন্সিল অধিবেশনে (১৮-১৯ মার্চ, ১৯৯৬) ৬-দফা অনুমোদন লাভের পর ২০ মার্চ পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ৬-দফার রূপরেখা বর্ণনা করে শেখ মুজিব বলেন, ''৬-দফা নতুন কিছু নয়। স্বায়ত্বশাসনের দাবি আমরা জানিয়ে আসছি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। প্রদেশের জন্য অধিকতর ক্ষমতা কেন্দ্রকে দূর্বল করে ফেলবে, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরাই আসলে পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনা করছেন। পাকিস্তান সেদিনই উন্নত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যেদিন উভয় অংশ সমান শক্তিশালী এবং উন্নত হবে। --- আমরা সব দিক দিয়েই অরক্ষিত। আমাদের কাঁচামালের মূল্য সম্পর্কে আমরা জানিনা। পাটচাষীরা তাদের পাটের নায্যমূল্য পায়না।

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে কি আয় হচ্ছে, আমরা সঠিকভাবে সেটাও জানিনা। আমরা এমন বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে পাকিস্তানের উন্নতি বলতে বোঝায় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতি বলতে বোঝায় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতি নয়। আমাদের ভাষার ওপর কেনো হামলা হয়েছিলেন বাঙালি জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য। বর্তমানে বাংলা ভাষা উর্দু হরফে কিংবা আরবি হরফে লেখার ষড়যন্ত্র হচ্ছে কেনো তাও আমরা জানি। --- ভাবতে চেষ্টা করুন বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে আমরা কেমন ছিলাম, আমরা পুরোপুরি অরক্ষিত এবং অসহায় ছিলাম। --- আমি নিশ্চিত ৬-দফা বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রণের দাবি হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। --- আপনাদের কাছে আকুল আবেদন। আপনারা ৬-দফার কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। বাঙালি আজ সচেতন জাতি। মার খেয়ে খেয়ে ধারালো হয়ে উঠেছে --- আন্দোলন চায় ---৬-দফার আন্দোলনই এখন থেকে বাঙালির একমাত্র আন্দোলন।'' দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

৫৪.শেখ মুজিবুর রহমান, 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩-৩৪।

এখানে উল্লেখ্য, ১ম গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা প্রথমে ২৫ জন এবং পরবর্তীতে এসঙ্গে আরো ১০ জন সদস্য যুক্ত হন বলে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেখুন, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৫৮', *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* ১৯৪৭-১৯৭১ ঢাকা, ১৯৯৭,পৃঃ ৪৬।

৫৫. ভাসানীর ১৪ দফা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯৪-১৯৫।

৫৬. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪২। এছাড়াও দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫১।

৫৭. ন্যাপ (ভাসানী)-এর মতো ইসলামী সমাজতন্ত্র ছিলো দলটির মূল আদর্শ। দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬১।

৫৮. *ঐ*, পৃঃ ১৪৭।

৫৯. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫০।

তিন দফা চুক্তি সমূহের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৮।

৬০. আওয়ামী লীগের নেতা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে কয়েকজন সদস্য পি ডি এম -এ যোগ দেয়। এর ফলে দলটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ৬- দফা পন্থীরা এক অংশে পি ডি এম পন্থীরা অপর অংশে সমবেত হন। দেখুন, ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ১৯৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ১৫০ আরো দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২১-১২২।

৬১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড পৃঃ ২৯৮-৩৬৩।

৬২. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫২।

৬৩. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭।

এছাড়াও বিস্তারিত বিবরণের জনা দেখুন ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪৮-১৪৯। সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৫-৯৭।

৬৪. মোহাম্মদ ফরহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।

৬৫. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০।

৬৬. অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধু* , মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. অধ্যাপক জন ই ওয়েন, উদ্ধৃত ডঃ রঙ্গলাল সেন, 'ষাটের দশকে বাংলাদেশে ও বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,' *গৌরবের চল্লিশ বছর* ১৯৫২-৯২, ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১০১।

৬৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, *বাংলা অনুঞ্চলের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৪।

৬৯. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা, পৃঃ ৩৬।

৭০. আবদুল হালিম, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ঃ ১৯৬৬-১৯৬৯', *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৩।

৭১. ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, লোক বক্তৃতামালা, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, শেষ মলাট দ্রষ্টব্য।

৭২. ওয়াহিদুল হক, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতঃ পূর্বধারা', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৩১।

৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩১।

৭৪. এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদানকারীরা হলেন, ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, এম এ বারী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সারওয়ার মুরশিদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, ডঃ আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রাহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শহীদুল্লাহ কায়সার। দেখুন। *বাংলদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খন্ড*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ ২৮১। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬। এছাড়াও দেখুন, রফিকুল ইসলাম, 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', *বাঙলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ২৯১।

৭৫. *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮১। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬। রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯১।

৭৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গঃ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ২৩৬-২৪৬। রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৭৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮২।

৭৮. দৈনিক পাকিস্তান, ২৭. ৬. ১৯৬৭। সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৬৭।

৭৯. বিবৃতি প্রদানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন শিক্ষক হলেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (অধ্যক্ষ, ইংরেজি বিভাগ), কে এম এ মুনিম (সিনিয়র লেকচারার, ইংরেজি বিভাগ), মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন (অধিকর্তা, আইন অনুষদ), মোহাম্মদ মোহর আলী (রিডার, ইতিহাস বিভাগ), এ এফ এম আবদুর রহমান (রিডার, গণিত বিভাগ)। দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭। রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯২।

৮০. অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বিচারপতি আবদুল মওদুদ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, ডঃ হাসান জামান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, কবি বেনজীর আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আ কা মু আদমউদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ ন ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নুরী, আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম (শিল্পী) মুফখখারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গণি, মফিজউদ্দিন আহমেদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, জহিরুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নুরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, মাফরুহা চৌধুরী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ ও আখতার উল আলম।

দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭-২৮। রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯২-২৯৩।

৮১. আবুল কাশেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭। এ ছাড়াও দেখুন, আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৪।

৮২. দৈনিক আজাদ, ১. ৭. ১৯৬৭।

৮৩. পয়তাল্লিশজন সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে মুন্সী রইসউদ্দীন, আবদুল লতিফ, আবদুল আলীম, ধীর আলি মিয়া, ফওজিয়া খান, নীনা হামিদ, আঞ্জুমান আরা বেগম, শাহনাজ বেগম, ইসমত আরা, খাদেম হোসেন খান, আবিদ হোসেন খান,

Dhaka University Institutional Repository

ফুলঝুরি খান, মীর কাশেম খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এই সঙ্গীত শিল্পী ও তাঁদের প্রদত্ত বিবৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯৩-২৯৪।

৮৪. সংবাদপত্রগুলি ছিল- দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান, মর্ণিং নিউজ, দৈনিক পয়গাম।

দেখুন, সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭। এছাড়াও দেখুন, আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৪।

৮৫. দৈনিক আজাদ, ১. ৭. ১৯৬৭। উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *প্রগুক্ত*, পৃঃ ১০৬।

৮৬. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৬।

৮৭. দি পাকিস্তান অবজারভার, ৩. ৭. ১৯৬৭, উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৭।

৮৮. সাক্ষাৎকার ঃ বেগম সুফিয়া কামাল, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

৮৯. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৭।

৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ১০৭। এছাড়াও দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮।

৯১. সাক্ষাৎকার ঃ কামাল লোহানী, *মুক্তিযুদ্ধের গান*, গবেষণা, গ্রন্থণা ও পরিচালনা শাহরিয়ার কবির।

৯২. ওয়াহিদুল হক, 'রবীন্দ্র সঙ্গীত ঃ পূর্বধারা', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৯ ও ৩৪৩।

৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৮।

৯৪. ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

৯৫. ঐ, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ পূর্বধারা', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৫।

৯৬. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

৯৭. এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ফিরদৌস খান (প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক), মুহম্মদ আবদুল হাই (অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (অধ্যক্ষ, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)মোহাম্মদ ওসমান গণি (অধ্যক্ষ, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ), আবুল কাসেম (অধ্যক্ষ, বাংলা কলেজ), মুনীর চৌধুরী (রিডার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (প্রাক্তণ), মুহম্মদ এনামুল হক (পরিচালক, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ণ বোর্ড), তফাজ্জল হোসেন (অধ্যক্ষ, চৌমুহনী কলেজ)। দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৩৪০। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৭৬৭-৭৭২। এছাড়া দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

৯৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

৯৯. উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৯।

১০০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৮-৩৬৯।

১০১. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৯।

১০২. তাঁরা হলেন- ইব্রাহিম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমেদ, মুজিবুর রহমান খাঁ, আতাউর রহমান খান, মোহম্মদ মোদাব্বের, গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, ডঃ ইন্নাস আলী, আবুল কাশেম, আবুল হাসনাত, তালিম হোসেন, মোহাম্মদ নাসির আলী, আজিজুর রহমান, ডঃ মোহর আলী, আবদুল হক ফরিদী, শাহ ফজলুর রহমান, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ আদমুদ্দীন, মুফাখখারুল ইসলাম, মফিজুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, মীর ফখরুজ্জামান, মীর আবুল হোসেন, জাহানারা আরজু, আখতারুল আলম, মওলানা ফজলুল করিম, আবদুর রহমান, মোহসেনউদ্দীন আহমদ,ডঃ আজিজুল হক, বাঙ্গাল আবু সাঈদ, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, জোবেদা খানম, মোস্তফা কামাল, আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী, অধ্যাপক হেদায়তুল ইসলাম খান, মহিউদ্দীন খান, এম এ এল শহীদুল্লাহ, আনিসুল হক চৌধুরী, ডঃ শামসুল ইসলাম, রশিদ আহমদ, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, আনোয়ারুল হক খান মজলিস, শেখ লুতফর রহমান, মোহাম্মদ সিদ্দিক খান, বেদার উদ্দীন আহমদ, কানুতোষ মজুমদার, এম এ হাসান, এস এন মোস্তফা, মোহাম্মদ নুরুন্নবী, লুৎফুন্নেসা খাতুন, মিয়া আবদুর গফুর, অধ্যাপক আবদুর রহমান, এম এ লতিফ, আইউব আলী, শামসুল আলম সি এস পি, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, আখতারুজ্জামান ও ইকবাল হোসেন। দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪২-৩৪৩।

১০৩. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৯।

১০৪. দৈনিক পয়গাম, ২৭. ৮. ১৯৬৮, উদ্ধৃত সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৯। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন- ২৫ জন ছিলেন- অধ্যাপক আবদুল গফুর, সৈয়দ,

Dhaka University Institutional Repository

আলী আশরাফ, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, হেদায়েতউল্লাহ খান, কাজী আবদুল ওহাব, এইচ এম সাদত আলী, এম এ লতিফ খান মজলিস, এস এ হাসান, শাহ মোঃ শরীফ, মতিউর রহমান, শামসুল হক সিদ্দিকী, এ এস মতিউল মান্নান, কামরুন্নিসা, এডভোকেট হাসেম খান, এস এম আবদুল লতিফ, মোখতার হোসেন, শাহাদাত হোসেন, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, ডঃ আবুল হাসেম চৌধুরী, অধ্যাপক তাহের উদ্দীন, অধ্যাপক আইউব আলী,পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, কায়েদে আযম কলেজ, মোঃ আবদুর রহমান, দেখুন- রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪২-৩৪৩।

১০৫. বিবৃতিপ্রদানকারী ৪১ জন বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতিসেবীর মধ্যে ছিলেন- কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাশিম, বেগম সুফিয়া কামাল, জহুর হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, আবদুল গণি হাজারী, শহীদুল্লাহ কায়সার, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, জহির রায়হান, আতাউস সামাদ, সৈয়দ মর্তুজা আলী, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, কে. জি মোস্তফা, শামসুর রাহমান, ওয়াহিদুল হক, শওকত আলী, লায়লা সামাদ, সানাউল্লাহ নুরী, আলী আকসাদ, মোহাম্মদ সালেহউদ্দীন, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, ফয়েজ আহমদ, রোকনুজ্জামান খান, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, নুরজাহান বেগম, খালেদ চৌধুরী, কালাম মাহমুদ, আনোয়ার জাহিদ, আবদুল আউয়াল, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৩।

১০৬. সংস্কৃতি সংসদের 'বাংলা ভাষার বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত' নামক প্রচার পত্রে বলা হয় ''গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলত বাঙালী স্বাতন্ত্র্যবোধ তথা বাঙালী সাংস্কৃতির যে জাগরণ আজ সর্বত্র দেখা দিয়েছে সেই জাগরণকে স্তিমিত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।'' এতে বাংলা ভাষার ওপর এই আঘাত প্রতিহত করার লক্ষ্যে ৩. ৯. ১৯৬৮ মধুর রেস্তোরাঁ প্রাঙ্গনে সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত সাধারণ ছাত্র সভায় সকলকে যোগাযোগের জন্য আহবান জানান হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৭২।

১০৭. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৯।

১০৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃঃ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. সাঈদ-উর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯-১১০।

১১০. আত্মজীবনীতে আইয়ুব খান লিখেছেন, "It is quite clear to me that with two national languages we cannot become a one-nation state; we shall continue to remain a multi-nation state. I am not necessarily arguing against this; I am just stating a fact of life which has to be recognized. For it is the case that one language cannot be imposed on the whole country; neither Bengali nor Urdu can become the language of the whole of Pakistan. It is equally true that if the people - both in East and West Pakistan want to develop cohesion they must have a medium to communicate with each other. And this medium must be a national medium. To evlove such a medium we have to identify common elements in Bengali and Urdu and allow them to grow together through a common script."

Mohamad Ayub Khan, *Friends not Masters,* Karachi, 1967, P. 102.

১১১. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১০।

১১২. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১১।

১১৩. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০৩।

১১৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫৪।

১১৫. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০৩।

১১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫৬-১৫৭।

১১৭. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬৩।

১১৮. ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

১১৯. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০৪।

১২০. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬৪।

১২১. দেখুন, মুক্তিযুদ্ধের গান, প্রাগুক্ত, ।

১২২. কামাল লোহানী, *প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট,* সমাজ চেতনা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ২১।

১২৩. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২১। শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *গণসঙ্গীত,* ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৭৭।

১২৫. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২১। শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৮।

১২৬. খগেশ কিরণ তালুকদার, *গণসঙ্গীতের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার,* উদ্ধৃত শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৮।

১২৭. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩।

১২৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি,* ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৬৫-৬৬।

১২৯. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৬০।

১৩০. *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র,* ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৪।

১৩১. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১১।

১৩২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৬।

১৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১২-১১৩।

১৩৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১৩।

১৩৫. ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৯।

১৩৬. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৫৬।

১৩৭. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩০১।

১৩৮. এ প্রসঙ্গে কামাল লোহানী বলেন, পাকিস্তান আমলে নাটক করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের পূর্ব অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তবে এই অনুমতি গ্রহণ একাঙ্ক-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলনা। এরই সুযোগ নেন নাট্যকর্মীরা। যেমন- ১৯৬৭ সালে 'ক্রান্তি' শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পল্টন ময়দানে খোলামঞ্চে মঞ্চস্থ হয় ''আলোর পথযাত্রী'' পশ্চিম বঙ্গের জ্ঞানেশ মুখার্জী নাটকটি। তৎকালীন সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলে এই নাটকের বক্তব্যকে পাকিস্তানী রূপ দিয়ে একাঙ্ক হিসেবে মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটক পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করা হয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সরবে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭-২৮।

১৩৯. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৯ এবং ২১২।

১৪০. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২।

১৪১. শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৬।

১৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৬।

১৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৫।

১৪৪. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ২২।

১৪৫. শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৬।

১৪৬. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৯।

১৪৭. ওয়াহিদুল হক, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ পূর্বধারা', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩০।

১৪৮. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২, শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৭।

১৫০. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩।

১৫১. শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

১৫২. কামাল লোহানী, 'গণ সঙ্গীতচর্চা ও আমাদের রাজনীতি', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৭৫।

১৫৩. মুক্তিযুদ্ধের গান, প্রাগুক্ত।

১৫৪. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭৪।

১৫৫. মুক্তিযুদ্ধের গান, প্রাগুক্ত।

১৫৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭৫।

১৫৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৯ এবং ৯৫-৯৭।

১৫৮. কামাল লোহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতার পথে
(১৯৭০-১৯৭১)

১

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারীর পর পুনরায় শাসনতন্ত্র (১৯৬২), জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ বাতিলসহ সবধরনের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়। যদিও উভয় সামরিক শাসন জারীর পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন- পূর্ব পকিস্তানকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় শাসন- শোষণ অব্যাহত রাখা। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই দুই সামরিক শাসন জারী হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল তথা নেতৃবৃন্দের অন্তর্কোন্দল, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সংসদীয় রাজনীতির প্রতি চরম অসৌজন্যমূলক আচরনের ফলশ্রুতিস্বরূপ আইয়ুব খানের পক্ষে সামরিক শাসন জারী করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে জনসমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে এর স্বরূপ অনুধাবন করতে পেরে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এবং এটি অনেক ঘটনার পরম্পরা হিসেবে অবশেষে ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী- আন্দোলনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ হয়ে '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এসময় সারা পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে এবং আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। আইয়ুব খানের পতনের ফলে জনরোষ স্তিমিত হয়নি বরং কাংখিত দাবী আদায়ে জনমানস ছিল স্থির প্রতিজ্ঞ। সুতরাং প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারীর সময় পরিবেশ পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হচ্ছিল।[১] ফলে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, থেকে অচিরেই প্রেসিডেন্টরূপে দায়িত্বভার গ্রহণকারী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর প্রতিভূ ইয়াহিয়া খানের পক্ষে গনশাসনের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত তখনই নেয়া সম্ভব হয়নি। তার সামরিক শাসনকে গণতান্ত্রিক মুখোশ পড়াবার জন্য বেসামরিক সদস্যদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রীসভাও গঠন করেন।[২] এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ, বক্তব্যে ক্রমান্বয়ে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতা স্বরূপ ১৯৬৯ সালে ২৮ নভেম্বর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এগুলো ছিল, এক ইউনিট বাতিল, এক-ব্যক্তি এক-ভোট, ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের ৫ এবং ২২ অক্টোবর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, জাতীয় পরিষদ প্রথম অধিবেশন শুরুর দিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হলে উক্ত পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রদেশগুলিকে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে, ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পূর্বেকার সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার সুযোগ প্রদান করা হবে। অতঃপর সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং বেসামরিক সরকার গঠন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে।[৩]

কিন্তু পূর্বসূরীদের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব অচিরে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তিনি ''আইনগত কাঠামো'' আদেশ ঘোষণা করেন।[৪] এতে ইতোপূর্বে ঘোষিত ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, ভবিষ্যত শাসতন্ত্র[৫] সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন নির্ধারণ শেষে বলেন, জাতীয় পরিষদে পাসকৃত 'শাসনতন্ত্র বিল' প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া কালীন সময় পর্যন্ত আইনসভা হিসেবে জাতীয় পরিষদ তো বটেই সে সঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদেরও অধিবেশন শুরু করা যাবে না। উপরন্তু এই আইগত কাঠামো আদেশ এর মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, ব্যর্থতায় উক্ত পরিষদ বিলোপ এবং পুনরায় নতুন নির্বাচন -এসব বিধানের সঙ্গে আবার যুক্ত করা হল এই 'শাসনতন্ত্র বিল' প্রেসিডেন্টের অনুমোদন না পেলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। এই 'আইনগত কাঠামো' আদেশ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রেসিডেন্টই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং একথা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, এসমস্ত বাধ্যবাধ্যকতা জুড়ে দেয়ার ফলে জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব বিশেষ থাকলে না। এটি ছিল ইয়াহিয়া খানের অগণতান্ত্রিক অপকৌশল যাতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা যায়।

ডানপন্থার অনুসারী রাজনৈতিক দলগুলো ইয়াহিয়া খানের উপর্যুক্ত অগণতান্ত্রিক 'আইনগত কাঠামো আদেশ' মেনে নেয়। ফলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধীতার সম্মুখীন হলেও প্রেসিডেন্ট তা অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ তার ঘোষিত সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্যোগী হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে সেপ্টেম্বর মাসে ('৭০) প্রবল

Dhaka University Institutional Repository

বন্যা দেখা দেয় পূর্ব পাকিস্তানে। ফলে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর (জাতীয় পরিষদ) এবং ১৭ ডিসেম্বর (প্রাদেশিক পরিষদ) নির্ধারিত হয়।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্রপ্রার্থী ছাড়াও দশটি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। দলগুলো হচ্ছে- আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), মুসলিম লীগ (কনভেনশন), জামায়াত-ই-ইসলামী, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, মারকাজি-জামায়াত-উল- উলেমা-ই-ইসলাম (থানভী), জামায়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভী), ন্যাপ (ওয়ালী)।

অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে উপর্যুক্ত দলসমূহ, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ছাড়াও অংশগ্রহণ করে জামায়াত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (নুরানী), সিন্ধু-করাচী-পাঞ্জাবী-পাঠান, বেলুচিস্তান ইউনাইটেড ফ্রন্ট ইত্যাদি কিছু দল। উল্লেখ্য যে, ভাসানী (ন্যাপ), পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ শেষমুহূর্তে নির্বাচন বর্জন করে। যাহোক, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা পাকিস্তানের সর্বত্র সমান ছিলনা। অধিকাংশ দলের গ্রহণযোগ্যতা ছিল মূলতঃ অঞ্চলভিত্তিক।

যাইহোক, নির্বাচনে দেখা গেল আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩ (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসনে জয়ী হয়।[৬] বাকী দু'টি আসনের ১টি পিডিপি ও ১টি স্বতন্ত্র প্রার্থী লাভ করে। পরে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় আওয়ামী লীগে যোগ দেন।[৭] ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের বিজয় তথা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে। এতে ৩১০টি (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসনে জয়ী হয়।[৮]

ইতোমধ্যে ২ জুলাই থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক-ইউনিট ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এর ফলে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ফিরে প্রায় সাবেক প্রদেশগুলো। এগুলো হচ্ছে পাঞ্জাব

Dhaka University Institutional Repository

(পূর্ব নাম পশ্চিম পাঞ্জাব), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তানে মোট প্রাদেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টি। এক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পাঞ্জাব (মোট বরাদ্দকৃত আসন ৮২, প্রাপ্ত ৬৪) ও সিন্ধু (মোট বরাদ্দকৃত আসন ২৭, প্রাপ্ত আসন ১৮) প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১টি আসনে (মোট বরাদ্দ আসন ১৮) জয়ী হয়। এতে তাদের প্রাপ্ত মোট আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৮ (মহিলা আসনসহ)। আর মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ও ন্যাপ (ওয়ালী) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে।[৯]

পাকিস্তানের এই সাধারণ নির্বাচনের সামগ্রীক ফলাফলের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে। এবং শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের অঙ্গীকার পুনরায় ঘোষণা করেন।[১০] এটি ছিল মূলত ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনকামী পূর্ব পাকিস্তারে বাঙালি জনগণের বিজয়। কিন্তু, পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির নেতা ভুট্টো এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী তার দলের অংশগ্রহণ ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার গঠন, সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্ন অবান্তর। তাঁর দল পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ২টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কারছে। বস্তুত, ক্ষমতায় যাবার অন্যায় অভিলাষে তিনি বলতে থাকেন পাকিস্তানের দুই অংশে (পূর্ব ও পশ্চিম) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে আওয়ামী লীগ ও তার দলের অবস্থান সমান। এই উদ্দেশ্যই তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিরোধীতা করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন, জাতীয় সংহতি অক্ষুন্ন রাখার দাবি উত্থাপন করেন। অন্যান্য ডানপন্থী দলও এসঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। অথচ নির্বাচনে তারা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছে।

এভাবে গণতান্ত্রিক রায় অগ্রাহ্য করার ষড়যন্ত্রের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে থাকে। এসময় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিব সংবিধান প্রণয়নের জন্য ভুট্টোসহ অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের সহযোগীতার প্রতি আহবান জানান। তিনি আশ্বাস দেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্র সব অঞ্চলের মানুষের জন্য সমতা, ন্যায় বিচার বিধানে সহায়ক হবে।[১১] ১৯৭১ সালের

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি মাসে ঢাকায় ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের মধ্যে তিনদিন ব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচ্য বিষয় ছিল ভবিষ্যত সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষমতা হস্তান্তর।[১২] ঢাকা ত্যাগের সময় সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের সময় তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে মন্তব্য করেন।[১৩] ঢাকা ত্যাগের পর ইয়াহিয়া খান লারকানা যান। সেখানে তিনি ভুট্টোর অতিথি হিসেবে ছিলেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে এরপর থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ইতোপূর্বে ঢাকার সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত বক্তব্যে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখের কথা অস্বীকার করেন।[১৪] অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের আহবানে ভুট্টো জানুয়ারির শেষপাদে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও তিনি ৬-দফার মধ্যে ১ম ও ৬ষ্ঠ দফাটি মেনে নিতে রাজী হন। কিন্তু তাঁর এই দাবি আওয়ামী লীগের নিকট ছিল অগ্রহণযোগ্য। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কাছে ৬-দফা ছিল ম্যান্ডেটস্বরূপ। কাজেই এর আংশিক বাস্তবায়ন ছিল অসম্ভব। অবশেষে ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঢাকায় শুরু হবে। কিন্তু ভুট্টো ৬-দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের বিরোধীতায় অনঢ় থাকেন। এবং তার মতামত অগ্রাহ্য করলে পরিষদের অধিবেশন বর্জনের কথা ঘোষণা করেন। স্বভাবতই শেখ মুজিবও ৬-দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে অটল থাকেন। এসময় ভুট্টো অযথাই ভারত বিরোধী ভুমিকা নিতে থাকেন। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অরো জটিলতর করে তোলা। ''কারণ-অকারণে ভারত প্রসঙ্গ তুলে তিনি এসময় এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চালান যে, মনে হচ্ছিল দেশে বুঝি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে। দেশের স্থিতিশীল এ পরিস্থিতিতে ভারত প্রসঙ্গে ভুট্টোর অকারণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিস্মিত করে। এ সময় বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা পাকিস্তানে হওয়ার কথা ছিল। ভুট্টো হঠাৎ ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের তিনি পা রাখতে দেবেন না।''[১৫] শেষপর্যন্ত তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানে অসম্মতি জানিয়ে বলেন যে, দলীয় সদস্যদের জীবন বিপন্ন করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের স্থলে প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুমোদনের ইচ্ছা তাঁর নেই।[১৬] পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তান ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের অনুন্নত প্রদেশগুলোতেও বঞ্চনাবোধজনীত কারণে স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এটি আবারো প্রমানিত হয় যখন মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় আগত বালুচ নেতা নবাব আকবর খান বুগতি এবং সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট ও জিয়েসিন্ধ এর নেতা জি. এম. সৈয়দ শেখ মুজিবকে জানান যে বালুচ ও সিন্ধুর জনগণও ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী। ঢাকায় আগত অন্যান্য নেতৃবৃন্দও আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ অন্যায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বা বিচ্ছিন্নতাবাদে আগ্রহী নয়।[১৭] জুলফিকার আলী ভুট্টো অনন্যোপায় হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের তারিখ পিছানোর দাবি জানান। অন্যথায় তিনি আন্দোলন শুরু করবেন।[১৮] তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েই যেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ এক ঘোষণার দ্বারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। যা বাঙ্গালিদের কাছে তাদের গণতান্ত্রিক রায়ের ভিত্তিতে ন্যায্য অধিকার অর্জন নস্যাতের নীল নকশা হিসেবেই গণ্য হয়। বস্তুত, ''ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পর ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লারকানার ঐতিহাসিক বৈঠকে ভুট্টোর সংগে ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র সচল করে তুলেছিল সেইসব শক্তিকে যারা জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে সম্ভাবনার শেষধাপে নিয়ে এসেছিল।''[১৯] এ প্রসংগে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৬-দফা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কটের সাংবিধানিক সমাধানের জন্য নূন্যতম দাবিতে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তার এই নবলব্ধ বোধের ফলে, নির্বাচনের পর এমনকি আওয়ামী লীগের মধ্যেও পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হতে থাকে।''[২০]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হলে ঢাকা পরিণত হয় মিছিল-শ্লোগানের শহরে। কারো ডাকে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। অনেকের হাতে লাঠি, লোহার রড বা হকিষ্টিক।[২১] শত-শত মানুষের মিছিল এসে হোটেল পূর্বাণীর দিকে এগুতে থাকে। কারণ তারা জানতে সক্ষম হয়েছে যে, ঐসময় শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক কমিটিকে নিয়ে খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছেন।[২২] জনগণ গভীর উৎকণ্ঠার সাথে তাঁদের নেতার পরবর্তী নির্দেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। সে সময়কার গণমানস সম্পর্কে আবদুল হক লিখেছেন, 'স্বাধীনতার ঘোষণা এবং তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও উদ্দীপনা এই মূহুর্তে যেমন এসেছে তেমন আর কখনো আসেনি, ভবিষ্যতেও কখনো আসবে কিনা বলা যায় না।'[২৩] কিন্তু সামরিক সরকারের এরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্ভবত তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। কারণ, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, ক্ষমতা প্রত্যার্পনের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক রায় অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বাঙালি স্বায়ত্বশাসনাধিকার অর্জনে সক্ষম হবে। ফলে, ঐ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে চূড়ান্ত কোন নির্দেশ বা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া সম্ভব ছিলনা তাছাড়া তিনি অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আলোচনা করতে চাচ্ছিলেন। তিনি ৬ দিন ব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেন। এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণার কথাও বলেন। তিনি অন্যান্য প্রদেশের জনগণের প্রতিও সংগ্রামে একাত্মতার আহবান জানান।[২৪] সংক্ষিপ্ত এক ভাষনে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের ঘোষণাকে গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিস্বরূপ আখ্যায়িত করে জীবন দিয়ে হলেও একে প্রতিহত করার জন্য বাঙালি জনগণের প্রতি আহবান জানান। ঐ দিন রাতেই ছাত্রলীগের প্রাক্তন-বর্তমান নেতৃবৃন্দ মিলিতভাবে স্থির করেন পরদিন অর্থাৎ ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগের সমাবেশে 'স্বাধীনতার প্রস্তাব' পাঠ করা হবে।[২৫] ২ মার্চ উক্ত সমাবেশ চলাকালীন সময় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। যদিও ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পনা বিহীনভাবে ঘটেছিল। কিন্তু এটি সমাবেশে উপস্থিত বিশাল সংখ্যক মানুষকে প্রচন্ডভাবে প্রনোদিত করেছিল সংগ্রামের লক্ষ্যে।[২৬] এ দিন ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নও পল্টন ময়দানে সভা করে। ২ তারিখে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। কিন্তু মানুষ এই আইন অমান্য করে শ্লোগান সহকারে রাস্তায় নেমে পড়ে। ২ ও ৩ মার্চ হরতালে প্রচুর মানুষ আহত-নিহত হয় সেনাবাহিনীর গুলিতে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে শেখ মুজিব ৩-৬ মার্চ ভোর ৬ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে হরতাল পালনের ঘোষণা দেন। এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পালিত হয়। ৩ মার্চ পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, তাঁর অবর্তমানেও যেন বাঙালি জনগণের স্বাধীনতার অন্দোলন অব্যাহত থাকে। তিনি সকল প্রকার ট্যাক্স দিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সেসংগে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে কোনরুপ বিধি-নিষেধ আরোপিত হলে তা অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, গত ২৩ বছর যাবৎ অনেক রক্ত বাঙালি দিয়েছে। সুতরাং আর ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না।[২৭] স্বাধিকারকামী বাঙালির প্রতিবাদের তীব্রতায় অবশেষে ইয়াহিয়া খান ৫ মার্চ ঘোষণা করেন যে ২৫ মার্চ ('৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। ৬ মার্চ তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসানকে পদচ্যুত করে 'বেলুচিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

কসাই' নামে খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগদান করেন। এডমিরাল আহসানের বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগ তিনি বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। পরবর্তীতে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরন এবং ২৫ মার্চ রাতে নৃশংস গণহত্যায় প্রমানিত হয় যে আলোচনার নামে তাঁরা আসলে সময়ক্ষেপন করছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি সহ এখান থেকে যতদূর সম্ভব সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করার লক্ষ্যে।

৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করেন- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৮] বস্তুত, সংক্ষিপ্ত, আবেগময় কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলার মানুষের চেতনায় একটি মৌল রূপান্তর ঘটিয়েছিল। ''বঙ্গবন্ধু অসহযোগের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ জুড়ে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হবার আহবান জানান।''[২৯] ভাষণ শুনে মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসে, স্বস্তির সুবাতাস বইয়ে পড়ে সর্বত্র। কারণ ৭ মার্চ পর্যন্ত জনগণ ক্রমাগত বলে গেছে জয় বাংলা, জাগো জাগো বাঙালি জাগো, তোমার আমার ঠিকানা/পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, বীর বাঙালি অস্ত্রধর/বাংলাদেশ স্বাধীন কর। বিনিময়ে তারা গুলি খেয়েছে, অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। সুতরাং স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু ব্যাপক জনমানসের কাছে কাম্য ছিল না। তবে অনেকে হতাশাগ্রস্থ হয়েছিলেন। তারা ভাবছিলেন সামরিক জান্তা হয়তোবা দাবি মেনে নেবে। এরকম সম্ভাবনা ছিলনা এবং হতাশাগ্রস্থদের সংখ্যাও কম ছিল।

শুধু সাধারণ জনগণ নয়, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও অসহযোগ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি নির্দেশ পালন করে। তারা আর নিজেদের পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ তথা অধঃস্তন বলে মানতে রাজী ছিল না। তারা এভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিজেদের নাগরিকত্ববোধকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে। বস্তুত, তখন থেকেই স্বাধীন, সার্বভৌম সত্তায় পরিণত হলো বাঙালি জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠিত হল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের ভিত্তি। যার দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল এটি। শেখ মুজিবের আহবানে সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহের ইতিহাসে তা ছিল অভুর্তপূর্ব।[৩০] বস্তুত, এ ধরনের বৈশিষ্ট্য,

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্নতা নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীর কোথাও হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ আমলে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন তা ব্যাপ্তিতে, গভীরতায় এত প্রসারিত ছিল না। কারণ, মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এতে যোগ দেয়নি। ঐ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত করা। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এর লক্ষ্য ছিল না। যা'হোক, ভুট্টো ১৪ মার্চ পুনরায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের নিকট ক্ষমতা প্রত্যার্পনের অযৌক্তিক দাবী জানান। বস্তুত, 'ভুট্টো বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে গেলে ইয়াহিয়া তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেনা এবং তখন ভুট্টো অবশিষ্ট পাকিস্তানের নতুন শাহেনশাহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন।'[৩১] অন্যন্য দলের নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে নিন্দা জানান।

১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতুন কর্মসূচির আকারে একটি নির্দেশ জারী করে জনগণকে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখতে বলেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহান লিখেছেন, ''বাংলদেশের কার্যত স্বাধীনতা ছিল বস্তুত একটি প্রক্রিয়ারই অংশ এবং ১ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের যাবতীয় আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন এমনই সার্বিক ছিল যে, এই অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রাণঘাতী পরিণামসহ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামোর প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এজন্যই অর্থনৈতিক তৎপরতা পূনরুদ্ধার এবং আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অসহযোগ আন্দোলনকে স্ব-শাসনের আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল।''[৩২]

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র সরকারি অফিস, বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এমনকি বৃটিশ হাইকমিশন এবং সোভিয়েত কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়।[৩৩] এভাবে ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই শেখ মুজিব ''বিশ্বের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভুখন্ডের উপর কার্যত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলেন।''[৩৪] যার ফলে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম যে নিছক কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয় তা কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত পুরো বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলতে পারি, এভাবে অসহযোগের মাধ্যমে তিনি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের সম্ভাবনা জনমনে গেঁথে দিতে সক্ষম হন। ফলে শাসকগোষ্ঠী যখন নিরীহ বাঙালিকে ১৯৭১ সালের ২৫মার্চ রাতে আক্রমণ করে তখন অধিকাংশ মানুষের কাছে শেখ মুজিবের নির্দেশসমূহই হয়ে ওঠে একমাত্র দিক-নির্দেশনা। একটি রাষ্ট্র, এর শক্তিমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় নিরস্ত্র বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তিযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রত্যাখানের দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিরোধের সূত্রপাত ঘটে। অবশেষে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র ''বাংলাদেশ''।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালিকে অধঃস্তন করে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হলে এর বিরুদ্ধে বাঙালিও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এটি ক্রমশ শানিত হয়ে রূপ নেয় জাতীয়তাবাদী চেতনায়। আর এই চেতনাই আলোচ্য সময় পর্বে এসে সুসংহত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রত্যাখানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন রাষ্ট্র, স্বাধিন সার্বভৌম ''বাংলাদেশ''। মুক্তিযুদ্ধে অনেক ত্যাগ-বেদনা-নির্যাতনের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করে স্বাধীনতা। অবসান ঘটে পাকিস্তানী শাসনের সকল শোষন-বঞ্চনা-নির্যাতন-গণহত্যার। গৌরবময় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের আলোকে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার মর্যাদা নিয়ে বাঙালি বিশ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। বস্তুত, প্রথম সামরিক শাসন জারীর পর থেকে অর্থাৎ '৬০-এর দশকের প্রথম থেকেই বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমে তীব্ররূপ ধারন করতে থাকে। এসময় সামরিক জান্তা সুকৌশলে কতিপয় সংস্থা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙালি সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানবাদী করে তুলতে সচেষ্ট হয়। উদ্দেশ্য, বাঙালি সমাজের এই সচেতন, শিক্ষিত অংশ বা শ্রেণীটির মাধ্যমে বাদবাকি জনসমাজের মানস প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা, সরকারি প্রচেষ্টার সংগে কিছু সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী বুদ্ধিজীবী তথা সংস্কৃতিসেবী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের সম্মিলিত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাঙালি জনসমাজ সহজেই সরকারের এসমস্ত অপপ্রয়াসকে চিহ্নিত করতে পেরেছে এবং তা প্রত্যাখান করেছে নির্দ্বিধায়। বস্তুত, সাংস্কৃতিক কর্মীরা সমস্ত দমন ভীতিকে অগ্রাহ্য করে বাঙালি সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিভিন্ন প্রতীককে তুলে ধরে এবং এর জয়গান গেয়েছে অবিরাম ঢাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র। এসব সামগ্রীক কর্মকান্ডের নির্যাস হলো বাঙালি জনসমাজের সমর্থন, সম্পৃক্ততা লাভ করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাঙালি তার সংস্কৃতিতে বিন্দুমাত্র আঘাত সইতে আর রাজী নয়। সে তার লক্ষ্য বা দাবি আদায়ে এবার সুসংবদ্ধ। আইয়ুব আমলের শেষপাদে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে যেয়ে আইযুব খান সংস্কৃতিকে দমন করতে উদ্যোগী হন। ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দ্রোহের ভাষা প্রবলতর হয়ে ওঠে এবং আইয়ুবের পতন পর্যন্ত পুরো সময় জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে সাংস্কৃতিক দিকটি। বস্তুত, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালি

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় প্রত্যয়ের সঙ্গে কখনোই একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। আর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাজিত ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে কোন প্রকার বন্ধনকে সম্পূর্নভাবে অস্বীকার করা হয়। ফলে আলোচ্য সময় পর্বে ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারী হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষে সহসাই জনমত বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ তথা পাকিস্তান বিরোধীতা লক্ষ্য করে তার পক্ষে বেশী দেরী করাও সম্ভব ছিল না। আর এটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, বাঙালি বিদ্বেষী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সুযোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন ইয়াহিয়া খান। যার প্রমাণ ১৯৭১ সালে নিরস্ত্র, নিরপরাধ বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা।

বস্তুত, ইয়াহিয়া খান ভেবেছিলেন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পূর্বসূরীদের মতই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দমন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারবেন। কিন্তু সাংস্কৃতিসেবী-কর্মীরাও এ ব্যাপারে সম্পূর্ন সজাগ-সচেতন ছিলেন। ফলে রাজনীতির পাশাপাশি সংস্কৃতি দমনের সকল অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করতে সক্ষম হয় বাঙালি।

নিম্নে এ সময় পর্বে শাসকগোষ্ঠী গৃহীত বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী পদক্ষেপ এবং এর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিরোধ-আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

২ .১ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার তৎপরতা

আইয়ুব খানের আমলে সৃষ্ট এই সংস্থাকে সরকারি গোয়েন্দা শাখা বলা চলে। যার মূল কাজ ছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মানসপ্রবতণতা লক্ষ্য করা। এবং তাদের বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পাকিস্তানণানি হিসেবে গড়ে তোলা। এই প্রচেষ্টা একেবারে যে ব্যর্থ হয়নি তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে বাঙালিত্ববোধে অনুপ্রাণীত বুদ্ধিজীবিরা একে প্রত্যাখান করায় এর কার্যক্রম, উদ্দেশ্য আইয়ুব আমলে ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে, ইয়াহিয়া খানের শাসনামলে নব উদ্যমে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার তৎপরতা শুরু হয়। এ লক্ষ্যে ডঃ হাসান জামানকে (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সংস্থার সার্বক্ষণিক পরিচালকরূপে নিযুক্তিসহ পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়।[৩৬] তিনি মূলত দু'ভাবে কাজে অগ্রসর হলেন- প্রথমত, খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী-লেখকদের দ্বারা বই লেখানো এবং এজন্য তাঁদের উচ্চহারে পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে বশীভুত রাখা। দ্বিতীয়ত, খ্যাতিহীন লেখকদের দিয়ে পাকিস্তানী আদর্শপন্থী চটি জাতীয় বই রচনা করে তা প্রদেশের সর্বত্র অর্ধ-শিক্ষিত গণমানুষের মধ্যে প্রচার করা। এভাবে স্বভাবতই নবীন-প্রবীন নামহীন প্রচুর লেখক জীবিকার সন্ধানে বাঙালি বিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।[৩৭]

সংস্থাটির কার্যক্রম, উদ্দেশ্য সম্পর্কে শওকত ওসমান লিখেছেন, ''দুঃস্থ লেখকদের পান্ডুলিপি বাজার দরের চেয়ে ঢের বেশী চড়া মূল্যে কিনে নাও; ফলে, লেখক প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রথমে কৃতজ্ঞ এবং পড়ে মুখাপেক্ষী, এমন কী সমর্থক সেজে বসে থাকতে বাধ্য। এই ভাবে বহু তরুণ লেখক মগজ বিকিয়ে দিয়েছে, আবার প্রতিষ্ঠিত লেখক মাথা চাড়া না মারে, তারও ব্যবস্থা রাখো। . . .নগদ নারায়ণ অবিশ্যি আভ্যন্তরীণ যোগসেতু।''[৩৮]

সংস্থাটির উপর্যুক্ত কার্যক্রমের আওতায় এক বছরের মধ্যে প্রায় পনেরশো বিভিন্ন ধরনের পুস্তকের পান্ডুলিপি গৃহীত হয়। যারমধ্যে তিনশোটি নাটক, চারশোটি গবেষণামূলক এবং আটশোটি ছিল গণসাহিত্যমূলক। এবং তন্মধ্যে প্রায় ছয়শোটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। অথচ, আইয়ুব আমলে সংস্থাটি দশবছরে (১৯৫৯-৬৯) মাত্র ত্রিশটি পুস্তক প্রকাশ করতে পেরেছিল।[৩৯]

এভাবে ইয়াহিয়া খানের আমলে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান ক্রান্তিকালীন সময়ে পাকিস্তানী আদর্শ-সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক অশুভ তৎপরতা শুরু করে। স্বভাবতই আগের মত এই অপপ্রয়াসও সফল হয়নি।

২ .২ পুস্তক বাজেয়াপ্তি

৩৪৫ ১৯৬৯ সালের শেষ নাগাদ সরকার এক প্রেস পাবলিকেশান্স অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধীন চিন্তার প্রসারে সহায়ক বই-পুস্তকাদি বাজেয়াপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে সরকার কয়েকটি

Dhaka University Institutional Repository

বই-এর ওপর 'কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে না' তার কারণ দর্শানোর জন্য প্রকাশকদের নির্দেশ জারী করে। এই বই পুস্তিকাগুলো ছিল - বদরুদ্দীন উমরের ''সংস্কৃতি সংকট'' (১৯৬৭), ''সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'' (১৯৬৯); কামরুদ্দীন আহমদের "The Social History of East pakistan," সত্যেন সেনের ''আল বেরুনী,'' ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর ''জেলে ত্রিশ বছর'' (১৯৬৮); আবদুল মান্নান সৈয়দের ''সত্যের মত বদমাস'', মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ''ভোটের আগে ভাত চাই'', (রাজনৈতিক পুস্তিকা)।[৪০]

লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ঢাকা শহরের প্রায় বিশটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় ''লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি।'' এই কমিটির এক সভায় প্রেস পাবলিকেশান্স অর্ডিন্যান্স বাতিল সহ পুস্তক বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রত্যাহার এবং সকল প্রচার মাধ্যম রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রের ওপর সবধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ বন্ধ সহ বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ দমন প্রয়াসের বিরুদ্ধে সরকারের প্রতি আহবান জানানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪১] চিন্তা ও মত প্রকাশের ওপর যে কোন প্রকার হামলা প্রতিরোধের জন্য সকল নাগরিকের প্রতি কমিটি আহবান জানান। সরকার কর্তৃক এসমস্ত দাবী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কমিটি আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। লেখক-বুদ্ধিজীবীদের উপর্যুক্ত কার্যক্রমের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র সংগঠন, চিত্রশিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী, কৃষক, শ্রমিক সমিতি ও দলসমূহ।

আন্দোলনের চাপে সরকার বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। এভাবে কৌশলে সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে চান। এবং সরকারের উদ্দেশ্য সাফল্য অর্জন করে। ক্রমে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ ''পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি'' পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্তি করণ

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রচন্ডতায় ভীত শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানী ভাবধারা প্রসারে উপর্যুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সচেতন, শিক্ষিত অংশকে বশীভূত-দমিত করার উদ্যোগ নেন। যাতে এর মাধ্যমে ব্যাপক অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। অপরদিকে, একই সংগে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নাগরিক কিশোর-তরুণদের মানস প্রবণতা পাকিস্তানী ভাবধারায় পরিপুষ্ট করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ৯ম-১০ম শ্রেণীর (১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষ) পাঠক্রমে ''পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি'' নামক দু'খন্ডের পাঠ্যবই সংযুক্ত করা হয়। ডঃ সিরাজুল ইসলাম (অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়) এটি রচনা করেন। তিনি বইটির ভূমিকায় (দ্বিতীয় খন্ড) লিখেছিলেন- ''পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, পাকিস্তানী কৃষ্টির কতকগুলি দিক যেমনঃ ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ, স্থাপত্য ও ললিতকলা সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা দিবার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে।. . .পৃথিবীর যে কোনও উন্নত দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতির শিল্প-কলা-কৃষ্টিগত বুনিয়াদ সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষার্থীকে অবহিত করবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্তু ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। তাই প্রদেশের শিক্ষাবোর্ডগুলি এবং সে-সংগে টেকস্ট বুক বোর্ড তাঁহাদের এ নীতি ও পদক্ষেপের জন্য অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।''[৪২]

পুস্তকটি প্রত্যাহারের জন্য দু'টি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের নেতৃত্বে ; অপরটি ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সমর্থিত ''স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ''। এ দুই পরিষদ সংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭০ সালের ৬ আগষ্ট ''স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'' কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এ পরিষদের প্রচার পত্রে বলা হয়, ''পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বইটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিলেবাসের এ নূতন বোঝার দ্বারা সুকৌশলে শিক্ষার বিস্তারকে রোধ করার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। অন্যদিকে এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।''[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমে এই দুই পরিষদের সংগ্রামের সংগে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবীরা সম্পৃক্ত হলে সংগঠিত আন্দোলনের মুখে সরকার বইটির দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ এবং প্রথম অংশ আংশিক বাতিলের ঘোষণা দেন।[৪৪] এভাবে সরকার আপোষ করতে বাধ্য হন। কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে, বাঙালির জাতীয়তাবাদ যখন সুসংহত রূপ নিয়ে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সেসময় সরকারের এ ধরনের অপপ্রয়াসের সংগে আপোষকামী অংশের গণবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত ছিল। কিন্তু সে সংগে এটিও লক্ষ্যনীয় প্রতিটি অপপ্রয়াস সফলতা অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অভিঘাতে বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট বন্ধ্যাত্বের অবসানে প্রথমত ও প্রধানত সাংস্কৃতিক কর্মীরা এগিয়ে আসেন। ক্রমে সাংস্কৃতিক অন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলন গতিসঞ্চার লাভ করে এবং অবশেষে প্রবলতর হয়ে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয়। মিছিল-শ্লোগান-বিক্ষোভের নগরে পরিণত হয় ঢাকা। রাস্তা যেন হয়ে ওঠে মানুষের বাসস্থল। পুরো সময়টি জুড়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাঙালিত্ববোধ, জাতীয়তাবাদী চেতনায় মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছেন। পতন ঘটে সামরিক জান্তা আইয়ুব খানের। এবং উত্থান ঘটে নতুন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানের। স্বভাবতই ক্ষমতার এই পট পরিবর্তনে বাঙালির রোষ-ক্ষোভ স্তিমিত হয়নি। যার প্রতিফলন দেখি সভা-সমাবেশ, মিছিল, কবিতা পাঠ, নাটক, গণসঙ্গীতে। এ সময় প্রতিবাদ জানাবার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় শেষোক্ত মাধ্যম দু'টি। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক রায় কার্যকর না করার অসদেচ্ছা পোষণ করছিলেন শাসকগোষ্ঠী। যার ফলে ৩ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয় (১ মার্চ, '৭১)। বাঙালি বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা সে ডাকে সাড়া দিয়ে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে অনুপ্রাণীত করতে থাকেন লক্ষ্য, আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য। এসময় বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম প্রতীক ''শহীদ মিনার'' হয়ে ওঠে তাঁদের যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রস্বরূপ। শহীদ মিনার থেকে মিছিল শুরু হতো অথবা এখানে এসে মিছিল শেষ হতো। সে সংগে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভা, গণসঙ্গীত, নাটক, কবিতা পাঠের আসর। বাংলাদেশ তথা বাঙালির ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালীন সময়ে সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসমাজ প্রভৃতি সংস্কৃতি সেবী তথা কর্মীরা রাস্তায় নেমে আসেন। তাঁদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন লেখক সংগ্রাম শিবির, লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা, সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, নজরুল একাডেমী, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, চলচিত্র শিল্পী কুশলীবৃন্দ, চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের শিল্পীবৃন্দ ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে ক্রমাগত সভা, অনুষ্ঠান, মিছিলের মাধ্যমে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। স্বাধীনতার মন্ত্রে গণমানুষকে দীক্ষিত করতে থাকেন। এ সময় এক বিবৃতি দ্বারা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পাকিস্তান সরকারের দেয়া খেতাব বর্জন করেন।[৪৫] মার্চের গোড়াতেই টেলিভিশন ও বেতার শিল্পীরাও উভয় প্রচার মাধ্যম বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে তাঁরা সম্মিলিতভাবে গঠন করেন ''বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ।'' ৯ মার্চ তাঁরা প্রচার মাধ্যম দুটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং বাঙালিকে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য উদ্দীপনা - প্রণোদনা যোগাবার লক্ষ্যে জাতীয় বাদী চেতনাসমৃদ্ধ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করতে থাকে।[৪৬] এভাবে তাঁরা উদ্দীপ্ত করেছে স্বাধীনতার ইচ্ছাকে। এমনকি ঘোষণা প্রচারকালে 'পাকিস্তান রেডিও' বা 'পাকিস্তান টেলিভিশন' -এর পরিবর্তে 'ঢাকা বেতার', 'ঢাকা টেলিভিশন' বলা শুরু করে। সে সংগে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত সম্প্রচার ও জাতীয় পতাকা প্রদর্শনও বন্ধ রাখে ২৫ মার্চ পর্যন্ত।[৪৭]

২ .৪ নাটক ও গণসঙ্গীত

ক. নাটক

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। কারণ মানুষ প্রচন্ডরূপে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই প্রতিবাদীরূপের, সত্তার প্রতিফলন নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং ''নাটক আর কেবলমাত্র চার দেয়ালের আলোকোজ্জল পাদপীঠে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নাটক নেমে এসেছে জনতার কাতারে, রাজপথে, মিছিলে।''[৪৮] এ সময় পর্বে সামাজিক, জীবন-ঘনিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

চিরায়ত নাটকের পাশাপাশি প্রতিবাদী, গণমুখী নাটকও মঞ্চস্থ এ সময়ে মঞ্চস্থ নাটকের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী', শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য', 'মুক্তির নেশা', 'শপথ নিলাম' প্রভৃতি প্রতিবাদী নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে দেখুন, পরিশিষ্ট। স্বভাবতই প্রতিবাদী বক্তব্যপূর্ণ নাটকগুলো মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে। হয়।[৪৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,''ক্রীতদাসের হাসি'' নাটকটিতে রূপকের মাধ্যমে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। নাটকটির মূল বক্তব্য হল, অর্থ-বিত্তের মাধ্যমে দাস ক্রয় করা গেলেও তার হাসি কেনা সম্ভব নয়।[৫০] বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন বিশেষত সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, সংস্কৃতি সংসদ, বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ বিভিন্ন স্থানে নাটকের আয়োজন করতো। এসময় অভিনব পন্থায় নাটক অভিনীত হতে থাকে ব্যাপকভাবে গণমানুষের কাছে পৌছাবার লক্ষ্যে, স্বাধীনতার আকাঙ্খায় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার মানসে। উদাহরণরূপ বলা যায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ পথ নাটকের আয়োজন করে, যেমন 'ভোরের স্বপ্ন'[৫১] উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী খোলা ট্রাকের ওপর 'শপথ নিলাম' নাটকটি মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করে এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে বেচারাম দেউড়ী, হাজারী বাগ, মগবাজার ও মালিবাগে এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।[৫২]

শুধু মঞ্চে অভিনীত নাটকই নয়। টেলিভিশনে প্রচারিত নাটকও সহজে প্রভাব ফেলে বাঙালি সমাজে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বেতার, টেলিভিশনের শিল্পীরা সম্মিলিতভাবে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' গঠন করে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বেতার ও টেলিভিশনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এটি এবং উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে।

এসময় সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'। মানুষকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয় রূপকের আড়ালে এর বিপ্লবাত্মক বক্তব্য। ১৯৬৯ সালে মঞ্চায়নের কথা হলেও বিভিন্ন প্রতিকুলতার জন্য বারবার নাটকটির তারিখ পিছানো হয়। অবশেষে ১৯৭০ সালের ১ মার্চ[৫৩] নাটকটি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে প্রায় পনের হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি সংসদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাট্য আয়োজন সমরেশ বসুর সামন্তবাদ বিরোধী বক্তব্যপূর্ণ 'আবর্ত' - এর মঞ্চায়ন। আনুমানিক দশ হাজার ছাত্র-দর্শক মহসিন হল প্রাঙ্গনে নাটকটি উপভোগ করে।[৫৫]

খ. গণসঙ্গীত

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে অসহযোগ আন্দোলকালীন সময় পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দ্রোহের ভাষা তীব্রতা লাভ করে। ফলে গণসঙ্গীতও অনেক বেশী রচিত -গীত হতে থাকে। এবং তার সুর-বাণীও মানুষকে উদ্বেলিত করেছে স্বাধীনতার আকাঙ্খায়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রচন্ডতা তথা সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্মকান্ডের ব্যাপকতা রাজনৈতিক অন্দোলনের গতিসঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। কারণ, আমরা বাঙালি- এই ঐক্যবোধ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ধরে রাখার জন্য, তাদের বাঙালি পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তথা আন্দোলন অনুপ্রাণীত করেছে ভীষনভাবে। গণসঙ্গীত এসময় ব্যাপক আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। ''যদিও লোকসঙ্গীতের মত গণসঙ্গীতের গ্রহনযোগ্যতা ব্যাপক হয়নি। যদি হতোই তবে এখন এর গ্রহনযোগ্যতা নেই কেন। এখনো তো সাম্প্রদায়িক পরিবেশ, অনেক সমস্যা বিরাজমান। কিন্তু সে সময়ের মত এখন গণসঙ্গীতের মাধ্যমে এসব তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুত, সে সময় মানুষের কাছে গণসঙ্গীত ব্যাপকভাবে গৃহীত হবার অন্যতম কারণ যাঁরা এসব লিখেছেন, গেয়েছেন তাদের কমিটমেন্ট নিয়ে কারো মনে কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।''[৫৬]

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে জনগণকে ক্রমাগত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিতে থাকেন। বস্তুত, গণঅভ্যুত্থানের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার পক্ষে সহসাই দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। বাঙালিও অচিরেই বুঝতে সক্ষম হয় যে ইয়াহিয়া খান তাদের মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। নির্বাচনের রায় কার্যকরে তার অনীহা, অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিবাদে সর্বস্তরের বাঙালি জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। বঙ্গবন্ধু অহিংস অহসযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানেই গণসঙ্গীত গাওয়া হতো। এসময় আলতাফ মাহমুদ[৫৭], শেখ লুতফর রহমান [৫৮], আবদুল লতিফ[৫৯],

Dhaka University Institutional Repository

নাজিম মাহমুদ[৬০] প্রমুখ সুরকার- গীতিকারের গণসঙ্গীতগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসময় জনপ্রিয় শ্লোগান, অনেক কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'লেনিন' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিবসের কবিতা'র কথা উল্লেখ করা যায়।[৬১] আর জয় বাংলা শ্লোগানটি সুর প্রয়োগে পরিণত হয় গানে 'জয় বাংলা বাংলার জয়/হবে হবে নিশ্চয়'। এ সময় প্রচুর দেশাত্মবোধক গানও রচিত হয়। এ প্রসংগে করুণাময় গোস্বামীর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, ''পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী এবং শেষের দিকে স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পটভূমিতে বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচিত হতে থাকে এবং তাতে আবহমান সকল বিষয়ই স্থান পায়। একে বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নবজাগরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।''[৬২] এক্ষেত্রে গীতিকারদের মধ্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সিকাদার আবু জাফর, গাজী মাজহারুল আনোয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, ''এ সব দেশের গান, দেশাত্মবোধক গানও গণসঙ্গীতে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশে প্রধানত দেশাত্মবোধক গান, ভাষার গানই লেখা হয়েছে যা মুক্তযুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে।''[৬৩] পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংঘর্ষ দেশাত্মবোধক গান রচনায় প্রেরণায় যোগায়। ''এখানকার সমাজ মানসে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একেবারে সূচনায়ই দানা বাঁধতে শুরু করে।''[৬৪] নিম্নে আলোচ্য সময়কালের উল্লেখযোগ্য কিছু গানের পঙতি উদ্ধৃত করা হলো[৬৫]-

১. জাগো ওঠো জাগো একুশে সকাল
রক্ত লাল -
ঘরে ঘরে জ্বালো স্মৃতির মশাল
রক্ত লাল ।।

২. হেই সামালো, হেই সামালো
হেই সামালো ধান হো
কাস্তেতে দেও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেব না, আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো ।।

৩. কারার ঐ লোহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট . . ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আমাদের চেতনার সৈকতে
একুশের ঢেউ মাথা কুটলো
শহীদের রক্তের বিনিময়ে
চোখে জল কয় ফোঁটা জুটলো ।।

৫. ধন্য মাগো তোমার ধূলো মেখেছি
তোমার কোলে আমার মাথা রেখেছি ।।

৬. সেই আমাদের বাংলাদেশ
রাজরানী আজ ভিখারিণী
কাঁদছে বনে লুটিয়ে কেশ ।।

৭. নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম
চির মনোরম, চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর।।

৮. এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো
এই বন্যা মোরা রুখবো
মায়ের বোনেদের শিশুদের
অশ্রু মুছবোই ।।

৯. ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি এসে গেছি আমরা
চোখে আজ স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠ ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া ।

১০. ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে, ছেড়ে দে
আকাশে ডাকে যদি দেয়া ঘন ঘন
ঝড়ো হাওয়া বয় যদি
বয় অনুক্ষণ
বজ্রের গর্জন
দশদিক কম্পিত ছিন্ন
তবু তোর পথ নেই বেয়ে চলা ভিন্ন
তুই পাড়ি দিবি আজ
তোর বুকে বুক বেঁধে।

শেখ লুতফর রহমান সে সময় জনগণের ওপর গণসঙ্গীতের অপরিসীম প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে ''ঢাকার প্রতিটি আইল্যান্ড, মোড় আর পার্কে তখন সমাবেশের পর জনসমাবেশ, পাশাপাশি গণসঙ্গীতের আসর। গ্রামের বৃদ্ধ, যুবক,

Dhaka University Institutional Repository

কিশোররা ঢাকা এসে ফিরে যেতে পারে না আগামীকালকের মিছিল বা গণসঙ্গীতের আসর ছেড়ে।'' তিনি আরো লিখেছেন, '' '৭১-এর ২৩ মার্চ ছিল বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন শহীদ মিনার প্রঙ্গনে 'ছায়ানট' তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভোরবেলা একটি দেশাত্মবোধক গানের আসরে বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা দিবস'-এর ঘোষণা দেয়। 'আমার সোনার বাংলা' গানটির হাজার হাজার সাইক্লোস্টাইল কপি উপস্থিত শ্রোতা এবং জনতার মাঝে বিলিয়ে ছেলেমেয়েদের সাথে উপস্থিত জনতাকেও গাইতে বলা হয়। গাছে গাছে, রাস্তার পেছনে এবং বেদির সামনে অসংখ্য মানুষ। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি মঞ্চে শিল্পীরা গাইছে আর তাদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছে দর্শক-শ্রোতারাও- এ এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।''[৬৬]

এভাবে গণসঙ্গীতের মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে দ্রোহের ভাষা, মানুষের ক্ষোভ-বঞ্চনা-নিপীড়নের কথা। এরই ফলশ্রুতিতে ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালি সশস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে তারা স্বাধীনতার আকাঙ্খায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বস্তুত, ''মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালীকে ঠেলে নিয়ে গেছে তার সাংস্কৃতিক চেতনা, তার সত্য জাতীয়তাবোধ। --- মৃত্যু ছাড়া গতি নেই যে যুদ্ধে সেই যুদ্ধে জিতেছে বাঙালী চেতনার জোরে, সংস্কৃতি বোধের জোরে।''[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে*, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ৪৪।

২. এই মন্ত্রীসভার সদস্যরা ছিলেন- ডাক্তার এ এম মালিক (স্বাস্থ্য, শ্রম, পরিবার পরিকল্পনা), সরদার আবদুর রশীদ (স্বরাষ্ট্র, কাশ্মীর, সামন্ত রাজ্য ও সীমান্ত অন্বঞ্চল), এ কে এম হাফিজুদ্দিন (শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ), নওয়াব মোজাফফর আলী কিজিলবাস (অর্থ), মোহাম্মদ শামসুল হক (শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা), নওয়াবজাদা শের আলী খান (তথ্য ও বেতার), আহসানুল হক (বাণিজ্য), মাহমুদ হারুণ (কৃষি ও পূর্ত), জাস্টিস এ আর কর্নেলিয়াস (আইন), অধ্যাপক গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী (যোগাযোগ)।

দেখুন, আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ* ১৯৫৩-'৯৩, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১৬২-১৬৭।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৮।

৪. দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৩। আইনগত কাঠামো আদেশ-১৯৭০ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ ৫০২-৫১৯।

৫. ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ বেতার ভাষণে তিনি ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের জন্য পাঁচটি মূলনীতি ঠিক করে দেন। এগুলো হচ্ছে-

ক. যেহেতু ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে হবে ইসলাম আদর্শের ভিত্তিতে।

খ. একে পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আন্বঞ্চলিক সংহতি, এবং ঐক্য রক্ষার সুনিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে এবং রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র।

গ. ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রটি অবশ্যই গণতান্ত্রিক হতে হবে। এবং এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জনগণের মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করতে হবে।

ঘ. কেন্দ্রের হাতেও এমন ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে বহির্বিষয়ক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এবং দেশের স্বাধীনতা ও আন্বঞ্চলিক সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. এই শাসনতন্ত্রকে পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সাম্য-সংহতির ভিত্তিতে তারা জাতির পিতা 'কায়েদ-ই-আযম' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্বপ্নানুযায়ী একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৮।

৬. ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৩ টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। কারণ, নভেম্বর মাসে উপকুলবর্তী অঞ্চলে মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস দেখা দিলে ঐ সব উপদ্রুত এলাকায় ১৭ জানুয়ারী ১৯৭১ সালে ভোট গ্রহণ করা হয়। এতে জাতীয় পরিষদের ৯টি আসনের সবকটি (৯ টি) এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২০ টি আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ।

দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৫। আবদুল হক *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৩।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সোবহান লিখেছেন, ''এই নির্বাচন সম্পর্কে কিছু পন্ডিত যে কথা বলেছেন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নভেম্বরের সাইক্লোন ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল তা খুবই হাস্যকর যুক্তি। সাইক্লোন ৩-৪ % ভোট আওয়ামী লীগের পক্ষে নিয়ে এসে থাকতে পারে; কিন্তু একটি নির্বাচনী এলাকা ব্যতীত অন্যসব ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ ভোট এই ব্যবধানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সাইক্লোনের ঘটনা সাইক্লোন সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আওয়ামী লীগের পক্ষে যে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে আরো প্রবল করেছিল মাত্র।''

দেখুন, রেহমান সোবহান, *বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, লোকবক্তৃতামালা-৪, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ১৪।

৭. ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ২০৯।

৮. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৫।

৯. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

১০. নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক ৬-দফা তথা শেখ মুজিবকে সমর্থন দান প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ বলেন, ''প্রথমত, নির্বাচনের আগে তিনি ছয় দফাকে সাধারণ ওয়াদা না বলিয়া রেফারেন্ডাম বলিলেন। তাঁর কথার তাৎপর্য ছিল এই যে, হয় তাঁর পক্ষে ''হাঁ'' বলিবেন, নয় ''না'' বলিবেন। শুধু নির্বাচনে নয়, তিনি রেফারেন্ডামেও জিতিলেন। শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের একক মুখপাত্র হইলেন।''

উদ্ধৃত আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পন্ঞাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৯২।

১১. ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১১।

১২. ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ২২৭।

১৩. ডঃ মোঃ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৭। আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৩।

১৪. ডঃ মোঃ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৭।

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৮।

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪১-২৪২।

বস্তুত, এসময় তিনি ভারতীয় আক্রমনের আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। এবং সে সঙ্গে জাতীয় পরিষদকে ''কসাইখানা'' নামে উল্লেখ করে বলেন এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ডিক্টেটরশীপ চলছে। তিনি বলেন দেশে তিনটি পার্টি রয়েছে- আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপল্স পার্টি ও সামরিক বাহিনী। এভাবে তিনি রাজনৈতিক- শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সামরিক বাহিনীকে উৎসাহীত করেন এবং এর মাধ্যমে বাঙালিকে ভীত-দমিত করতে চান।

দেখুন, আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

১৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৫-২৪৭।

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৫৫।

১৯. রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।

২০. এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সোবহান আরো বলেন, '' বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে পাকিস্তানের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলির ভুল তথ্যের দ্বারা ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে ভুট্টো কিংবা ইয়াহিয়া কেউই আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সম্পর্কে পূর্বে কোন ধারণা করতে পারেননি। তবে তাঁরা উভয়েই

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বিপুল নির্বাচনী বিজয় এবং বাংলাদেশের মানুষের উপর বঙ্গবন্ধুর প্রভাবের পেছনে ১৯৫৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানে যারা ক্ষমতায় আসীন ছিল তাদের ক্ষমতার দুর্গে যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো উভয়েই নিজেরা নিজেদের বিভ্রান্ত করেছিলেন এইরূপ ভেবে যে, নির্বাচনের ফলাফল বাঙালি ভাবপ্রবণতা দ্বারা উজ্জীবিত এবং নভেম্বর ১৯৭০-এর ঘূর্নিঝড়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেকার একটি ঘটনা মাত্র। ১৯৭১ সালের প্রথমদিকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে পর্যন্ত ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া দু'জনেই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর পূর্বেকার বাঙালি নেতাদের মতো তাঁকেও কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগ দেওয়ার প্রস্তাবের মাধ্যমে ৬-দফা দাবির ব্যাপারে আপোস করতে সম্মত করানো যাবে। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ১৯৬৯ সালের মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যে মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন।''

দেখুন, রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫-১৬।

২১. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৮।

এ প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম (ছাত্রলীগ নেতা ও সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু ১৯৭০-৭২) বলেন, ''মানুষ নেমে পড়েছিল রাজপথে --- এই প্রথম স্লোগান হল 'স্বাধীনতার'। এর আগে অনেকে, অনেকভাবে স্বাধীনতার কথা বলেছেন --- কিন্তু এই প্রথম রাজপথে, প্রকাশ্যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগন স্বাধীনতার স্লোগান আপনা-আপনিই তুলে নিল। 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা -বাঙালিরা মানেনা', 'পাকিস্তানের পতাকা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান আজিমপুরের গোরস্থান' ইত্যাদি স্লোগান তুলে জনতা এগিয়ে যায়।''

উদ্ধৃত ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬১-২৬২।

২২. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬।

২৩. আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৮।

২৪. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬।

২৫. ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. এ প্রসঙ্গে ডঃ হাননান লিখেছেন, ''আনুষ্ঠানিকভাবে সেদিন এ পতাকা তোলা হয়নি, তোলার সিদ্ধান্তও ছিলনা।''

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬৭-২৬৯।

২৭. দৈনিক আজাদ, ৪ ৩. ১৯৭১।

২৮. ৭ মার্চের ঘোষণা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০০-৭০২।

২৯. রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬।

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯।

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭।

৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮০। আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯৮।

৩৪. রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

৩৫. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা', আজকের কাগজ, ২১ ভাদ্র, ১৪০০।

৩৬. ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৬৮।

৩৭. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১২৬।

৩৮. শওকত ওসমান, 'বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন', *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১০৪।

৩৯. সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭।

৪০. ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭।

৪১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, লেখক স্বাধিকার কমিটির প্রচারপত্র, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০২-৪০৩।

৪২. সিরাজুল ইসলাম, *পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি*, ঢাকা, ১৯৬৯।

৪৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩৯।

৪৪. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. মিনার মনসুর, 'বাংলাদেশ (১৯৪৭-'৮২)ঃ সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি', *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৩০।

৪৬. বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা ২ মার্চ ১৯৭১-এ গঠন করে ''বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ''। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম (আহবায়ক), ওয়াহিদুল হক, আতিকুল ইসলাম, সনজীদা খাতুন, আলতাফ মাহমুদ, জাহেদুর রহিম, কামরুল হাসান, কলিম শরাফী, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, গোলাম মুস্তাফা, খান আতাউর রহমান প্রমুখ। এই প্রতিবাদী শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাস্বরূপ ১০-২৫ মার্চ পর্যন্ত বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ বাঙালিকে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রণোদনা যুগিয়েছে।

দেখুন, সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯৭-২৯৮। মিনার মনসুর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩০।

৪৭. শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বেতারে সরাসরি সম্প্রচারে বাধা দিলে বেতার কর্মীরা বেতারকেন্দ্র পরিত্যাগ করেন। অত্যান্ত সাহসী ছিল এই পদক্ষেপ। ফলে সাময়িকভাবে হলেও বেতার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। বেতারের কর্মীদের দাবী অনুসারে ৮মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতারে প্রচার করা হয়। মিনার মনসুর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩১।

৪৮. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০১।

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০১।

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২১।

৫১. এই পথ নাটকটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বাহাদুর পার্ক প্রভৃতি স্থানে মঞ্চস্থ হয়। সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯৮।

৫২. *স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩০।

৫৩. সাক্ষাৎকার ঃ আবুল হাসনাত, সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ, ১৫-১১-২০০০।

৫৪. নাটকটিতে অভিনয় করেন- গোলাম মুস্তফা (রাজা), কাজী তামান্না (নন্দিনী), আসাদুজ্জমান নূর, (কিশোর), আলতাফ হোসেন (মোড়ল), গোলাম রব্বানী (বিশু পাগল), লায়লা হাসান (চন্দ্রা), ইনামুল হক (গোঁসাই), আনোয়ার হোসেন (পালোয়ান), ফখরুল ইসলাম (গোকুল) প্রমুখ সহ আরো অনেক শিল্পীবৃন্দ। শিল্পী নিতুন কুন্ডু এর সেট নির্মাণ করেন। নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পীরা ছিলেন- ইকবাল আহমেদ, ফ্লোরা আহমেদ এবং ছায়ানটের অন্যান্য শিল্পীরা।

Dhaka University Institutional Repository

দেখুন, কাজী তামান্না, 'পুরানো সেই দিনের কথা', *গৌরবের চল্লিশ বছর ১৯৫২-৯২, ছাত্র ইউনিয়ন*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৬২-৬৩।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩।

৫৬. সাক্ষাৎকার ঃ শামসুজ্জামান খান, মহাপরিচালক, জাতীয় যাদুঘর, ২১১১ ২০০০।

৫৭. অনন্য প্রতিভার অধিকারী শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, সক্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মী-সংগঠক আলতাফ মাহমুদ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। ''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'' এই মৃত্যুঞ্জয়ী গানটিতে সুরারোপ করেছেন তিনি। তাঁর সুর দেয়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান হলো- ''আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে যারা''। এছাড়াও তাঁর গাওয়া অপর কয়েকটি জনপ্রিয় গণসঙ্গীত হলো- ''এই ঝঞ্চা মোরা রুখবো/এই বন্যা মোরা রুখবো'', ''ও দুনিয়ার মজদুর ভাইসব/ আয় এক মিছিলে দাঁড়া'', ''আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার'', ''কাঁদো বাংলার মানুষ আজিকে কাঁদো''। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *গণসঙ্গীত*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৯১-৯৫।

৫৮. বাংলাদেশের গণসঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নাম শেখ লুতফর রহমান। তিনি প্রচুর গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত কিছু গণসঙ্গীত হলো-

''ওরে ভাইরে ভাই/ বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই'', ''মিলিত প্রাণের কলরবে'', ''বল বীর ! বল চির উন্নত মর শির'', ''ভাত কাপড় ঘর নেই তাই ফেলিস চোখের জল/ স্বাধীন দেশে তোদের তরে কি করি নাই বল'', ''হিংসায় গড়া আজিকার ধরা/ ভরা শুধু হাহাকার'', ''ওঠ দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও/ ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও'', ''রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা'', ''জনতার সংগ্রাম চলবেই'', ''এই আগুন নিভাইবো কেরে/ এ আগুন নেভে নেভে নেভে না'', ''মানবো না বন্ধনে মানবো না'', পায়রার পাখনা/ বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে'', ''বিপ্লবের রক্ত রাঙা/ ঝান্ডা ওড়ে আকাশে'', ''ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'', ''ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে, ছেড়ে দে'' ইত্যাদি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, ঢাকা, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. আবদুল লতিফ একাধারে গীতিকার-সুরকার-শিল্পী। প্রচুর গান রচনা করেছেন। তার লেখা ও সুর দেয়া বিখ্যাত কয়েকটি গণসঙ্গীত হলো- ''ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'', ''রফিক শফিক বরকত নামে/ বাংলা মায়ের দুরন্ত কটি ছেলে'', ''ও আমার এই বাংলা ভাষা/ এ আমার দুখ ভুলানো বুক জুড়ানো/ লক্ষ মনের আশা'', ''প্রতিরোধ প্রতিবাদ সংগ্রাম/ শ্রমিকের বাঁচবার এক নাম'' ইত্যাদি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৫-৯৯।

৬০. নাজিম মাহমুদ খুলনার ''সন্দীপন'' সাংস্কৃতিক সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ''অপরাজেয় ভিয়েতনাম'' শীর্ষক চৌদ্দটি গণসঙ্গীতের অধিকাংশের গীতিকার ছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি প্রচুর গণসঙ্গীত রচনা করেন যা স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাঁর প্রসঙ্গে নাজিম সেলিম বুলবুল লিখেছেন, ''এতদিন এদেশে অনেকটা পল্লীগীতির ধাচে যে গণ-সঙ্গীত চলে আসছিল তার মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন আধুনিক আংগিকে অধিকতর পরিমার্জিত ভাষায় এবং অধিকতর তেজোদৃপ্ততার সাথে বাংলাদেশের গণ-সংগীতের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেন।'' দেখুন, নাজিম সেলিম বুলবুল। *আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে গণ-সংগীতের ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ৯৮।

৬১. শেখ লুতফর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮২।

৬২. করুণাময় গোস্বামী, 'সঙ্গীত', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (৩য় খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৫৪৯।

৬৩. সাক্ষাৎকার ঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ২. ১২. ২০০০।

৬৪. করুণাময় গোস্বামী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪৮।

৬৫. বর্ণিত গানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, নাজিম সেলিম বুলবুল, *প্রাগুক্ত* শেখ লুতফর রহমান *প্রাগুক্ত*।

৬৬. শেখ লুতফর রহমান *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৫-৮৬।

৬৭. ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, লোকবক্তৃতা মালা-৭, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ চেয়েছে একটি সিভিল সমাজ গড়ে তুলতে। আর এই সিভিল সমাজ গড়তে গিয়ে সে বারবার কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। রাষ্ট্র ছিল শক্তিশালী, সমাজ দূর্বল। সিভিল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম দিকে রাজনীতিবিদরাও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। ফলে, সিভিল সমাজের লড়াইয়ে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ কখনও পিছু হটে গেছে, কখনও বলীয়ান হয়ে এগিয়েছে। এর মৌল বৈশিষ্ট্য, হটে যাওয়া বা এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে নষ্ট হয়নি এর সজীবতা, যে কারণে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে অন্তিমে সম্ভব হয়েছে পৃথক রাষ্ট্র গঠনে।[১]

এই সিভিল সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে সংস্কৃতিকর্মীরা। এর মধ্যে লেখক থেকে অ্যাকটিভিস্ট সবাই জড়িত। বাংলাদেশের বিশেষত্ব হলো, একজন সাহিত্যিক, বা একজন শিল্পী শুধু তার সৃজনশীলতা নিয়েই পড়ে থাকেন নি, তাকে আন্দোলনের সাথে জড়িত হতে হয়েছে, হয়েছেন । এ আন্দোলন ছিল গণতন্ত্ররক্ষা, সিভিল সমাজ গড়ে তোলার। একসময়, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সুক্ষ্ম বিভাজনরেখা মিলিয়ে গেছে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর যেমন লিখেছেন, ''সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্রঃ তিনটির মালমশলা মানুষ, আর মানুষ জীবন্ত, চঞ্চল, জটিল। এই মানুষটির ব্যক্তিক এবং পারস্পরিক ভূমিকা নির্ধারিত হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিসরে। সংস্কৃতির মধ্যে এই ভূমিকা কর্মস্থল খুঁজে পায়। সে জন্য সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সামাজিক, রাষ্ট্রিক বিচার ; সে জন্য ব্যক্তিক সাংস্কৃতিক ভূমিকা ও বিচার সামাজিক, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির পরিসরে।''[২]

বাংলাদেশ পাকিস্তানের কলোনী ছিল দু'দশক। আর এ সময় ঢাকাই ছিল এর কেন্দ্র। এবং মুঘল আমল থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা শহরই এ অঞ্চলের কেন্দ্র। ১৯৪৭ থেকে বাংলাদেশের যাবতীয় আন্দোলন তা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন পরিচালিত হয়েছে ঢাকা থেকে এবং তারপর ছড়িয়ে পড়েছে সারা

Dhaka University Institutional Repository

দেশে। একভাবে বলতে গেলে, ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন অন্যকথায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির আগে এক দশক মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদ ও আমলারা শাসন চালিয়েছিল। ধর্মকে সামনে রেখে তাদের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল। তাদের রাজনীতির ধরন ছিল রক্ষণশীল, জনস্বার্থের প্রতিকুল। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা (মুসলিম লীগের বিপরীতে) ১৯৫২, ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সংহত করতে পারেন নি। এসব ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ সময়কালে এসব অর্জনের নির্যাসটি ঘুরে ফিরে সবসময় সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে। আর এই অর্জনগুলি সংহত করার চেষ্টা করেছেন সংস্কৃতি কর্মীরা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যার শুরু ১৯৪৮ থেকে ছিল মূলত একধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনই যা পরিণত হয় প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনে। ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক কর্মীরা কলোনির অধিপত্য প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেছেন। সে সময়টা ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশের সময়কাল।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ ছিল পাকিস্তানের জন্য বন্ধ্যাসময়। এ সময় আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক বেসামরিক আমলা শাসন দৃঢ় ও সংহত হয়। মুসলিম লীগ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। এই কালপর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে সজীবতাহীন। এ সময় ছাত্ররাই প্রধানতঃ সামরিক শাসনের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ঐ পর্বে কেন্দ্রীয় শাসকরা পাকিস্তানবাদ আবারও দৃঢ়ভাবে চাপিয়ে দিতে চায় বাঙালিদের ওপর। বাঙালি সংস্কৃতিকে ইসলামী আদর্শের নামে পাকিস্তানীকরণের প্রচেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী মেতে ওঠে। এর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রধান ভুমিকা পালন করে। বাঙালির সাংস্কৃতিক, জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো সুদৃঢ় হয়। নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে বাঙালি এ সময় তার বিভিন্ন লোকজ উৎসব পালন করতে থাকে। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে, এ অন্চলের সাংস্কৃতিক চেতনা সুনির্দিষ্ট মাত্রা, লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। শাসক শ্রেণীর বাধা উপেক্ষা করে

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক কর্মীরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়, জনগণকে বাঙালি করে তোলে। রাজনীতিবিদরাও পরে তাতে শামিল হন। এ পর্বের মূল বিষয় ছিল বাঙালির শেকড় খোঁজা।

১৯৬৬-৬৯ -এ সময়টি ছিল স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার দাবির সময়। এ সময় বাঙালির মন জয় করে নেন শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার মাধ্যমে। এ সময়কাল শুধু পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্যই নয়, বাঙালি জাতির ইতিহাসের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ঝম্ঝামুখর এ পথে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সুনির্দিষ্ট, সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। ১৯৬৯-এ বাঙালি প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন তাদের বঙ্গবন্ধু।

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছয় দফাই ছিল সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র। এ সময়পর্বে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকাও ছিল অনন্য। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে ওঠে এ সময় আন্দোলনের হাতিয়ার কারণ রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ভাষা সংস্কার করতে চেয়েছিল। লিখেছেন মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, " ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের মধ্যবর্তী কারকরা, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের প্রতিবাদী ভূমিকার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। সিভিল সমাজের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারনা চাপিয়ে দিয়ে তাকে পিছু হটে যাওয়া থেকে তারা প্রতিরোধ করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছে- কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে।"[৩] আসলে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা ঐ সময় পরস্পরকে সমর্থন জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছেন।

এ পর্বে গণসঙ্গীত, নাটক হয়ে উঠেছিলো প্রগতিবাদী লড়াইয়ের হাতিয়ার। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর -এর ভাষা ধার করে বলতে হয় "সংস্কৃতি সর্বত্র, সতত, গেরিলা যোদ্ধার মতন রাষ্ট্রের/সমাজের/স্টাবলিশমেন্টের ভিৎ ধসিয়ে দিতে থাকে .....।"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০-৭১ -এ বাঙালি এগিয়েছে স্বাধীনতার পথে। ছয় দফা ম্যান্ডেট নিয়ে বাঙালির নিরঙ্কুশ সমর্থন পেলেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। এই ছয় দফা ক্রমে পরিণত হয় এক দফায় এবং বাঙালিকে নিয়ে যায় স্বাধীনতার দোরগড়ায়। বাঙালি আর পাকিস্তানের কলোনী হিসেবে পাকিস্তানীদের শাসন/ শোষণ সহ্য করতে রাজী ছিলনা। সংস্কৃতি কর্মীরাও এ সময় হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে গেছেন। এবং যেই রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেই রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' ঐক্যবদ্ধ করে তুললো বাঙালিকে একটি জাতিতে এবং সেই সোনার বাংলা গড়ার যুদ্ধে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে যে প্রতিবাদের শুরু ১৯৭১ সালে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অস্বীকার করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৭১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত- এই ত্রিশ বছরের সময়কালে সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্মকান্ড যদি আমরা বিশ্লেষণ করি ত'হলেও দেখব প্রাক-বাংলাদেশ পর্বের সঙ্গে এর মিল আছে। অর্থাৎ আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল যে বৈশিষ্ট্য তা রয়েই গেছে। রাজনীতিবিদরাও ১৯৭২-২০০০ পর্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনেক সময় হটে গেছেন। কিন্তু সংস্কৃতিকর্মীরা কখনও নিজপথ থেকে পিছু হটেননি। রাজনীতিবিদরা এক সময় নিজ স্বার্থে সমঝোতা করেছেন কিন্তু, সংস্কৃতি কর্মীরা সমঝোতায় যাননি। কোন কোন পর্বে আন্দোলনকে তারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন। সময় বুঝে রাজনীতিবিদরা তাতে যোগ দিয়েছেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন, এদেশে তাই নিছক কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়। রাজনৈতিক অধিকার লক্ষ্যেও এ আন্দোলন হয়েছে। কারণ, এ সত্যটি তারা অনুধাবন করেছিলেন, সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন না থাকলে সজীব সংস্কৃতির বিকাশ হয়না। এদিক থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। সে কারণে বাংলাদেশে রাজনীতি ও সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে একেবারে আলাদাভাবে বিচার করা যায় না। এরা সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশে শুধু সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশ ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ প্রগতি ও গণতন্ত্রায়ণে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ওয়াহিদুল হক যেমনটি লিখেছেন, ''যে রাজনৈতিক লড়াই

Dhaka University Institutional Repository

লড়েছে- সে সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াই লড়েছে, কেবল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নয়।''[৫] সে কারণেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন এদেশে পেয়েছে অন্য মাত্রা।

তথ্যপঞ্জী

১. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৯।

২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সংস্কৃতি সর্বত্র, সতত', *মুক্ত করো হে বন্ধ*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ১৮।

৩. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭।

৪. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৯।

৫. ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, লোকবক্তৃতামালা-৭, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ১

ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটকের তালিকা ১৯৪৮-১৯৭১

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৪৮ ১৪ এপ্রিল	১.	বিশ বছর আগে	বিধায়ক ভট্টাচার্য	ফজলুল হক ছাত্র সংসদ
১৯৪৮ ২৫ এপ্রিল	২.	সিঁথির সিঁদুর	জলধর চট্টপাধ্যায়	ঢাকা হল সংসদ
১৯৪৮ ১-২জুলাই	৩.	কালিন্দী	তারাশঙ্কর বদ্যোপাধ্যায়	ঢাকা বিশ্বঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষ	৪.	দীপান্তর	ঐ	জগন্নাথ হল সংসদ
১৯৪৮	৫.	টিপু সুলতান	মহেন্দ্র গুপ্ত	মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব
১৯৪৯	৬.	উদয়নালা	গোলাম রহমান	-
১৯৪৯ ৪-৫ ফেব্রুয়ারী	৭.	ভোলা মাস্টার	আয়স্কান্ত বক্সী	উয়ারী ইয়ং ড্রামাটিক এসোসিয়েশন
১৯৪৯ ২২ ফেব্রুয়ারী	৮.	The Tragical Hist. of Dr. Faustus	-	ঢাকা বিশ্বঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৪৯ ১৭ মার্চ	৯.	টিপু সুলতান	মহেন্দ্র গুপ্ত	কলমা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়
১৯৪৯ ৪ঠা এপ্রিল	১০.	ঐ	ঐ	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্র সংসদ
১৯৪৯ ২৪-২৫ মে	১১.	হায়দার আলী	-	স্বামীবাগ নাট্য সমিতি
১৯৪৯ ১৪ আগস্ট	১২.	পথের শেষে	নিসিকান্ত বসুরায়	কমলাপুর এমেচার আর্টিস্ট এসোসিয়েশন
১৯৪৯ ১৪ আগস্ট	১৩.	আজাদীর পর	মহাম্মদ সোলায়মান	প্রগতি সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৪৯	১৪.	সিরাজের স্বপ্ন	-	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯	১৫.	ইউরেকা	সৈয়দ মকসুদ আলী	ঢাকা বিশ্বঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
২০ ডিসেম্বর ১৯৪৯	১৬.	সার্বজনীন শোকসভা	সুশীল চন্দ্র দাস	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
১৯৫০	১৭.	বিরোধ	আসকার ইবনে শাইখ	-
১০-১১ এপ্রিল ১৯৫০	১৮.	শেষরক্ষা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঢাকা বিশ্বঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫০	১৯.	টিপু সুলতান	মহেন্দ্র গুপ্ত	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
১৬ জানুয়ারী ১৯৫১	২০.	রাজ-রাজড়া	ফররুখ আহমদ	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
১৯৫১ ২৬ মে	২১.	মৃত্যু ক্ষুধা	কাজী নজরুল ইসলাম	তমদ্দুন মজলিশ
১৯৫১ ৪ঠা জুন	২২.	বিজয়া	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ডক্টরস ক্লাব
১৯৫০ ২৫ এপ্রিল	২৩.	নূরজাহান	-	মোহাজের আর্টিস্ট এসোসিয়েশন
১৯৫০ ১২ এপ্রিল	২৪.	ওথেলো	শেক্সপীয়ার	ঢাকা বিশ্বঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
২-৪ আগস্ট ১৯৫১	২৫.	দুই পরুষ	-	রূপশ্রী
৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫১	২৬.	জবান বন্দী	বিজন ভট্টাচার্য	সংস্কৃতি সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
৮-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫১	২৭.	পদক্ষেপ	আসকার ইবনে শাইখ	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
৫ জানুয়ারী ১৯৫২	২৮.	সিরাজদ্দৌলা	সিকাদার আবু জাফর	শাবিস্তান
১১-১৩ জানুয়ারী ১৯৫২	২৯.	রীতিমত নাটক	-	-
২৭-২৮ মার্চ ১৯৫২	৩০.	মানময়ী গার্লস স্কুল	-	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ডক্টরস ক্লাব
২৮-২৯ মে ১৯৫২	৩১.	দীপান্তর	তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ডক্টরস ক্লাব
২৪ মে ১৯৫২	৩২.	মাটি ঘর	বিধায়ক ভট্টাচার্য	অগ্রদূত নাট্যসংঘ
১৯৫২	৩৩.	নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	ঢাকা বিশ্বঃ ফজলুল হক হল ইউনিয়ন
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫২	৩৪.	মাটির ঘর	বিধায়ক ভট্টাচার্য	জগন্নাথ কলেজ
২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২	৩৫.	মার্চেন্ট অব ভেনিস	শেক্সপীয়ার	জগন্নাথ কলেজ
২১ আগস্ট ১৯৫২	৩৬.	তরঙ্গ	দিনিন্দ্র বন্দ্যোঃ	ঢাকা কলেজ ছাত্র-শিক্ষক
১৯৫২	৩৭.	সুমতি	আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম	সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল নাট্য সংঘ
১৯৫২	৩৮.	ভোট ভিখারী	আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম	সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল নাট্য সংঘ
অক্টোবর ১৯৫২	৩৯.	মেঘদূত	-	শিশু রক্ষা কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
৮ডিসেম্বর ১৯৫২	৪০.	নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	পূর্ববঙ্গ সাংবাদিক ইউনিয়ন
১৯৫২	৪১.	Is Law An Ass	অধ্যাপক নূরুল মোমেন	ঢাকা বিশ্ব কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৫২	৪২.	নার্সিং হোম	-	হাবিব প্রোডাকসন্স
১৯৫২	৪৩.	মেঘমুক্তি	-	হাবিব প্রোডাকসন্স
১৯৫২	৪৪.	কালিন্দী	-	হাবিব প্রোডাকসন্স
১৯৫৩	৪৫.	ঈশা খাঁ	আবদুল জব্বার	কমলাপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন
৮-৯ জনুয়ারী ১৯৫৩	৪৬.	অবরোধ	বিজন ভট্টাচার্য	-
জানুয়ারী ১৯৫৩	৪৭.	পোষ্যপুত্র	অনুরূপা দেবী	কৃষ্টি সংঘ
১৯৫৩ ২২-২৩ জানুঃ	৪৮.	পথিক	তুলসী লাহিড়ী	সংস্কৃতি সংসদ
১৯৫৩ ফেব্রুঃ	৪৯.	মন্ত্রমুগ্ধ	বনফুল	রূপ ও বাণী
১৯৫৩ ৪-৭ ফেব্রুঃ	৫০.	পোড়োবাড়ী	আলী মনসুর	কৃষ্টি সংঘ
২১ ফেব্রুঃ ১৯৫৩	৫১.	কবর	মুনীর চৌধুরী	কমিউনিস্ট রাজবন্দীগণ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৩ ২৫-২৬ ফেব্রুঃ	৫২.	টিপু সুলতান	-	পূবালী শিল্পী সংসদ
১৯৫৩ ৬-৭ মে	৫৩.	মাটির মানুষ	এস.এম. হাবিবুর রহমান	হাবিব প্রোডাকসন্স
১৯৫৩ ১৩-১৪ মে	৫৪.	কালিন্দী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	ঐ
১৯৫৩	৫৫.	তাইতো	বিধায়ক ভট্টাচার্য	বার্মাশেল রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯৫৩ ১৮ সেপ্টেঃ	৫৬.	একান্নবর্তী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
১৯৫৩ সেপ্টেঃ	৫৭.	ডাকঘর	ঐ	সেন্টগ্রেগরী কলেজ ছাত্র সংসদ
১৯৫৩ ২৪-২৫ সেপ্টেঃ	৫৮.	চিরকুমার সভা	ঐ	ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
১৯৫৩ সেপ্টেঃ	৫৯.	বন্ধু	শরদিন্দু বন্দ্যোঃ	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
১৯৫৩ ১-২ নভেঃ	৬০.	রাণী ভবানী	মহেন্দ্র গুপ্ত	নবারুন সমিতি
১৯৫৩ ৭-৮ নভেঃ	৬১.	সংঘর্ষ	খানবাহাদুর আমিনুল হক	পাকিস্তান এম্বুলেন্স কোর
১৯৫৩ ১৬ ডিসেঃ	৬২.	বিদ্রোহী পদ্মা	আসকার ইবনে শাইখ	তরুন সমিতি
১৯৫৩ ২-৩ ডিসেঃ	৬৩.	পথের শেষে	নিশিকান্ত বসুরায়	মাহবুব আলী ইন্সটিঃ
১৯৫৩	৬৪.	বিদ্রোহী পদ্মা	আসকার ইবনে শাইখ	-
১৯৫৩	৬৫.	প্লাবন	মনোজ বসু	-
২৪-২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৩	৬৬.	সিরাজদ্দৌলা	-	ঢাকা ক্রিকেট ক্লাব

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৩ ডিসেম্বর	৬৭.	নার্সিং হোম	-	হাবিব প্রোডাকসন্স
১৯৫৩ ডিসেম্বর	৬৮.	শপথ	আনিস চৌধুরী	-
১৯৫৪ জানুঃ	৬৯.	স্মাগলার	কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস	চারুকলা সংসদ
১৯৫৪ ২২-২৩ জানুঃ	৭০.	হায়দার আলী	-	আলী রেজা তরুণ সংঘ
১৯৫৪ জানুঃ	৭১.	চন্দ্রগুপ্ত	ডি. এল. রায়	মালাকার টোলা ড্রামাটিক ক্লাব
১৯৫৪	৭২.	কবয়ঃ	বনফুল	ঢাঃবিঃ এর বাংলা বিভাগ
১৯৫৪ জানুঃ	৭৩.	মেঘনাদবধ	মাইকেল মদুসূদন	ঐ
৪-৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪	৭৪.	মিসর কুমারী	-	ইউনাইটেড এসোসিয়েশন
১৯৫৪ ফেব্রুঃ	৭৫.	কর্ণাজুন	-	রামকৃষ্ণ মিশন
১৯৫৪	৭৬.	তাইতো	বিধায়ক ভট্টাচার্য	উয়ারী সংসদ
মার্চ ১৯৫৪	৭৭.	পর্ণশালা	-	ঢাকা গ্রাজুয়েট হাইস্কুল
১৯৫৪ ১০-১১ এপ্রিল	৭৮.	প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	ফায়ারম্যান এসোসিয়েশন
১৯৫৪ ২২-২৩ এপ্রিল	৭৯.	প্রানের দাবী	জলধর চট্টোঃ	পাক মডার্ন থিয়েটার

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৪ ২৯-৩০ এপ্রিল	৮০.	সোনার বাংলা	মহেন্দ্রগুপ্ত	খেয়ালী চক্র
১৯৫৪ ২৯ এপ্রিল	৮১.	পুত্র স্নেহ	মঞ্জুর মোর্শেদ	ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ
১৯৫৪ ৩ মে	৮২.	বাসবদত্তা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি
১৯৫৪ ১১ জুন	৮৩.	চিকিৎসা বিভ্রাট	পরশুরাম	ইয়ং ক্লাব
১৯৫৪ ১৪ জুলাই	৮৪.	ঘটকালী	এনায়েত মওলা	পূর্ব পাক আর্টিস্ট এসোসিয়েশন
১৯৫৪ সেপ্টেঃ	৮৫.	রক্তের ডাক	বিধায়ক ভট্টাচার্য	-
১৯৫৪ সেপ্টেঃ	৮৬.	তাজমহল	ফজলুর রহমান	-
১৯৫৪ ৯-১০ ডিসেঃ	৮৭.	ষোড়শী	শরৎচন্দ্র চট্টোঃ	আধুনিক শিল্পী সংঘ
১৯৫৪ ৯-১০ ডিসেঃ	৮৮.	বেদের মেয়ে	জসীম উদ্দিন	পূর্ব পাকিঃ ছাত্রী সংসদ
১৯৫৪ ২০ ডিসেঃ	৮৯.	মঞ্চে গ্রাম	আসকার ইবনে শাইখ	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ (ঢাঃ বিঃ)
১৯৫৪ ৩১ ডিসেঃ	৯০.	তাইতো	বিধায়ক ভট্টাঃ	সীমান্ত গ্রন্থাগার
১৯৫৫ ১১-১২ জানুঃ	৯১.	কালিন্দী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	মেডিকেল স্কুল
১৯৫৫ ২২ জানুঃ	৯২.	উদয়নালা	এম. গোলাম রহমান	তেজগাঁও ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৫ জানুঃ	৯৩.	কেউ কিছু বলতে পারে না	বার্নাড'শ অনুবাদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী	ঢাঃবিঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৫৫	৯৪.	কবয়ঃ	বনফুল	ঐ
১৯৫৫	৯৫.	মানচিত্র	আনিস চৌধুরী	ঐ
১৯৫৫	৯৬.	পরিহাস বিজল্পিওম	প্রমথনাথ বিশী	ঐ
১৯৫৫	৯৭.	বেদের মেয়ে	জসীমউদ্দীন	এ্যাডফা
১৯৫৫ ৬ ফেব্রুঃ	৯৮.	বন্ধু	শরদিন্দু বন্দ্যোঃ	ইস্টবেঙ্গল টেক্সটাইল ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৫ ৭ ফেব্রুঃ	৯৯.	বিদ্রোহী পদ্মা	আসকার ইবনে শাইখ	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৫৫ ২২ এপ্রিল	১০০.	প্রতিজ্ঞা	আবদুল জব্বার খান	কমলাপুর ছাত্র সংঘ
১৯৫৫ ২২ এপ্রিল	১০১.	সুবেদার	আলী মনসুর	কমলাপুর ছাত্র সংঘ
১৯৫৫ ৬ ও ৮মে	১০২.	লাল পাঞ্জা	শরদিন্দু বন্দ্যোঃ	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল কমনরুম কমিটি
১৯৫৫ ২৮মে	১০৩.	মন্ত্রমুগ্ধ	বনফুল	কপোত সংঘ
ঐ	১০৪.	শহীদ সিরাজ	নেজামতুল্লাহ	ড্রামাটিক ক্লাব
২৩-২৪ জুলাই ১৯৫৫	১০৫.	বঙ্গেবর্গী	-	মাহবুব আলী ইন্সঃ
১৯৫৫	১০৬.	বিরোধ	আসকার ইবনে শাইখ	ইস্টার্ণ কালচারাল এসোসিয়েশন
৮-৯ অক্টোঃ ১৯৫৫	১০৭.	দুই পরুষ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ (ঢাঃবিঃ)
১৫ অক্টোঃ ১৯৫৫	১০৮.	উল্কা	ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত	বার্মাশেল রিক্রিয়েশন ক্লাব
২১-২২ অক্টোঃ ১৯৫৫	১০৯.	উদয়নালা	এম. গোলাম রহমান	মগবাজার তরুণ সংঘ
১৯৫৫	১১০.	ছোট মা	শাহাদাত আলী খান	ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৬ জানুঃ	১১১.	তাসের দেশ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হযবরল সংস্থা
ফেব্রুঃ ১৯৫৬	১১২.	আত্মদান	এস. এম. আবদুল জব্বার	কমলাপুর জয়ন্তী পরিষদ
১২ ফেব্রুঃ ১৯৫৬	১১৩.	নীল-দর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	ঢাঃবিঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১০ এপ্রিল ১৯৫৬	১১৪.	পোড়োবাড়ী	আলী মনসুর	কৃষ্টি সংঘ ও কমলাপুর সাংস্কৃতিক সংসদ
১৯৫৬	১১৫.	তাইতো	বিধায়ক ভট্টাঃ	পূর্বঃ পাকিঃ মেডিকেল এসোসিয়েশন
১৯৫৬	১১৬.	বিদ্রোহী পদ্মা	আসকার ইবনে শাইখ	ইকবাল হল ইউনিয়ন (ঢাঃ বিঃ)
১৯৫৬	১১৭.	পোড়োবাড়ী	আলী মনসুর	রায়ের বাজার যুব সমাজ
১৬ মে ১৯৫৬	১১৮.	মনের কথা	-	নতুন সংস্কৃতি সংসদ
১৮ জুন ১৯৫৬	১১৯.	ছন্নছাড়া	-	-
১৯৫৬	১২০.	কাঁকর মণি	শওকত ওসমান	পুর্ববঙ্গ কৃষি কলেজ সংসদ
১৯৫৬	১২১.	সিরাজদ্দৌলা	শচীন সেনগুপ্ত	সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুল ছাত্র সংসদ
১৯৫৬	১২২.	ওঝার ঘাড়ে বোঝা	বানীকুমার	গ্রন্থবিতান ছাত্র সংঘ
মে ১৯৫৬	১২৩.	উল্কা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	আমিনবাগ মুসলিম ইন্সঃ
১৯৫৬	১২৪.	আগামী দিনের প্রতীক্ষা	আসকার ইবনে শাইখ	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ (ঢাঃ বিঃ)
১৯৫৬ আগষ্ট	১২৫.	ভদ্দর লোক	বেগম নুরুন্নাহার	মহাখালী যক্ষা হাসপাতাল কর্মচারী
১৯৫৬	১২৬.	মানচিত্র	আনিস চৌধুরী	ঢাঃবিঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৫৬	১২৭.	শতাব্দীর কঙ্কাল	মোমেন খান	উদয়ন শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৫৬ ১২ সেপ্টেঃ	১২৮.	নবান্ন	বিজন ভট্টাঃ	সংস্কৃতি সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
২৪ সেপ্টেঃ ১৯৫৬	১২৯.	কবয়ঃ	বনফুল	ঢাঃবিঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
২৫ সেপ্টেঃ ১৯৫৬	১৩০.	কেউ কিছু বলতে পারেনা	মুনীর চৌধুরী (অনুবাদ)	ঢাঃবিঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
২৬ সেপ্টেঃ ১৯৫৬	১৩১.	পরিহাস বিজল্পিতম	প্রমথনাথ বিশী	ঢাঃবিঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৫৬ ২রা অক্টোঃ	১৩২.	দীপান্তর	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	ঢাঃ বিঃ সলিমুল্লাহ মুসঃ হল সংসদ
১৯৫৬ ২৭-২৯ সেপ্টেঃ	১৩৩.	শিল্পী	কান্তিধর	চতুরঙ্গ শিল্পী সংসদ
১৯৫৬ ২৭-২৮ সেপ্টেঃ	১৩৪.	রীতিমত নাটক	জলধর চট্টোঃ	ফজলুল হক মুসলিম হল
১৯৫৬	১৩৫.	গড়ছে যারা জীবন	মেহেরুন্নেসা	ভিলেজ এইড ইনস্টিটিউট ছাত্রীবৃন্দ
১৯৫৬ ৬ সেপ্টেঃ	১৩৬.	পদক্ষেপ	আসকার ইবনে শাইখ	পূর্ববঙ্গ কৃষি বিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৬ ১৫-১৭ সেপ্টেঃ	১৩৭.	বন্দী	শৈলজানন্দ	শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৫৬ সেপ্টেঃ	১৩৮.	চিকিৎসা বিভ্রাট	পরশুরাম	কমলাপুর কল্যাণ সমিতি
ঐ	১৩৯.	প্রতিজ্ঞা	আবদুল জব্বার খান	সলিমুল্লাহ হল নৈশ বিদ্যালয় ছাত্র দল (ঢাঃবিঃ)
১৯৫৬ ২ অক্টোঃ	১৪০.	দীপান্তর	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদ (ঢাঃবিঃ)
১৯৫৬ ৩-৪ অক্টোঃ	১৪১.	পথের ডাক	ঐ	ঢাকা কলেজ ছাত্র পরিষদ
১৯৫৬	১৪২.	মুক্তিপথে	গোপীপদ চট্টোঃ	নবকুমার ইনস্টিটিউটশন
১৯ অক্টোঃ ১৯৫৬	১৪৩.	আড্ডা	নূরুল ইসলাম	নামহীন সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৬	১৪৪.	হায়দার আলী	মহেন্দ্রগুপ্ত	পূর্ব পাকিঃ লেদার টেকনোলজী ইনস্টিটিউট ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৬ ২০ অক্টোঃ	১৪৫.	ঋণ পরিশোধ	ইব্রাহিম খাঁ	কায়েতটুলী শিল্পী সংঘ
১৯৫৬	১৪৬.	পরিণীতা	শরৎচন্দ্র চট্টোঃ	জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদ
১৯৫৬	১৪৭.	রাহুমুক্তি	শহিদুল আমিন	নাসো
১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৬	১৪৮.	চকমকি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	ইস্ট এন্ড ক্লাব
১৯৫৬ ডিসেম্বর	১৪৯.	পুনর্জন্ম	ডি. এল. রায়	মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতাল
১৯-২০ ডিসেম্বর ১৯৫৬	১৫০.	সংগ্রাম ও শান্তি	শাচীন সেনগুপ্ত	-
২৩ ডিসেঃ ১৯৫৬	১৫১.	কালিন্দী	তারাশঙ্কর বন্দ্যো	পূর্বাচল প্রগতি সংঘ
১৯৫৭ জানুঃ	১৫২.	আমরা সবাই ভাই ভাই	নুরুল মোমেন	ঢাঃ বিঃ
১৯৫৭ জানুঃ	১৫৩.	বঙ্গে বর্গী	নিশিকান্ত বসুরায়	ডেভকো স্টাফ ক্লাব
১৯৫৭	১৫৪.	অতিথি	সুবোধ বসু	ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ
১৯৫৭	১৫৫.	পি ডব্লিউ ডি	জলধর চট্টোঃ	মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট
১৯৫৭	১৫৬.	দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোঃ	কেন্দ্রীয় নাট্য সংসদ
১৯৫৭ মার্চ	১৫৭.	উল্কা	-	আহসানউল্লাহ কারিগরী মহাবিদ্যালয়
১৯৫৭ মার্চ	১৫৮.	সিরাজের স্বপ্ন	-	-
১৯৫৭ মার্চ	১৫৯.	কেরানীর জীবন	ছবি বন্দ্যোঃ	-

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৭	১৬০.	বিশ বছর আগে	বিধায়ক ভট্টা	-
১৯৫৭	১৬১.	ঘরের বৌ	গোলাম রসুল	নবনাট্য পরিষদ
১৯৫৭ ১৮ মে	১৬২.	রমা	শরৎচন্দ্র চট্টোঃ	শাহজাহানপুর ছাত্র সংঘ
১৯৫৭	১৬৩.	বিরোধ	আসকার ইবনে শাইখ	ইস্ট পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিঃ ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৭	১৬৪.	কার ভুলে	আবদুর রহিম আখন্দ	নীলক্ষেত নাটক সাব কমিটি
১৯৫৭ মে	১৬৫.	প্রতিশোধ	মীর নূরুল ইসলাম	নামহীন সংঘ
১৯৫৭	১৬৬.	সাজাহান	ডি. এল. রায়	পূর্ব পাক সরকারি প্রেস কর্মচারী
১৯৫৭	১৬৭.	সমানে সমানে	খান বাহাদুর আমিনুল হক	পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স
১৯৫৭ ১৩-১৪ সেপ্টেঃ	১৬৮.	এরাও মানুষ	সন্তোষ সেন	মিলন শিল্পী সংঘ
১৯৫৭ ২২-২৩ সেপ্টেঃ	১৬৯.	মাটির ঘর	বিধায়ক ভট্টাঃ	ঢাকা কলেজ ছাত্র পরিষদ
১৯৫৭	১৭০.	চিকিৎসা সংকট	পরশু রাম	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ
১ নভেম্বর ১৯৫৭	১৭১.	বিংশ শতাব্দী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়ন
নভেম্বর ১৯৫৭	১৭২.	রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঢাঃবিঃ ছাত্রী হল কর্ম পরিষদ
নভেম্বর ১৯৫৭	১৭৩.	উল্কা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	মাহবুল আলী ইন্সঃ নাট্য বিভাগ
নভেম্বর ১৯৫৭	১৭৪.	অগ্নিগিরি	আসকার ইবনে শাইখ	ইকবাল হল ইউনিয়ন
৭-৮ ডিসেম্বর ১৯৫৭	১৭৫.	উপেক্ষিতা	খলিল আহমেদ	দেশরক্ষা সপ্তাহ কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৭	১৭৬.	ঋণং কৃত্বা	প্রমথনাথ বিশী	পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন
ডিসেম্বর ১৯৫৭	১৭৭.	গণশার বিয়ে	বিভুতি ভুষণ বন্দ্যোঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৮	১৭৮.	আজকাল	ভানু চট্টোঃ	ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
১৯৫৮	১৭৯.	ভাড়াটে চাই	-	ইডেন কলেজ ছাত্রী ইউনিয়ন
জনুয়ারী ১৯৫৮	১৮০.	বিসর্জন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংস্কৃতি সংসদ
১৯৫৮	১৮১.	প্রত্যাখান	গোলাম রসুল	নবনাট্য পরিষদ
১৯৫৮	১৮২.	বোবা মানুষ	আলী মনসুর	কৃষ্টি সংঘ
১৯৫৮	১৮৩.	স্মাগলার	কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস	প্রগতি কলা নিকেতন
১৯৫৮	১৮৪.	কবয়ঃ	বনফুল	গোপীবাগ ছাত্র সংসদ
মার্চ ১৯৫৮	১৮৫.	ক্ষুধা	বিধায়ক ভট্টাঃ	প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়
৪-৫ এপ্রিল ১৯৫৮	১৮৬.	রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড্রামা সার্কল
১৯৫৮	১৮৭.	চকমকি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	কায়েদটুলী.... আর্ট কাউন্সিল
১৯৫৮	১৮৮.	খুনি	-	রূপায়ন নাট্যসংসদ
১১৫৮	১৮৯.	পরিণাম	ডাঃ এস. আহমেদ	মিডফোর্ট হাসপাতাল ড্রামাটিক এসোসিয়েশন
১৯৫৮	১৯০.	রাত্রিশেষ	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	শিল্পীচক্র
আগষ্ট ১৯৫৮	১৯১.	পথের শেষে	নিশিকান্ত বসুরায়	ঢাকা টেলিফোন ক্লাব
আগষ্ট ১৯৫৮	১৯২.	প্রত্যাবর্তন	প্রশান্ত চৌধুরী	-

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
আগষ্ট ১৯৫৮	১৯৩.	সিঁথির সিঁদুর	জলধর চট্টোঃ	ফেন্ডস সার্কেল
১৯৫৮	১৯৪.	আগামী দিন	নূর আহমদ	রূপায়ণ নাট্য সংসদ
১৯৫৮	১৯৫.	শেষ অধ্যায়	আসকার ইবনে শাইখ	ঢাঃ বিঃ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়ন
১৯-২০ সেপ্টেঃ ১৯৫৮	১৯৬.	মায়ামৃগ	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	পুবালী শিল্পী সংসদ
সেপ্টেঃ ১৯৫৮	১৯৭.	ভোলা মাস্টার	-	ঢাকা ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৮	১৯৮.	দুই পুরুষ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	ঢাকা হাইকোর্ট কর্মচারীবৃন্দ
১৯৫৮	১৯৯.	একটুকরো জমি	-	শিখা নাট্য সংঘ
১৯৫৮ সেপ্টেঃ	২০০.	পোড়োবাড়ী	আলি মনসুর	ধানমন্ডী পিপলস এসোসিয়েশন
১৯৫৮	২০১.	পলাশীর পরে	সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোঃ	ইলেকট্রিক ক্লাব
১৯৫৮	২০২.	বোবা মানুষ	আলি মনসুর	ফরাশগঞ্জ নজরুল সংঘ
অক্টোবর ১৯৫৮	২০৩.	ঘূর্ণি	গৌরী সেন	-
১৯৫৮	২০৪.	নাটক নয় সত্যি	শহীদুল আমিন	ন্যাশো থিয়েটার
১৯৫৮	২০৫.	সোজন বাদিয়ার ঘাট	জসিম উদ্দীন	শিল্পী ও শিল্পী পরিষদ
১৯৫৮	২০৬.	ভুল	শাহাদাৎ আলী খান	মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ
১৯৫৮	২০৭.	ধূপছায়া	--	পাকিস্তান মেডিকেল সমিতি
১৯৫৮	২০৮.	অনুবর্তন	আসকার ইবনে শাইখ	ইকবাল হল ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৯	২০৯.	নক্সীকাঁথার মাঠ	জসিমউদ্দিন	বুলবুল ললিতকলা একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৯	২১০.	মাটির মানুষ	--	প্রভাত শিল্পী সংসদ
১৯৫৯	২১১.	টিপু সুলতান	--	ঢাকা ইলেকট্রিক ক্লাব
১৯৫৯	২১২.	মধ্যবিত্ত	বনফুল	জগন্নাথ কলেজ হল ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৫৯	২১৩.	দীপান্তর	"	পৌরসভা সাংস্কৃতিক সংসদ
১৯৫৯	২১৪.	মীর কাসিম	-	রাজারবাগ পুলিশ
১৯৫৯	২১৫.	হায়দার আলী	-	ইউনাইটেড ক্লাব
১৯৫৯	২১৬.	আমরাও মানুষ	-	পাকিস্তান ইয়ুথ কাউন্সিল
১৯৫৯	২১৭.	প্রতিশ্রুতি	--	ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন
১৯৫৯	২১৮.	পোড়োবাড়ী	আলী মনসুর	মালিবাগ যুবসংঘ
১৯৫৯	২১৯.	কার ভুলে	--	কল্লোল গোষ্ঠী
১৯৫৯	২২০.	রাজধানী থেকে	--	আহসান উল্লাহ প্রকৌশল কলেজ
১৯৫৯	২২১.	অতি অভিনয়	প্রমথনাথ বিশি অনূদিত	শাজাহানপুর উদয়ন ক্লাব
১৯৫৯	২২২.	কবর	আবু খোরশেদ শিকদার	শাজাহানপুর উদয়ন ক্লাব
১৯৫৯	২২৩.	স্বপ্নভঙ্গ	--	নবনাট্য পরিষদ
১৯৫৯	২২৪.	ঝড়ের পরে	কাজী গোলাম আকবর	ডাক ও তার সংস্কৃতি বিভাগ
১৯৫৯	২২৫.	পথের শেষে	--	ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ
১৯৫৯	২২৬.	গোধূলির রং	--	শিল্প ও সংস্কৃতি পরিষদ
১৯৫৯	২২৭.	গাঁয়ের বধূ	এস এম হাবিবুর রহমান	ডোনার্টস্
১৯৫৯	২২৮.	এইতো সমাজ	--	মিনার্ভা থিয়েটার

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৫৯	২২৯.	এরাও মানুষ	--	ক্যাথলিক শিল্পী সম্প্রদায়
১৯৫৯	২৩০.	স্মাগলার	কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ
১৯৫৯	২৩১.	তাইতো	--	ঢাঃ বিঃ ছাত্রী হল ইউনিয়ন
১৯৫৯	২৩২.	বিরাজ বৌ	শরৎ	শিল্পী ও মঞ্চ
১৯৫৯	২৩৩.	রূপান্তর	--	রূপ ও নাট্য সংঘ
১৯৫৯	২৩৪.	মহুয়া	--	ঢাকা টেলি-কমিউনিকেশন কালচারাল এসোসিয়েশন
১৯৫৯	২৩৫.	মানময়ী গার্লস স্কুল	--	বার্মাশেল রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯৫৯	২৩৬.	কিন্তু কেন	--	এ.জি.ই.পি কর্মচারী সংস্থা
১৯৫৯	২৩৭.	রূপর কৌটা	মুনীর চৌধুরী অনুদিত	ঢাঃ বিঃ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
১৯৫৯	২৩৮.	রূপান্তর	--	কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ, ঢাঃ বিঃ
১৯৫৯	২৩৯.	ভাই ভাই সবাই	--	ঐ
১৯৫৯	২৪০.	সবাই আমার ছেলে	আর্থার মিলার	ড্রামা সার্কল
১৯৫৯	২৪১.	ভাড়াটে চাই	--	ঢাকা নটরডেম কলেজ
১৯৫৯	২৪২.	মমতাময়ী হাসপাতাল	--	নিউ ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব
১৯৫৯	২৪৩.	ঝড়ের পাখী	অজিজ মেহের	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
১৯৬০	২৪৪.	এই পার্কে	উয়ারী বয়েজ ক্লাব	ওয়ারী বয়েজ ক্লাব
১৯৬০	২৪৫.	জবাবদিহি	-	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাব

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬০	২৪৬.	প্রতিশ্রুতি	কাজী শফিকুর রহমান	নবকেতন সংস্থা
১৯৬০	২৪৭.	পোড়োবাড়ী	আলী মনসুর	সুর ও শিল্পী
১৯৬০	২৪৮.	নতুন দিনের আলো	--	-
১৯৬০	২৪৯.	পতিব্রতা	--	ঢাকা মধুচক্র সংস্থা
১৯৬০	২৫০.	মুখপ্যাক এন্টারপ্রাইজ	--	ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল সাউথ ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৬০	২৫১.	ফিরোজ শাহ	এম গোলাম রহমান	ঢাকা হল নৈশ বিদ্যালয়
১৯৬০	২৫২.	অনুবর্তন	আশকার ইবনে শাইখ	টেক্সটাইল হোস্টেল ছাত্র সংস্থা
১৯৬০	২৫৩.	দুই পুরুষ	--	পূবালী শিল্পী সংসদ
১৯৬০	২৫৪.	ভুলের মাশুল	--	মটর ড্রাইভিং এন্ড টেনিং স্কুল
১৯৬০	২৫৫.	এও হয়	--	নব জাগরণী সমিতি
১৯৬০	২৫৬.	মায়ামৃগ	--	ঢাকা থিয়েটারর্স
১৯৬০	২৫৭.	সয়লাব	--	ফজলুল হক ইউনিয়ন
১৯৬০	২৫৮.	তাইতো	--	গোপীবাগ মহিলা সমিতি
১৯৬০	২৫৯.	ঝড়	--	ইসলামপুর ন্যাশনাল ড্রামাটিক ক্লাব
১৯৬০	২৬০.	এক পেয়ালা কফি	--	বৈকালী ড্রামাটিক এসোসিয়েশন
১৯৬০	২৬১.	দায়ী কে	--	প্রান্তিক নাট্য পরিষদ
১৯৬০	২৬২.	ঈসা খাঁ	--	প্রভাতী শিল্পী সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬০	২৬৩.	ডাকঘর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পোগোজ স্কুল
১৯৬০	২৬৪.	বিছু ডাকে	অনিল চট্টোঃ	জগন্নাথ হল ছাত্র ইউনিয়ন
১৯৬০	২৬৫.	বন্ধু	--	পৌরসভা সাংস্কৃতিক সংসদ
১৯৬০	২৬৬.	বিচার	--	লিটল থ্রেড্রস এসোসিয়েশন
১৯৬০	২৬৭.	বিশ বছর আগে	--	নবনাট্য পরিষদ
১৯৬০	২৬৮.	জাহাঙ্গীর	--	ইস্টার্ণ কালচারাল সেন্টার
১৯৬০	২৬৯.	গ্রামের মায়া	--	ভি-এইড ট্রেনিং ইন্সঃ
১৯৬০	২৭০.	মমতাময়ী হসপাতাল	--	বৈকালী গোষ্ঠী
১৯৬০	২৭১.	ঘটকালী	--	পাবনা সমিতি
১৯৬০	২৭২.	রাঙারাখী	--	সদর ঘাট বি ও সি স্টাফ ক্লাব
১৯৬০	২৭৩.	ভাড়াটে চাই	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	বাণী বভন ছাত্রাবাস
১৯৬০	২৭৪.	দীপান্তর	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	জাগরণী সংস্থা
১৯৬০	২৭৫.	বন্ধু	--	গেন্ডারিয়া কমিউনিটি সেন্টার
১৯৬০	২৭৬.	বিশ বছর আগে	--	"
১৯৬০	২৭৭.	গাঁয়ের বধু	--	মিনার্ভা থিয়েটারর্স
১৯৬০	২৭৮.	মাটির মানুষ	--	অগ্রদূত শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৬০	২৭৯.	কর্ম্মফল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিদ্যাথিনী ভবন ছাত্রীবৃন্দ
১৯৬০	২৮০.	আর্দশ বিদ্যালয়	--	আজাদ বয়েজ ক্লাব
১৯৬০	২৮১.	ব্যক্তিগত	--	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬০	২৮২.	মানচিত্র	আনিস চৌধুরী	পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সপ্তাহ তমদ্দুন শাখা
১৯৬১	২৮৩.	বহিপীর	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	ড্রামা সার্কল
১৯৬১	২৮৪.	রূপালী চাঁদ	--	পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন
১৯৬১	২৮৫.	যদি এমন হোত	নুরুল মোমেন	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ
১৯৬১	২৮৬.	পিডব্লিউডি	--	ইলেকট্রিক সাপ্লাই ক্লাব
১৯৬১	২৮৭.	ভোর হল	--	নবকেতন সংস্থা
১৯৬১	২৮৮.	পরিনীতা	শরৎ চন্দ্র	বাণী রূপা
১৯৬১	২৮৯.	মমতাময়ী হাসপাতাল	--	প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়
১৯৬১	২৯০.	দূর্নিবার	আলী মনসুর	--
১৯৬১	২৯১.	আবর্ত	রাজিয়া খান	জাতীয় সমাজ সাংস্কৃতিক সংঘ
১৯৬১	২৯২.	বিশ বছর আগে	--	ঢাকা স্টেট ব্যাংক স্টাফ ক্লাব
১৯৬১	২৯৩.	রাজা ও রানী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড্রামা সার্কল
১৯৬১	২৯৪.	তাসের দেশ	"	"
১৯৬১	২৯৫.	রক্তকরবী	"	"
১৯৬১	২৯৬.	মেঘে ঢাকা তারা	--	পলেটেকনিক ইন্সঃ
১৯৬১	২৯৭.	পোড়োবাড়ী	--	কিশলয় সংঘ
১৯৬১	২৯৮.	নৌফেল ও হাতেম	ফররুখ আহমদ	বেতার শিল্পীবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬২	২৯৯.	অনুপমা	--	নাট্যম নাট্য সংস্থা
১৯৬২	৩০০.	এক পেয়ালা কফি	--	ঢাকা মেডিকেল কলেজ
১৯৬২	৩০১.	নৌফেল ও হাতেম	--	পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল
১৯৬২	৩০২.	মাপকাঠি	--	নিতা থিয়েটারস
১৯৬২	৩০৩.	গোধূলির রং	--	--
১৯৬২	৩০৪.	কানাগলি	--	সমিমুল্লাহ হল ইউনিয়ন ঢাঃ বিঃ
১৯৬২	৩০৫.	সংঘাত	--	পূর্ব পাকিস্তান সমবায় কলেজ ইউনিয়ন
১৯৬২	৩০৬.	চক্র	--	--
১৯৬২	৩০৭.	রক্তপদ্ম	আসকার ইবনে শাইখ	--
১৯৬২	৩০৮.	স্বীকৃতি	--	--
১৯৬২	৩০৯.	আমীর আকরাম	আলি মনসুর	--
১৯৬২	৩১০.	ইডিপাস	সৈয়দ আলী আহসান অনুদিত মুল সফোক্লিস	ড্রামা সার্কল
১৯৬২	৩১১.	কালবেলা	মূল-দ্য দিং, সাঈদ আহমদ অনুবাদ বজলুল করিম	"
১৯৬৩	৩১২.	মনোনীতা	--	বুলবুল ললিত কলা একাডেমির নাট্য শাখা
১৯৬৩	৩১৩.	আলোছায়া	নুরুল মোমেন	শিক্ষাসপ্তাহ উদযাপন কমিটি
১৯৬৩	৩১৪.	শেষলগ্ন	--	ঢাকা ইলেকট্রিক ক্লাব
১৯৬৩	৩১৫.	পরিণতি	--	নিলক্ষেত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৩	৩১৬.	সিরাজদ্দৌলা	--	মিনার্ভা থিয়েটারস
১৯৬৩	৩১৭.	আর্মস এন্ড দ্য ম্যান	মূল বার্ণাড'শ	ড্রামা সার্কল
১৯৬৩	৩১৮.	শেষ রাতের তারা	আলী মনসুর	কৃষ্টি সংঘ ; রূপবাণী
১৯৬৩	৩১৯.	তিতুমীর	--	ন্যাশনাল থিয়েটারস
১৯৬৩	৩২০.	পোড়াবাড়ী	--	আজিমপুর পাক সংঘ
১৯৬৩	৩২১.	নব মেঘদূত	--	রঙ্গম নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৩	৩২২.	প্রদীপ শিখা	--	নতুন কারিগরি ছাত্র সংস্থা
১৯৬৩	৩২৩.	সামনের পৃথিবী	--	--
১৯৬৩	৩২৪.	ফেরদৌসী	--	নাট্য নিকেতন
১৯৬৩	৩২৫.	দন্ড ও দন্ডধর	মুনীর চৌধুরী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৩	৩২৬.	মলুয়া	--	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৩	৩২৭.	ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৩	৩২৮.	সপ্তসুরের থীবি আক্রমন	মূল-এস কাইলাস	ড্রামা সার্কল
১৯৬৩	৩২৯.	ফিঙ্গার প্রিন্ট	--	শের-ই-বাংলা সাংস্কৃতিক সংসদ
১৯৬৩	৩৩০.	চরিত্রহীন	শরৎচন্দ্র	রঙ্গম নাট্য ও সংস্কৃতি পরিষদ
১৯৬৩	৩৩১.	বারঘন্টা	--	--
১৯৬৩	৩৩২.	প্রচ্ছদপট	--	সাতরং নাট্য সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৩	৩৩৩.	উল্কা	--	--
১৯৬৩	৩৩৪.	শান্তিনিকেতন	--	নাট্য বিতান
১৯৬৩	৩৩৫.	নব-দিগন্ত	--	--
১৯৬৩	৩৩৬.	আগন্তুক	--	উদয়ণ কালচারাল ক্লাব
১৯৬৪	৩৩৭.	ঝড়ের পরে	--	--
১৯৬৪	৩৩৮.	মায়ারী প্রহর	--	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ
১৯৬৪	৩৩৯.	কঙ্কাবতীর ঘাট	--	--
১৯৬৪	৩৪০.	পথের শেষে	--	--
১৯৬৪	৩৪১.	সূর্যোদয়	--	রূপকার নাট্য সংস্থা
১৯৬৪	৩৪২.	কঙ্গাল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রঙ্গম নাট্য সংস্থা
১৯৬৪	৩৪৩.	অনেক তারার হাতছানি	আসকার ইবনে শাইখ	সাতরং নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৪	৩৪৪.	প্রদীপ শিখা	--	আনন্দিক গোষ্ঠী
১৯৬৪	৩৪৫.	সূর্যমুখী	--	--
১৯৬৪	৩৪৬.	অগন্তুক	--	জাগরনী সংঘ
১৯৬৪	৩৪৭.	আগামী দিন	--	রঙ্গম গোষ্ঠী
১৯৬৪	৩৪৮.	দায়ী কে	--	লক্ষী বাজার সংস্কৃতি সংসদ
১৯৬৪	৩৪৯.	পথের শেষে	--	--
১৯৬৪	৩৫০.	এপিঠ ওপিঠ	--	লাবনী শিল্পী সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৪	৩৫১.	কৃষ্ণকুমারী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	ছাত্র-শিক্ষাক নাট্য গোষ্ঠী ঢাঃ বিঃ
১৯৬৪	৩৫২.	ভ্রান্তি বিলাস	মুল কমেডিঅব এররস-শেক্সপীয়ার, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুদিত	--
১৯৬৪	৩৫৩.	সামনের পৃথিবী	--	--
১৯৬৪	৩৫৪.	বৌদির বিয়ে	--	শিল্পী সমিতি
১৯৬৪	৩৫৫.	শেষ রাতের তারা	আলী মনসুর	--
১৯৬৪	৩৫৬.	পান্থশালা	--	অভিযাত্রী সংস্থা
১৯৬৪	৩৫৭.	কত রং বদলায়	--	স্টুডেন্টস আর্ট গ্রুপ
১৯৬৪	৩৫৮.	সূর্যোদয়	--	শিল্পী নিকেতন
১৯৬৪	৩৫৯.	ইরান দুহিতা	--	শিল্পী সংসদ
১৯৬৪	৩৬০.	চোরাবালি	--	--
১৯৬৪	৩৬১.	বৌদির বিয়ে	--	বার্মা শেল রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯৬৪	৩৬২.	প্রচ্ছদপট	--	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ ঢাঃ বিঃ
১৯৬৫	৩৬৩.	রূপোর কৌটা	রূপান্তরিত মুনীর চৌধুরী	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ
১৯৬৫	৩৬৪.	মানচিত্র	--	ঢাকা হল ছাত্র সংসদ
১৯৬৫	৩৬৫.	বিন্দু বিন্দু রং	--	ফজলুল হক ইউনিয়ন ঢাঃ বিঃ
১৯৬৫	৩৬৬.	নয়া সড়ক	--	--
১৯৬৫	৩৬৭.	লাল পাথর	--	পূর্বাচল শিল্পী সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৫	৩৬৮.	এইতো সমাজ	--	মিনার্ভা থিয়েটারস
১৯৬৫	৩৬৯.	বিশ বছর আগে	--	ওয়াপদা কেন্দ্রীয় নাট্য সংসদ
১৯৬৫	৩৭০.	শোধবোধ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল-কর্ম্মফল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল ইউনিয়ন
১৯৬৫	৩৭১.	ভাওয়াল সন্ন্যাসী	--	মিনার্ভা থিয়েটারস
১৯৬৫	৩৭২.	আদিগন্ত	শরৎচন্দ্র	এ জি ই পি ইন্সঃ
১৯৬৫	৩৭৩.	প্রদীপ শিখা	--	--
১৯৬৫	৩৭৪.	শহুরে মেয়ে	--	মহামেডান ক্লাব
১৯৬৫	৩৭৫.	অবিচার	--	উজ্জল নাট্য সংসদ
১৯৬৫	৩৭৬.	বারঘন্টা	--	উদয়ন শিল্পী সংসদ
১৯৬৫	৩৭৭.	পথে বিপথে	--	--
১৯৬৫	৩৭৮.	ব্ল্যাক আউট	--	ছাত্র শিল্পী সংসদ
১৯৬৫	৩৭৯.	কথা কও	--	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ ঢাঃ বিঃ
১৯৬৫	৩৮০.	পরিণতি	--	নারিন্দা শিল্পী পরিষদ
১৯৬৫	৩৮১.	পৃথিবী এখনও সুন্দর	--	--
১৯৬৫	৩৮২.	পাত্রী হরণ	--	হ-য-ব-র-ল
১৯৬৫	৩৮৩.	নেপোয় মারে দৈ	--	ধান কন্যা
১৯৬৫	৩৮৪.	মাইল পোস্ট	--	সাতরং গোষ্ঠী
১৯৬৫	৩৮৫.	পাথর বাড়ী	--	বিকা আর্ট সেন্টার এবং আনন্দিক

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৫	৩৮৬.	জীবন হতে বড়	--	প্রান্তিক নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৫	৩৮৭.	পরিণতি	--	ক্রিসেন্ট ক্লাব আজিমপুর
১৯৬৫	৩৮৮.	তিমির রাত্রি	--	পলিটেকনিক ইন্সঃ
১৯৬৫	৩৮৯.	বিদেহী	--	মেঘ দ্বীপ প্রোডাকসন্স
১৯৬৫	৩৯০.	বিশ বছর আগে	--	ট্রায়ো রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯৬৫	৩৯১.	দুর্নিবার	আলী মনসুর	সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
১৯৬৫	৩৯২.	শপথ	--	সংস্কৃতি সংসদ
১৯৬৫	৩৯৩.	কার ভুলে	--	পাকিস্তান সাংস্কৃতিক পরিষদ
১৯৬৫	৩৯৪.	এইতো জীবন	--	মিনার্ভা থিয়েটারস
১৯৬৬	৩৯৫.	সংঘাত	--	শিল্পী চক্র
১৯৬৬	৩৯৬.	গাঁয়ের বধু	--	ঢাকা পৌর কর্মচারী বৃন্দ
১৯৬৬	৩৯৭.	শেষ রাতের তারা	আলী মনসুর	ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী সংঘ
১৯৬৬	৩৯৮.	অনুবর্তন	--	ঢাকা সিটি কলেজ
১৯৬৬	৩৯৯.	নেপোয় মারে দৈ	--	সিমকিন যুব সংঘ
১৯৬৬	৪০০.	নীল দর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	বাফা
১৯৬৬	৪০১.	শুভ বিবাহ	--	ঢাকা সিটি নৈশ কলেজ ছাত্র সংসদ
১৯৬৬	৪০২.	এবাড়ী ওবাড়ী	--	ঢাকা নার্সিং ছাত্রী সংসদ
১৯৬৬	৪০৩.	কুয়াশা কান্না	--	রূপায়ন
১৯৬৬	৪০৪.	হায়দার আলী	--	মিলন শিল্পী সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৬	৪০৫.	শুভ বিবাহ	--	জগন্নাথ কলেজ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রগণ (কলা বিভাগ)
১৯৬৬	৪০৬.	পাকারাস্তা	--	কাঁকলী কুজন নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৬	৪০৭.	অবিচার	--	দ্বিশারী শিল্পী পরিষদ
১৯৬৬	৪০৮.	প্রেমে পাগল	--	আরামবাগ নাট্য সংস্থা
১৯৬৬	৪০৯.	শুভ বিবাহ	--	বার্মা ইস্টার্ণ রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯৬৬	৪১০.	তাইতো	--	একতা বিতান
১৯৬৬	৪১১.	পাত্রী হরণ	--	যান্ত্রিক কারিগরি সংসদ
১৯৬৬	৪১২.	রং সম্মেলন	--	মঞ্চাঙ্গন
১৯৬৬	৪১৩.	বাস্তুত্যাগ	ইন্দুসাহা	--
১৯৬৬	৪১৪.	বেকার নিকেতন	--	--
১৯৬৬	৪১৫.	সামনের পৃথিবী	ফররুখ শিয়র	ই. পি.জি. প্রেস ক্লাব
১৯৬৬	৪১৬.	বন্দী	--	অগ্রগতি নাট্যসংঘ
১৯৬৬	৪১৭.	দৃষ্টি	--	বন্ধু নাট্য সংস্থা
১৯৬৬	৪১৮.	অস্তমিত সূর্য	--	নারিন্দা শিল্পী পরিষদ
১৯৬৬	৪১৯.	স্বপ্নভঙ্গ	--	ঢাকা সদর পোস্টাল ক্লাব
১৯৬৬	৪২০.	মানচিত্র	আনিস চৌধুরী	এ.জি.ই.পি. ইনস্টিটিউট
১৯৬৬	৪২১.	আওরঙ্গজেব	--	পি.টি.এন্ড অডিট ক্লাব
১৯৬৬	৪২২.	দায়ী কে	--	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ ঢঃ বিঃ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৬	৪২৩.	আপন দুলাল	--	নব দিগন্ত নাট্য সংঘ
১৯৬৬	৪২৪.	চক্রান্ত	--	কৃষ্টি সংসদ
১৯৬৬	৪২৫.	খাদেম	--	ই.পি.আই.ডি.সি ডক ইয়ার্ড নাট্য ও সংস্কৃতি সংসদ
১৯৬৬	৪২৬.	অভিশাপ নয় আশীবাদ	--	জগন্নাথ কলেজ ছাত্রগণ (স্নাতক শ্রেণী)
১৯৬৬	৪২৭.	দেবদাস	শরৎ চন্দ্র	কথারূপ
১৯৬৬	৪২৮.	বৌদির বিয়ে	--	নিখিল পাক ডাক পিয়ন ও কর্মচারী ইউনিয়ন
১৯৬৭	৪২৯.	কালের পুতুল	--	রঙ্গম গোষ্ঠী
১৯৬৭	৪৩০.	মিতা নাসিং হোক	--	ঢাকা হল সংসদ
১৯৬৭	৪৩১.	অবিচার	--	লেপ্রোসী ওয়ার্ড নাট্য সংস্থা
১৯৬৭	৪৩২.	রাস্তার ছেলে	--	ঢাকা ন্যাশনাল বাংলা হাই স্কুল
১৯৬৭	৪৩৩.	অস্তমিত সূর্য	--	ঢাকা পৌরসভা প্রকৌশল বিভাগ
১৯৬৭	৪৩৪.	পাথরবাড়ী	--	ঢাকাস্থ মার্কিন সরকারি কর্মচারী সঞ্চয় ও মূলধন সমবায় সমিতি
১৯৬৭	৪৩৫.	অনুবর্তন	--	শিল্পী চক্র
১৯৬৭	৪৩৬.	কালিদী	--	নবদিগন্ত নাট্য সংঘ
১৯৬৭	৪৩৭.	নাজেহাল	--	পাটুয়াটুলী সমাজ কলাণ সমিতি
১৯৬৭	৪৩৮.	বার ঘন্টা	--	উদয়ন শিল্পী সংসদ
১৯৬৭	৪৩৯.	চোরাগলি মন	কল্যাণ মিত্র	খেয়ালী সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৭	৪৪০.	পরিণতি	--	জগন্নাথ কলেজ ছাত্রগণ (২য় বর্ষ, বিজ্ঞান শাখা)
১৯৬৭	৪৪১.	অবিচার	--	কাকলি থিয়েটার্স
১৯৬৭	৪৪২.	কাঞ্চন রঙ্গ	--	কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদ
১৯৬৭	৪৪৩.	ওরা থাকে ওধারে	--	একতা বিতান
১৯৬৭	৪৪৪.	ক্ষুধা	--	উদয়ন শিল্পী সংসদ
১৯৬৭	৪৪৫.	উল্কা	--	ঐ
১৯৬৭	৪৪৬.	বিদ্রোহী পদ্মা	--	ওয়াপদা হিসাব রক্ষণ দফতর নাট্য সংসদ
১৯৬৭	৪৪৭.	চক্রবাক	--	ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
১৯৬৭	৪৪৮.	শুভবিবাহ	কল্যাণ মিত্র	মালিবাগ ইয়ং ক্লাব এন্ড লাইব্রেরী
১৯৬৭	৪৪৯.	ব্যাংক ফেল	--	মহাপ্রাচী কৃষ্টি সংসদ
১৯৬৭	৪৫০.	শুভ বিবাহ	--	পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক সংস্কৃতিক ও নাট্য সংসদ
১৯৬৭	৪৫১.	অবাক জলপান	--	খেলাঘর
১৯৬৭	৪৫২.	রাস্তার ছেলে	কল্যাণ মিত্র	সংস্কৃতি সংসদ
১৯৬৭	৪৫৩.	শুভ বিবাহ	--	ঢাকা ইলেকট্রিক ক্লাব
১৯৬৭	৪৫৪.	ক্ষুধা	--	খিলগাঁও যুব সংঘ
১৯৬৭	৪৫৫.	এপিঠ ওপিঠ	আবদুল্লাহ ইউসুপ ইমাম	বনগ্রাম সমাজ উন্নয়ন সমিতি
১৯৬৭	৪৫৬.	মানচিত্র	--	পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল এডুকেশন কলেজ
১৯৬৭	৪৫৭.	অনন্যা	--	ঢাকা মেডিকেল কলেজ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৭	৪৫৮.	শুভবিবাহ	--	প্রকৌশল সংসদ
১৯৬৭	৪৫৯.	স্কুল মাস্টার	--	--
১৯৬৭	৪৬০.	দর্পচূর্ন	--	পূরবী সংঘ
১৯৬৭	৪৬১.	অবিচার	--	কাকলি থিয়েটার্স
১৯৬৭	৪৬২.	ফিঙ্গার প্রিন্ট	--	লিয়াকত হল ছাত্র সংসদ
১৯৬৭	৪৬৩.	এবাড়ী ওবাড়ী	--	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিভাগ কর্মচারীবৃন্দ
১৯৬৭	৪৬৪.	সেতু	--	সমবায় বীমা সমিতি
১৯৬৭	৪৬৫.	সমাধির পরে	--	আরামবাগ নাট্য সংসদ
১৯৬৭	৪৬৬.	প্রচ্ছদ পট	--	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রবৃন্দ (২য় ও ৩য় বর্ষ)
১৯৬৭	৪৬৭.	জ্বলছে আগুন ক্ষেত ও খামারে	জ্ঞানেশ মুখার্জী	ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৬৮	৪৬৮.	কুয়াশার কান্না	--	নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদ
১৯৬৮	৪৬৯.	বার ঘন্টা	--	ফাল্গুনী সংসদ
১৯৬৮	৪৭০.	অনুবর্তন	--	ওয়াপদা সংস্কৃতি সংসদ
১৯৬৮	৪৭১.	পাকা রাস্তা	--	সিদ্ধেশরী সংস্কৃতি সংসদ
১৯৬৮	৪৭২.	চোরা গালি মন	--	জাগরণী ক্লাব
১৯৬৮	৪৭৩.	ফিরোজ শাহ	--	ক্রিসেন্ট ক্লাব
১৯৬৮	৪৭৪.	মা	--	সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৬৮	৪৭৫.	প্রদীপ শিখা	কল্যাণ মিত্র	জাগৃতি সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৮	৪৭৬.	মাটির মায়া	--	পূর্ব পাকিস্তন কৃষি বিভাগ
১৯৬৮	৪৭৭.	এপিঠ ওপিঠ	--	মসুলিম কালচারাল এসোসিয়েশন
১৯৬৮	৪৭৮.	বিসর্জন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৌদ্ধ ইয়থ ফেডারেশন
১৯৬৮	৪৭৯.	বেকুন্ঠের খাতা	--	রূপক নাট্যগোষ্ঠী
১৯৬৮	৪৮০.	এতটুকু বাসা	--	এ.জি.ই.পি. ইনস্টিটিউট
১৯৬৮	৪৮১.	ভবঘুরে	--	বাসন্তী সংসদ
১৯৬৮	৪৮২.	এইতো জীবন	--	জাগৃতী গোষ্ঠী
১৯৬৮	৪৮৩.	পাকা রাস্তা	--	বেতার বৈদ্যুতিক নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৮	৪৮৪.	মা	--	সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৬৮	৪৮৫.	আগামী দিন	--	নাট্য অগ্রগতি পরিষদ
১৯৬৮	৪৮৬.	উল্কা	--	মেঘদ্বীপ প্রোডাকসন্স
১৯৬৮	৪৮৭.	কার দোষে	--	পোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯৬৮	৪৮৮.	শেষ অধ্যায়	--	সিটি নৈশ কলেজ
১৯৬৮	৪৮৯.	দায়ী কে	--	ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন চিত্ত বিনোদন সংঘ
১৯৬৮	৪৯০.	অবিচার	--	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ
১৯৬৮	৪৯১.	বেকার নিকেতন	--	পি. টি. এন্ড টি. অডিট ক্লাব
১৯৬৮	৪৯২.	ছায়া কালো	--	ইলাকো ক্লাব
১৯৬৮	৪৯৩.	প্রদীপ শিখা		ইপসিক সাংস্কৃতিক সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৮	৪৯৪.	পরিণতি	--	পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৯৬৮	৪৯৫.	প্রদীপ শিখা	--	ইসকাটন ক্লাব
১৯৬৮	৪৯৬.	শুভ বিবাহ	--	ওমর সন্স কর্মচারীবৃন্দ
১৯৬৮	৪৯৭.	বেকার নিকেতন	--	আজাদ মুসলিম ক্লাব
১৯৬৮	৪৯৮.	ঝড়ের রাতের আগন্তুক	--	গেন্ডারিয়া চিত্তরঞ্জন নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৮	৪৯৯.	রবি ডুবে যায়	--	জলন্ত প্রদীপ নাট্য সংসদ
১৯৬৮	৫০০.	বিপ্লবের টুকরো ছবি	মূল- ম্যাক্সিম গোর্কী	সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৬৮	৫০১.	দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন	মূল- জনরীড	সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৬৮	৫০২.	জমিদার দর্পন	মীর মোশাররফ হোসেন	---
১৯৬৮	৫০৩.	ঝিলিমিলি	কাজী নজরুল ইসলাম	--
১৯৬৮	৫০৪.	মসনদের মোহ	শাহাদাত হোসেন	--
১৯৬৮	৫০৫.	কাফেলা	ইব্রাহিম খাঁ	---
১৯৬৮	৫০৬.	রক্তাক্ত প্রান্তর	মুনীর চৌধুরী	--
১৯৬৮	৫০৭.	তস্কর ও লস্কর	শওকত ওসমান	---
১৯৬৮	৫০৮.	নয়া খান্দান	নরুল মোমেন	--
১৯৬৮	৫০৯.	তরঙ্গ ভঙ্গ	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	--
১৯৬৮	৫১০.	রুগ্ন পৃথিবী	মোঃ ওবায়দুল হক	---

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৯	৫১১.	পাকা রাস্তা	প্রসাদ বিশ্বাস	গোপীবাগ সংসদ
১৯৬৯	৫১২.	কালের পুতুল	--	ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রী সংসদ
১৯৬৯	৫১৩.	নাজেহাল	--	কিশোর বয়েজ ক্লাব
১৯৬৯	৫১৪.	পাকারাস্তা	প্রসাদ বিশ্বাস	নাট্য নিকেতন
১৯৬৯	৫১৫.	টিপু সুলতান	--	কাঠাল বাগান তরুণ সংঘ
১৯৬৯	৫১৬.	কেদার রায়	--	রায়ের বাজার আদর্শ সমাজ কল্যান সমিতি
১৯৬৯	৫১৭.	নটির পূজা	--	বুদ্ধ ইয়থ ফেডারেশন
১৯৬৯	৫১৮.	মানচিত্র		বুলবুল ললিতকলা একাডেমী
১৯৬৯	৫১৯.	পাথরবাড়ী	কল্যাণ মিত্র	ইকবাল হক, ঢাঃ বিঃ
১৯৬৯	৫২০.	স্বীকৃতি	--	টি.এন্ড. টি অডিট ক্লাব
১৯৬৯	৫২১.	জীবন কাহিনী	--	হাইকোর্ট মিনিস্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন
১৯৬৯	৫২২.	দায়ী কে	কল্যাণ মিত্র	তিন সং সড়ক নির্মাণ বিভাগ
১৯৬৯	৫২৩.	অশ্রু সরোবর	--	আদি যুব সংঘ নাট্য গোষ্ঠী
১৯৬৯	৫২৪.	পোস্ট মাস্টার	--	জি.পি.ও পোস্টম্যান ক্লাব
১৯৬৯	৫২৫.	ভুলের পরে	--	পলিটেকনিক প্রধান ছাত্রাবাস ছাত্রবৃন্দ
১৯৬৯	৫২৬.	স্বপ্নাকাশ	--	ঝুমুর
১৯৬৯	৫২৭.	সেতু বন্ধ	কাজী নজরুল ইসলাম	রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ
১৯৬৯	৫২৮.	বাস্তু ঘুঘু পাঠশালা	--	আলাপনী সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৬৯	৫২৯.	মাটির ঘর	--	তরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংসদ
১৯৬৯	৫৩০.	একে একে এক	আ ন ম বজলুর রশিদ	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
১৯৬৯	৫৩১.	আদ্যোপান্ত	--	সমাজবিজ্ঞান সংসদ
১৯৬৯	৫৩২.	মাটির ঘর	--	জাগরণী সংসদ
১৯৬৯	৫৩৩.	লালন ফকির	--	ছাত্র-শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠী
১৯৭০	৫৩৪.	বিশ বছর আগে	বিদায়ক ভট্টাচার্য	মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক সাংস্কৃতিক সংসদ
১৯৭০	৫৩৫.	রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংস্কৃতি সংসদ
১৯৭০	৫৩৬.	মহাবিপ্লবের পদধ্বনি	--	ওন্মেষ সাহিত্য সংসদ
১৯৭০	৫৩৭.	কবর	--	ধ্রুপদী গোষ্ঠী
১৯৭০	৫৩৮.	পলাতক	--	ঐ
১৯৭০	৫৩৯.	বিদ্রোহী পদ্মা	--	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ, ঢাঃ বিঃ
১৯৭০	৫৪০.	বৌদির বিয়ে	--	ঢাকা মেডিকেল কলেজ
১৯৭০	৫৪১.	পুতুল নাচ	--	প্রতিবিম্ব
১৯৭০	৫৪২.	মা	ম্যাক্সিম গোর্কী	সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৭০	৫৪৩.	গাঁয়ের বধূ	--	সৃজনী সংসদ
১৯৭০	৫৪৪.	সাগর সেচা মানিক	--	এ.জি.ই.পি. ইনস্টিটিউট
১৯৭০	৫৪৫.	সংকেত	--	সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	নাট্যকার	আয়োজক
১৯৭০	৫৪৬.	কালিন্দী	--	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯৭০	৫৪৭.	আবর্ত	--	সংস্কৃতি সংসদ
১৯৭০	৫৪৮.	শেষের কথা	--	নতুন সংঘ
১৯৭০	৫৪৯.	ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান	পূর্ব পাকিস্তান নবায়ন সংস্থা নাট্য সংসদ
১৯৭০	৫৫০.	মাটির ঘর	--	তরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংসদ
১৯৭০	৫৫১.	সংঘাত	--	পাকিস্তান আর্ট সার্কল
১৯৭০	৫৫২.	সূর্যের রঙ	--	আজিমপুর স্টার বয়েজ ক্লাব
১৯৭০	৫৫৩.	তাপসী	--	মেট্রোপলিটন কালচারাল এসোসিয়েশন
১৯৭০	৫৫৪.	দুয়ে দুয়ে চার	নীলিমা ইব্রাহিম	ছাত্র-শিক্ষক নাট্য গোষ্ঠী, ঢাঃবিঃ
১৯৭১	৫৫৫.	পোস্টার	--	পারাপার নাট্য গোষ্ঠী
১৯৭১	৫৫৬.	জীবন তরঙ্গ	--	উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৭১	৫৫৭.	ভোরের স্বপ্ন	--	বেতার ও টেলিভিশন বিক্ষুব্ধ শিল্পী গোষ্ঠী
১৯৭১	৫৫৮.	শপথ নিলাম	--	--
১৯৭১	৫৫৯.	রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য	সোলায়মান হোসেন	--
১৯৭১	৫৬০.	মুক্তির নেশা	--	তেজগাঁও কলেজ ছাত্রবৃন্দ
১৯৭১	৫৬১.	যে পথের শেষ নাই	মাহবুবুর রহমান	ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী ঢাঃ বিঃ

উৎস ঃ সুকুমার বিশ্বাস ঃ বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, ঢাকা, ১৯৮৮।
ওবায়দুল হক সরকার ঃ সেকালে আমাদের নাট্যচর্চা, ঢাকা, ১৯৯৫।
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত)ঃ স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

উল্লেখযোগ্য গণসঙ্গীত যা আন্দোলনে (১৯৫৮-৭১) অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

(১)

ও ভাই, খাঁট সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি ।।
এ দেশেরই মাটি জলে
এ দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটি ।।
এই মাটি এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হলো নিখিল ভুবন
দিব্য পরিপাটি।।
এ মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেটে
তীর্থ করে ধন্য হতে
আসে কতো জাতি।
এ দেশেরই ধূলায় পড়ি
মানিক যায়রে গড়াগড়ি
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো
এই দেশেরই জিয়ন কাঠি ।।

[কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম]

(২)

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা
শির উচুঁ করি মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া জমানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান ।।

Dhaka University Institutional Repository

মুখেতে কলেমা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার
হৃদয়ে লইয়া এশক আল্লাহর
চল আগে চল বাজে কিশান
বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান।।
নাহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের
শাহাদৎ ছিল কাম্য মোদের
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান
তারা আজ প'ড়ে ঘুমায় বেহোশ
বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান।।

[কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম]

(৩)

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে
দ্বীন-ই-ইসলামী লাল মশাল্
ওরে বেখবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল্।।
গাজী-মুস্তাফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কী সূর্খ-তাজ
রেজা পাহলবি সাথে জাগিয়াছে
বিরান মুলুক ইরানও আজ।
গোলাম বিসরি' জেগেছে মিসরী
জগলুল সাথে প্রাণ-মাতাল ।।
ভুলি গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ
নেজদ আরবে ইবনে সউদ
আমানুল্লাহর পরশে জেগেছে কাবুলে
নবীন আল্ মাহমুদ।
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ
বন্দী করিম রীফ-কামাল ।।

Dhaka University Institutional Repository

জাগে ফয়সল ইরাক আজমে
জাগে নব-হারুণ আল-রশীদ
জাগে বায়তুল মুকাদ্দাস রে
জাগে শাম দেখ টুটিয়া নিঁদ
জাগে নাকো শুধু এই দেশে এই
বাঙালী মুসলিম বে-খেয়াল ।।

মোরা আসহাব কাহাফের মতো
হাজারো বছর শুধু ঘুমাই।
আমাদেরি কেহ ছিল বাদশাহ
কোনো কালে তারি করি বড়াই।
জাগি যদি মোরা দুনিয়া আবার
কাঁপিবে চরণে টাল মাটাল ।।

[কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম]

(৪)

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম
মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল
ঐ বিধাতার মতো নির্ভয়
ঐ প্রকৃতির মতো স্বচ্ছল ।।
মোরা আকাশের মতো বাধাহীন
মোরা মরুশয্যার বেদুইন
বন্ধনহীন, জন্ম স্বাধীন
চিত্ত মুক্ত শতদল ।।

মোরা সিন্ধু জোয়ার কলকল
ঐ পাগলা ঘোড়ার ঝড়া জল
কল কল কল ছল ছল ছল (২) ।।
মোরা দিল খোলা প্রান্তর

Dhaka University Institutional Repository

মোরা শক্তি অটল মহিধর
হাসি-গান সম উচ্ছল
বৃষ্টির জল, বনফল খাই
শয্যা শ্যামল বনতল ।।

[কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম]

(৫)

ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী
সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী
সে যে আমার জন্মভূমি (৩) ।।
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
পুষ্পে পুষ্পে গাহে শাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি
পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের 'পরে ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী
সে যে আমার জন্মভূমি (৩) ।।
মায়ের ভায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরন দুটি

Dhaka University Institutional Repository

বক্ষে আমার ধরি -
আমার এই দেশেতে জন্ম
যেন এই দেশেতে মরি -
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের সেরা
সে যে আমার জন্মভূমি (৩) ।।

[কথা ও সুরঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

(৬)

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে,
ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ।।
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায়রে
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি, মধুর হাসি
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবসি ।।
কী শোভা, কী ছায়া গো
কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো -
মরি হায়, হায়রে --
মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন
ওমা, আমি নয়নজলে ভাসি।

Dhaka University Institutional Repository

সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।।

[কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(৭)

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় ততো খাঁটি
বলো যতো খাঁটি
তার চেয়েও খাঁটি
বাংলাদেশের মাটিরে
আমার জন্মভুমির মাটি ।।
ধন -জন-বন যতো ধন দুনিয়াতে
হয় কি তুলনা বাংলার কারো সাথে?
কত মা'র ধন মানিক রতন
কতো জ্ঞানী গুণী কতো মহাজন
এনেছি আলোর সূর্য এখানে
আঁধারের পথ পাতি রে।
আমার জন্মভুমির মাটি ।।

এই মাটি তলে ঘুমায়ে আছে অবিরাম
রফিক শফিক বরকত কতো নাম
কতো তীতুমীর, কতো ঈশা খান
দিয়েছে জীবন দেয়নি তো মান।
রক্তশয্যা পাতিয়া এখানে
ঘুমায়ে আছে পরিপাটিরে
আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভুমির মাটি।।

[কথা ও সুরঃ আবদুল লতিফ]

Dhaka University Institutional Repository

(৮)

দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও একটি নাম -
মুক্তি পাগল রক্তস্নাত - ভিয়েতনাম (৩)
দেয়ালে দেয়ালে লাল হরফে যাও বলে
শম্কা মৃত্যু, ঝঞ্ঝাকে দাও দলে
জন-সমুদ্র দুর্নিবার, কী উদ্দাম -
মুক্তি পাগল রক্তস্নাত -ভিয়েতনাম (৩)।

অস্ত্রে অস্ত্রে বাজুক প্রাণে এই কথা
সকল মানুষ পেয়েছে বাঁচার স্বাধীনতা।

অগ্নিগর্ভ পূর্বাচল জবাব দাও
শর্বোদ্ধত শত্রুকে রুখে দাঁড়াও
মুষ্টিবদ্ধ সর্বজাতির এ সংগ্রাম
মুক্তি পাগল রক্তস্নাত - ভিয়েতনাম (৩)।

[অপরাজেয় ভিয়েতনাম। কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার.]

(৯)

রক্ত-তিলক ললাটে সূর্য,
রাজপথ রোশনাই
শোণিত অর্ঘে প্রাণের পুষ্প
অবিনশ্বর তাই।।

জীবন মৃত্যু তুচ্ছ সকল
মায়ের অশ্রুজলে
লক্ষ ছেলের বক্ষ পাঁজর
জ্বলছে বজ্রানলে।
ধন্য মা তো গর্ভধারণ
তুলনা যে তোর নাই
শোণিত অর্ঘে প্রাণের পুষ্প
অবিনশ্বর তাই ।।

Dhaka University Institutional Repository

কণ্ঠ মোদের রুদ্ধ করিবে
এমন সাধ্য কার
সহস্র-কোটি কণ্ঠে যখন
দৃঢ় অঙ্গীকার।
আমরা শুনেছি রক্তধারায়
মহাসাগরের ডাক
আমরা দেখেছি মৃত্যুর মুখে
নব জনমের বাঁক।
পূণ্য স্মৃতির আলোয় আমরা
জীবনের জয় গাই
শোণিত অর্ঘে প্রাণের পুষ্প
অবিনশ্বর তাই ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার।]

(১০)

তুর্য-নিনাদ বাজাও গর্বে
হে বীর, হে সৈনিক
গর্জে উঠুক, তোমার কণ্ঠে
দৃপ্ত প্রাণের মন্ত্র হে নির্ভীক।।

অন্তঃ বিহীন অন্ধকার শেষে
নতুন সূর্য আলোর উন্মেষে
ভাঙ্গো শৃংখল, মোহ বন্ধন
শাসন-শোষণ যন্ত্র-বৈদেশিক ।।

উৎপীড়িতের নির্যাতিত অনন্য দেশ
কোথায় তোমার অশ্রু- গ্লানির চিহ্নলেশ
অত্যাচারীর শক্তিবাণ কেড়ে
শতবর্ষের ক্লান্তি ঘুম ঝেড়ে
মহাবিশ্বের বিস্ময় জাগে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বৈজয়িক।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার.]

(১১)

কমরেড এই রাত আঁধিয়ার
অজগর নিঃশ্বাস চারিধার
পিশাচের মোকাবেলা এইক্ষণ
কাঁধে নেও দূর্বার হাতিয়ার।।
চোখে জ্বালা শপথের ইস্পাত
ভেঙ্গে ফেলে শত্রুর বিষদাঁত
মনে আনো দুরন্ত বিশ্বাস
জয় করো জনতার স্বাধিকার।।

কমরেড, এই রাত ঘুম নেই
জেগে আছি অতন্দ্র পাহারায়
নিষ্ফল স্বপনে ধুম নেই
শান্তির মরীচিকা সাহারায় ।।

পাপ অন্যায় করো প্রতিরোধ
প্রতি রক্তের নাও প্রতিশোধ
কেন আর বৃথাকাল অপচয়
কেন সংশয় কাঁদাকাঁদি আর ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার.]

(১২)

আমরা চলেছে বিরাট কালের
বিপুল তেপান্তর
ঝড়ের জাহাজে, জীবন প্লাবনে
নতুন যুগান্তর ।।

আমরা চলেছি কালের চাকায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রলয় ঘূর্ণি জাগে
বন্ধ্যামাটির গোপন-গর্ভে
প্রাণের পরশা লাগে।।

পায়ের তলায় কুটছে কপাল
মৃত্যু ভয়ঙ্কর ।।

মরন বিজয়ী মজুর কিষাণ
মধ্যবিত্ত চলে
লৌহ কঠিন হাতের মুঠোয়
মুক্তি মশাল জ্বলে।
আমরা চলেছি দুঃসাহসী
ভিয়েতনামের পথে
জীর্ণ বিফল অতীত ছাড়িয়ে
রঙিন ভবিষ্যতে।
ধূসর মলিন বিশ্বে আবার
সবুজ রূপান্তর ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার]

(১৩)

গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল চৌকিদার
যখন তখন গর্জে ওঠেনঃ ''খবরদার।''
থলির ভিতর তার যে ছিল বিড়াল এক
কেউ দেখেনি, সবাই জানে চমৎকার ।।

বাস্তু ঘুঘু ভিটেয় চড়ে কাল হয়ে
ছুঁচের মতো ঢোকে, বেরোয় ফাল হয়ে
ভিটের মালিক আসলে পরে বলবে সে
পাগড়ি বেঁধে তকমা এঁটেঃ ''হুকুমদার'' ।।

হঠাৎ দেখি সেদিন তার মুখ কালো

Dhaka University Institutional Repository

ভয় পেয়ে কি বেড়ায় খুঁজে কই আলো।
ভূতের মুখে রামের নাম শুনলো যেই
অবাক হয়ে সবাই বলে ঃ ''কী ব্যাপার? ''

বিড়ালছানা বেরিয়ে গেছে কোন ফাঁকে
কেমন করে লজ্জা দুঃখ আর ঢাকে
পরের ভিটের খবরদারী চললো না
হায়রে কপাল সেথায় হোল কবর তার ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার]

(১৪)

আকাশের সে কপোত আর ডানা পতপত করেনা
মানুষের শপথ
রাজপথ, জনপদ ভরে না।।

তাই বুঝি সে কপোত পুড়েছে
কালো ধোঁয়া ও আকাশ জুড়েছে
শকুনীরা দিকে দিকে উড়েছে
মহাকাল যেন আর সরে না।।

বিশ্বের দুঃসহ অন্যায়
দূর্বল আত্মার ক্রন্দন
শক্তির মদরস বন্যায়
কপোতের নাই তাই স্পন্দন।

আলো চাই, চাই আরো আলো গো
হৃদয়ের জঞ্জাল জ্বালো গো
অমৃতের সুধারম ঢালোগো
শান্তির সংগীত মরে না।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার.]

Dhaka University Institutional Repository

(১৫)

ধ্বংসের পরোয়ানা শোনো কি
সায়গন হাইফাং আকাশে
মরাপচা বরুদের গন্ধ ভাসে আজ
পৃথিবীর বাতাসে।।

যুগ যুগ সঞ্চিত সৃষ্টি
দর্শন বিজ্ঞান কৃষ্টি
মনে হয় মিথ্যের বেসাতি
সভ্যতা সারহীন ফাঁকা যে
মরাপচা বারুদের ..... বাতাসে।।

হিরোসিমা নাগাসাকি কোরিয়া
আমাদের চেতনায় জ্বলছে
মহাভয় বিভীষিকা আঘাতে
ক্রন্দনরোল শুধু চলছে।

এক ফোটা স্বার্থের জন্যে
আমরা যে উন্মাদ হন্যে
তুব এই বাইরের চেহারা
শান্তির লালিত্য শাখা সে
মরাপচা বারুদের ..... বাতাসে ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার.]

(১৬)

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল
পাকে পাকে তড়পায় সমকাল
মারি ভয় সংশয় ত্রাসে
অতিকায় অজগর গ্রাসে
মানুষের কলিজা, ছেঁড়ে খোঁড়ে খাবলায়
খাবলায় নরপাল ।।

Dhaka University Institutional Repository

ঘুম নয় এই খাঁটি ক্লান্তি
ভাঙো ভাই খোয়ারের ক্লান্তি
হালখাতা বৈশাখে শিষ দেয়
সৈনিক হরিয়াল।।

দুর্বার বন্যার তোড়জোড়
মুখরিত করে এই রাঙা ভোর।
নায়ে ঠেলা মারো হেঁই এইবার
তোলো পাল, তোলো পাল, ধর হাল ।।

কড়া হাতে ধরে আছি কবিতার
হাতিয়ার কলমের তলোয়ার
সংগ্রামী ব্যালাডে ডাক দেয়
কমরেড কবিয়াল ।।

[কথাঃ আবু বকর সিদ্দিক। সুরঃ সাধন সরকার।]

(১৭)

একুশের সীমাহীন পিপাসা
রক্তের লালসায় উন্মুখ
রাজপাখী কৃষ্ণাভ আকাশে
নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে উৎসুক।

আমাদের পারাবত উড়ছে
দূর্জয় কচিপ্রাণ নির্ভয়
আপনার কথা সে যে বলবেই
দলে দলে প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত।

নিষ্ঠুর নখরের আঘাতে
পায়রার বুকখানি রাঙালো
জীবনের শেষ গান গাইতে
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালো।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের লাখো লাখো পারাবত
ছেয়ে গেল ও আকাশ পারাবার
বারে বারে চোখ তাই ঝলসায়
কালো মেঘে এক ফালি বিদ্যুৎ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ মনোয়ার আলী। সুরঃ সাধন সরকার।]

(১৮)

একুশে নিয়েছি শপথ তাই
রক্তের চোখের জলে
মুখের বুলিরে রাখবোই মোরা
বিপুল বুকের বলে।।

তপ্ত শোণিতে পিছল পথ
তারি 'পরে চলে জীবন রথ
আমরা মানিনা শংকা হার
কাফেলা এগিয়ে চলে।।

চিত্তে নিত্য দিয়েছ বিত্ত
মধুর বাংলা ভাষা
প্রেম দেই যারে প্রাণ দেই তারে
এরি নাম ভালোবাসা।।

মানিনা শংকা তুফান ক্ষয়
পরাজয় ভয় করেছি জয়
মিলেছি সালাম বরকতে
মিছিলে সবার দলে।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ আবু বকর সিদ্দিক। সুরঃ সাধন সরকার]

(১৯)

কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশের
রঙীন জাল বুনে
একুশে এসো আজ, শান্ত পায়ে পায়ে

Dhaka University Institutional Repository

নতুন ফাল্গুনে।
আকাশে পারাবত, মুক্তি পাখা মেলে
ছেলেটি রাজপথে, জীবন অবহেলে
ব্যাথার সুর জাগে, জননী বসে থাকে
নিভৃত কাল গুণে।।

কুমড়ো ফুলে ফুলে লতাটি ভরে
শূন্য আঙ্গিনাতে মেঘের ছায়া পড়ে
একটি পদধ্বনি, হাজার হয়ে বাজে
লক্ষ জনতার, বুকের মাঝে মাঝে
একটি শপথের একুশের দিন তাই
চলেছে তাল গুণে।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার]

(২০)

নিষ্ফল কভু হয় না ধরায়
রক্তের প্রতিদান
দিকে দিকে তাই ফেব্রুয়ারীর
শোনো ঐ জয়গান।
ফেব্রুয়ারী নয় নয় ওযে
শুধু এক শোকমাস
এতে আছে ত্যাগ, সংগ্রামবাণী
মুক্তির আশ্বাস।।

ফেব্রুয়ারী ভোলেনি সেদিন
ভুলতে পারে না হায়।
সালাম, রফিক, বরকত নিল
যেদিন শেষ বিদায়।
যাবার আগে ধরণীর বুকে
গাইলো তারা যে গান

Dhaka University Institutional Repository

তারি মাঝে ঐ ফেব্রুয়ারী
অমর চির মহান ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথা ও সুরঃ সেলিম বুলবুল]

(২১)

শান্তি না সংগ্রাম - সংগ্রাম, সংগ্রাম
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
জাগ্রত জনতার প্রতিজ্ঞা খরধার
লাখো লাখো চোখে শুধু জ্বলবেই।।

আপোষ না প্রতিশোধ - প্রতিশোধ, প্রতিশোধ
রক্তের প্রতিশোধ রক্তে
জাগো ওঠো দুর্বার ভেঙ্গে কর চুরমার
লাথি মারো জালেমের তখতে।
জালেমের হুকুমত টলবেই ।।

ধ্বংস না বিপ্লব - বিপ্লব, বিপ্লব
মহাকাল পাক খেয়ে ঘুরছে
মজুরের কিষাণের ইতিহাস জীবনের
খুনে লাল পতাকায় উড়ছে।
রোদ রাঙা বিপ্লব ফলবেই ।।

['অপরাজেয় ভিয়েতনাম।' কথাঃ নাজিম মাহমুদ। সুরঃ সাধন সরকার.]

(২২)

এই শিকল পরা ছল
মোদের এ শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবো রে বিকল ।।

তোদের বদ্ধ কারায় আসা মোদের
বন্দী হ'তে নয় -
ওরে, ক্ষয় করতে আসা মোদের

Dhaka University Institutional Repository

সবার বাঁধন ভয়।
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ
শিকল ভাঙা কল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবো রে বিকল।।

তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে
করছো বিশ্ব গ্রাস
আর, ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো
বিধির শক্তি -হ্রাস -
সেই ভয় দেখানো ভূতেরে মোরা
করব সর্বনাশ।
এবার আনবো মাভৈঃ বিজয় -মন্ত্র
বলহীনের বল ।।

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছো শাসন
জয় দেখিয়ে নয়-
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে
করবো তাদের লয়।

মোরা আপনি মরে মরার দেশে
আনবো বরাভয়।
মোরা ফাঁসি পরেই আনবো হাসি
মৃত্যুজয়ের কল।।

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই
শিকল ঝনঝনা -
এই যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের
চরণ বন্দনা-
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে

Dhaka University Institutional Repository

হানছে লাঞ্ছনা।
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে
আবার বজ্রানল।।

[কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম।]

(২৩)

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

ডান হাতে তো খড়্গ জ্বলে, বাঁ-হাতে করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুন বরণ।
ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ-মেঘে লুকায় অশনি
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনি !
ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

যখন অনাদরে চাইনি মুখে, ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ কোথা সে তোর মলিন বাসি !
আকাশে বাতাসে কী মূরতি আজি দেখি রে !
ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে !

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাই ধরণী
তোমার অভয়বাদে হৃদয়মাঝে হৃদয় হরণী !

Dhaka University Institutional Repository

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

[কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(২৪)

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।
আমি, তোমার চরণ-
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরন
আর কারো ধার ধারব না মা ।।
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর
হৃদয়ে তোর রতন রাশি-
আমি, জানি গো তার মূল্যে জানি
পরের আদর কাড়ব না মা।।

মনের আশে দেশ-বিদেশে
যে মরে সে মরুক ঘুরে
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুলতে সে যে পারব না মা।।

ধনে মানে লোকের টানে
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে
কারো কাছেই হারবো না মা।।

[কথাঃ ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর.]

(২৫)

আমি ভয় করব না ভয় করব না
দুবেলা মরার আগে, মরব না ভাই, মরব না।।
তরীখানা বাইতে গেলে

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না।।

শক্ত যা তাই সাধতে হবে
মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলবো ভেবে
পড়ব না, পাকের 'পরে পড়ব না।।

ধর্ম আমার মাথায় রেখে
চলবো সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে
সরব না, ঘরের কোণে সরব না।।

[কথাঃ ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(২৬)

ও আমার দেশের মাটি
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর-
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।।

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে-মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি
মর্মে গাঁথা।।
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার
মরণ তোমার বুকে-
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল সহা, সকল বহা
মাতার মতা।।

Dhaka University Institutional Repository

ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো
অনেক নিয়েছি মা-
তবু জানিনে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা !
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে-
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে
শক্তিদাতা ।।

[কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(২৭)

জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই ।।
হৃতমানে অপমানে নয় সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই।।
প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপেই হোক না
হোক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা তো সময়ের সারথী নিশিদিন
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র
দিয়েছি তো শান্তি আরো দেব স্বস্তি
দিয়েছি তো সম্ভ্রম আরো দেব অস্থি
প্রয়োজন হলে দেব এক নদী রক্ত
হোক না পথের বাধা
প্রস্তর শক্ত অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই
হতে পারি পথশ্রমে আরো বিধ্বস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধিকৃত নয় তবু চিত্ত
আমরা তো সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত
আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী।
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।
এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনদিন আমরা তো ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া আনবোই
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত সাক্ষরে
নতুন সূর্য শিখা জ্বলবেই
চলবেই চলবেই জনতার সংগ্রাম চলবেই।।

[কথাঃ সিকান্দর আবু জাফর। সুরঃ শেখ লুতফর রহমান]

(২৮)

ওরা আমার মুখের কথা
কাইড়্যা নিতে চায়
ওরা কথা কথায় শেকল পরায়
আমার হাতে পায়।।
কইতো যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়,
এখন, কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য কথা শোভা পায়।।
সইমু না আর সইমু না,
অন্য কথা কইমু না,
যায় যদি যাক দিমু সাধের জান,
এ জানের বদলে রাখুমরে ভাই
বাপদাদার জুবানের মান।।

Dhaka University Institutional Repository

হো - হো - হো - হো ।।
যে শুনাইছে আমার দেশে
গাও গেরামের গান,
নানান রঙে, নানান রসে
ভরাইছে তায় প্রাণ।
ধপ - কীর্তন ভাসান - জারী
গাজীর গীত আর কবির সারি
আমার এই বাংলাদেশের বয়াতিরা
নাইচ্যা নাইচ্যা কেমন গায়।।
ভুলিস নারে ওদের কথায়
ভাইরে করি মানা।
থাকতে জুবান হোসনে বোবা
চোখ থাকতে কানা।।
ওরে বোকা বাঙালী
দুইশো বছর ঘুমাইলি
আর কতকাল ঘুমাইবি বল
আহা, আর কতকাল ঘুমাইবি বল।।

[সংক্ষেপিত]

[কথা ও সুরঃ আবদুল লতিফ]

(২৯)

অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ - ভুমি
অবাক পৃথিবী আমরা যে পরাধীন
অবাব কি দ্রুত জন্মে ক্রোধ দিন দিন।।
অবাক পৃথিবী অবাক করলে আরো
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।
অবাক পৃথিবী অবাক যে বার বার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।।
হিসেবেরও খাতা যখনি নিয়েছি হাতে

Dhaka University Institutional Repository

দেখেছি লিখিত রক্ত-খরচ, রক্ত-খরচ তাতে।
এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী সেলাম তোমারে সেলাম।।

[কথাঃ সুকান্ত ভট্টাচার্য]

(৩০)

এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো
এই বন্যা মোরা রুখবো
মায়েদের বোনেদের শিশুদের
অশ্রু মুছবোই।।
কত অবহেলায় মোরা কেঁদেছি
কত ভাঙা বীণায় সুর সেধেছি
কত পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছি।
আর তো মোরা শুনবো না
কোন বাঁধা মানবো না
আমাদের পাওনা
হিসাবের খাতাতে তুলবোই।
আর অশ্রু নয় নয়
আর দুঃখ নয় নয়
আর নয় মায়েদের শিশুদের কান্না
অশ্রু ভিজা আর না।।
কত বাসনা পিষে মেরেছি
কত কামনায় জ্বলে পুড়েছি
মিছে প্রতারণার মোহে ঘুরেছি
চাই না কোন সান্তনা
নেব না তো আর বঞ্চনা
রক্তের ঋণ মোরা রক্ত দিয়েই
আজ শুধবো।।

[কথা ও সুরঃ আলতাফ মাহমুদ]

Dhaka University Institutional Repository

(৩১)

কারার ঐ লোহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট, শিকল পূজার পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশাণ উড়ুক প্রাচীর
প্রাচীর ভেদি।।
গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক, কে সে রাজা
কে দেয় সাজা, মুক্ত স্বাধীন
সত্যকে রে।
হা-হা-হা পায় যে হাসি।
ভগবান পড়বে ফাঁসি
সর্বনাশী শিখায় এ হীন
তথ্যকে রে।।
ওরে ও পাগলা ভোলা
দেরে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা জোরছে ধরে
হেচকা টানে।
মার হাঁক হায়দারী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক
জীবন পানে।।
নাচে ঐ কালবৈশেখী
কাটাবি কাল ঐ বসে কি
দেরে দেখি ভীম কারার
এ ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার ভাঙরে তালা

Dhaka University Institutional Repository

যতো সব বন্দীশালা
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা
ফেল উপারি।।

[কথা ও সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম]

(৩২)

সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।।
জানিনে তোর ধন-রতন, আছে কি মা রানীর মতন
শুধু জানি আমার অন্তর জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।।
কোন বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল
কোন গানে ওঠেরে চাঁদ, এমন হাসি হেসে।।
আঁখি মেলে তোমার আলো, প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতেই নয়ন রেখে, মুদবো নয়ন শেষে।।

[কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(৩৩)

এ আগুন নিভাইবো কেরে
এ আগুন নেভে নেভে নেভে না।।
এ আগুন জ্বলে দ্বিগুন
জ্বলবে দ্বিগুন
চাপা দিলেও নিভবে না।।
ঘরে ঘরে জ্বলে আগুন
আগুন - জ্বলে মনে মনে
এ যে তুষের জ্বালের আগুন জ্বলে
নিভাইবি কেমনে
হায় হায় নিভাইবি কেমনে
আইলোরে ঐ ঝড়ের হাওয়া
ছাই চাপা রবে নারে।।
ছাত্র কিষাণ মজুর ভাইরা

Dhaka University Institutional Repository

তারা উঠবে আবার ধুলা ঝাইড়া
তাঁদের আপন দাবি নেবে কাইড়া
ঐ ও তোর হুমকিতে ফল ফলবে নারে।।
তোমার ঐ জঙ্গী আইন
চলবে ক'দিন
যতই করো জারি
ঘরে ঘরে ডাক পাঠায় একুশে ফেব্রুয়ারী

[কথা সত্যেন সেন, সুরঃ শেখ লুতফর রহমান]

(৩৪)

মানবো না, বন্ধনে মানবো না
মানবো না, শৃংখলে মানবো না।।
মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা অধিকার
খর্ব করে যারা খর্ব করে
খর্ব করে যারা ঘৃণ্য কৌশলে মানবো না।।
দুই শতাব্দীর নাগপাশ বন্ধন
নিঃস্ব হলো কত অগণিত প্রাণ-মন।
দুঃশাসন ভেঙ্গে মুক্তির তরে হায়
লাখো শহীদের অমূল্য প্রাণ যায়
মূল্য যার তারা মসনদে গদীয়ান গদিয়ার
কণ্ঠরোধ করে লাঠি-রাইফেলে মানবো না।।
আজ দিকে দিকে আর্তের হাহাকার হায়রে
মাঁতা কাদে শিশু কাঁদে
ঘরে ঘরে অনাহার, অনাহার।
বিদেশীর পাতে উচ্ছিষ্টের ভোজে
স্বার্থবাদী তারা লুটের স্বরাজ খোঁজে।
অন্ন দেয় নাকো বুভুক্ষ জনতায় জনতায়
জনতার দাবি; দুই পায়ে দলে মানবো না।।

Dhaka University Institutional Repository

[কথাঃ সলিল চৌধুরী, সুরঃ শেখ লুতফর রহমান]

(৩৫)

মানুষ হ' (২) আবার তোরা মানুষ হ'
অনুকরণ খোলসভেদী কায়মনে বাঙালী হ'
শিখে নে দেশ বিদেশের জ্ঞান
তবু হারাশনে মার দান
বাংলা ভাবে পূর্ণ হয়ে সুধন্য বাঙালী হ'
করে বাংলাজাত প্রাণ
খেটে বাংলা সেবায় দান
বাংলা ভাষায় বুলি বলে
বাংলা ভাষায় নেচে খেলে
ষোল আনা বাঙালী হ' সম্পূর্ণ বাঙালী হ'
বিশ্ব মানব হবি যদি শাশ্বত বাঙালী হ'।।

[কথাঃ গুরুসদয় দত্ত]

(৩৬)

বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।।
লুঠ-করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড় -
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।।
নীচে বসে আছিস্ কে রে, কাঁদিস কেন?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে বাঁধিস কেন?
ধনী যে তুই দুঃখধনে, সেই কথাটি রাখিস মনে।
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে-
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে।।

[কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

Dhaka University Institutional Repository

(৩৭)

আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে সারা মন
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে
নেই কিছু প্রয়োজন।।
প্রাণে প্রাণে যেন তাই
তারই সুর শুধু পাই
দিগন্ত জুড়ে সোনারঙ ছবি
খেলে যায় সারাক্ষণ।।
বাতাসে আমার সবুজ স্বপ্ন দুলছে
কণ্ঠে কণ্ঠে তারই ধ্বনি শুধু তুলছে।
গানে গানে আজ তাই
এই কথা বলে যাই
নতুন আশায় এনেছি জীবনে
সূর্যের এ লগন।।

[কথাঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। সুরঃ আবদুল আহাদ]

(৩৭)

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।
তোমার গুলির তোমার ফাঁসির
তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা
ওজনে তা' এই জনতা, এই জনতা।।
তোমার সভায় আমীর যারা
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা
তোমার রাজা মহারাজা
করজোড়ে মাগবে বিচার
ঠিক যেন তা' এই জনতা।।
তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে
তারা ক্ষুদিরামের রক্তে ভিজে প্রাণ পেয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে
প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে
তারা গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে
প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে
প্রাণ পেয়েছে এই জনতা।।
নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়েরও ধারে
ক্ষমা তোমার চাইতে হবে,
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।
ঠিক যেন তা' এই জনতা।।

[কথাঃ সলিল চৌধুরী]

(৩৯)

ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি এসে গেছি আমরা
চোখে আজ স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠ ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।।
চিমনির মুখে শোনো সাইরেন শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ী ও কাস্তে
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।
শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা,
মৃত্যু ভয়ে ভীত বসে থাকা আর নয়
পরো পরো পরো যুদ্ধের সাজ।।
ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা

Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্ভেদ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা।।

[কথাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুরঃ শেখ লুতফর রহমান]

(৪০)

পায়রায় পাখনা
বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে
শান্তির পতাকা
অজগর নিঃশ্বাসে টলছে।
বুলেটের ডানা বেঁধা পাখনায়
পারাবত ওড়ে শুধু নীলিমায়
দুশমনী পাঞ্জায় প্রাণ যায়
পতাকার পদাতিক
পথ কেটে কেটে চলছে
সত্যের পথ লাল পিচ্ছল
শপথের মুখ চির উজ্জ্বল
মুক্তির ধ্রুপদে উচ্ছল
মহাকাল কানে কানে
জীবনের রূপকথা বলছে।
পায়রারা আপনারে পুড়িয়ে
জীবনের বীজ যায় ছড়িয়ে
মৃত্তিকা রাখে তাই কুড়িয়ে
সূর্যের বৃন্তে সোনালি সবুজ
দিন ফলছে।

[কথাঃ আবু বকর সিদ্দিক, সুরঃ শেখ লুতফর রহমান]

(৪১)

বিপ্লবেরই রক্ত রাঙা
ঝান্ডা ওড়ে আকাশে
সর্বহারা জনতার
এ জিন্দাবাদ বাতাসে

Dhaka University Institutional Repository

একটি কণ্ঠ কণ্ঠ একটি
যদি থামে থামে যদি
গর্জে শত শত গরজে
নিরবধি নিরবধি
কল্লোলিতা মহানদী মহানদী
যুগে যুগে দেশে দেশে
জ্বলে আগুন হুতাসে।
চাষী মজুর মজুর চাষী
ভুখা হুঁ
ঝেড়ে ফেলো ফেলো ঝেড়ে
সব প্রভু
একের শরিক শরিক একের
আজ বহু
মালিক মরে হলো রাজা
মেহনতি ঐ ভুঁই দাসে।
তপ্তমাটি অভিশপ্ত তপ্তমাটি
হলো খাঁটি রক্তে ভিজে হলো খাঁটি
লগ্ন গুণে পলি মাটি পলি মাটি
অঙ্কুরের প্রতিভাস
নব জীবন বিলাসে।।
এই পথে অভ্যুদয়
মুক্তি লাল সূর্যোদয়
আহা - হা - হা - হা - হা - হা - হা
শতফুল ফুটে রয় ফুটে রয়
পান্ডুলিপি শান্তি পায়
ধ্রুপদের নিশ্বাসে।।

[কথাঃ আবু বকর সিদ্দিক, সুরঃ শেখ লুতফর রহমান]

Dhaka University Institutional Repository

(৪২)

বাঁধ ভেঙ্গে দাও
বাঁধ ভেঙ্গে দাও
বাঁধ ভেঙ্গে দাও - ভাঙ্গো
বন্দী প্রাণ-মন হোক উধাও।।
শুক্‌নো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যা, উদ্দাম কৌতুক
ভাঙ্গনের জয়গান গাও (২)।।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক
আমরা শুনেছি ঐ, মাঁভৈঃ মাঁভৈঃ মাঁভৈঃ
কোন্ নতুনের ডাক
ভয় করি না অজানারে
রুদ্ধ তাহারই দ্বারে
দুর্বার বেগে ধাও।।

[কথা ও সুরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(৪৩)

জয় বাংলা, বাংলার জয়
হবে, হবে, হবে - হবে নিশ্চয়।।
কোটি প্রাণ এক সাথে
জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য ওঠার এইতো সময়।।
বাংলার প্রতিঘর ভরে দিতে
চাই মোরা অন্নে
আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে
মুক্তির দীপ্ত তারুন্যে
নেই ভয় .....
ক্ষয় হউক রক্তের হউক নাকো ক্ষয় (২)
তবু করি না, করি না, করি না ভয়।

Dhaka University Institutional Repository

অশল্থের ছায়ে যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্দ -
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুন হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ।
শাসনের নামে চলে শোষনের সুকঠিন যন্ত্র
বজ্রের হুঙ্কারে, শৃংখল ভাঙ্গতে
সংগ্রামী জনতা অতন্ত্র -
আর নয় .....
তিলে তিলে মানুষের এই পরাজয় (২)
আজ করি না করি না করি না ভয় ।।

উৎস ঃ

নাজিম সেলিম বুলবুল, আমাদের মুক্তিসংগ্রামে গণ-সঙ্গীতের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৭৯।
শেখ লুতফর রহমান, জীবনের গান গাই, ঢাকা, ১৯৯৩।
শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, গণসঙ্গীত, ঢাকা, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -৩

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

- আনিসুজ্জামান

বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সংগে আহমদ হোসেন ও আমার যে-আলাপ হয়, তাতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনের বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্‌যোগের কোন সম্ভাবনা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুহম্মদ আবদুল হাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে একটি প্রাথমিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনার আয়োজন করেন। যতদূর মনে পড়ে, শিক্ষকদের মধ্যে এতে উপস্থিত ছিলেন দর্শন বিভাগের গোবিন্দ দেব, ইংরেজি বিভাগের সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা ও খান সারওয়ার মুরশিদ, বাংলা বিভাগের মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম, আমিও ছিলাম। শিক্ষক নন্ এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ও আহমদ হোসেন। আমাদের বিভাগের এম এ ক্লাসের ছাত্র আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এসেছিলেন তাঁর সতীর্থ ইতিহাস বিভাগের মুশতাক হোসেনকে নিয়ে। হাই সাহেব একটু সতর্কতার সংগে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেছিলেন। তাতে আতীকুল্লাহ একটা কটু মন্তব্য করে ফেলেন। কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়। সভার শেষে হাই সাহেব জানতে চান মন্তব্যকারীর পরিচয়, আমি উত্তর দিই। *সমকালে* তাঁর *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিনের* একটা অনুদার সমালোচনা লিখেছিলেন আতীকুল্লাহ। হাই সাহেব জিজ্ঞেস করেন, 'ওকে এখানে কে ডেকেছে?' আমি বলি, 'বোধহয় হাসান হাফিজুর রহমান।'

এর আগে বা পরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ড. গোবিন্দ দেবের বাড়িতে - অর্থাৎ জগন্নাথ হলের প্রোভোস্টের বাসভবনে - একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেকে ছিলেন, তবে আমি উপস্থিত ছিলাম না। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের কক্ষে দ্বিতীয়বার আবার সভা বসে। এবারে গোবিন্দ দেব, জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা ও আতীকুল্লাহ আসেন নি, এসেছিলেন আগের সভার বাকি সকলে আর শিক্ষকদের মধ্যে নীলিমা ইব্রাহিম এবং ছাত্রদের মধ্যে আমাদের বিভাগের জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আর ইংরেজি বিভাগের মনজুরে মওলা ও আতাউল হক। যতদূর মনে পড়ে, এই

Dhaka University Institutional Repository

সভায় রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয়। বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুরশেদকে সভাপতি এবং খান সারওয়ার মুরশিদকে সম্পাদক করে। দুদিনে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, তারা সকলেই সদস্য, তাছাড়া আরো অনেকের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরে এই কমিটি পরিচিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটি বলে, কেননা এই কমিটি গঠনের পরে ঢাকায় আরো দুটি কমিটি গঠিত হয়। এর একটির সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল আর তার সংগে যুক্ত ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, মুখলেসুর রহমান ওরফে সিধু ভাই, আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন এবং আরো কেউ কেউ। এই কমিটি পরিচিত হয়েছিল গোপীবাগের কিংবা ওয়ারীর কমিটি বলে। সিধু ভাই ও তার স্ত্রী শামসুননাহার ওরফে রোজ নেপথ্য থেকে এই উদ্‌যোগের অনেকখানি ভার নিয়েছিলেন। তৃতীয় কমিটিকে বলা হতো প্রেসক্লাব কমিটি- এতে ছিলেন এ বি এম মুসা, সৈয়দ আসদুজ্জামান, এনায়েতুল্লাহ খান, এনামুল হক (জাতীয় যাদুঘর খ্যাত), ড. এম এন নন্দী এবং আরো কয়েকজন। ফয়েজ আহমদ তখন জেলখানায়, তবে কমিটিতে তার নাম ছিল। তিনটি কমিটি পর পর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়, কিন্তু একই সংগে একাধিক অনুষ্ঠানের সংঘাত এড়াতে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটে। স্থির হয়, ২৪ বৈশাখ ১৩৬৮ থেকে একটানা দশ দিন ধরে অনুষ্ঠান হবে - চারদিন কেন্দ্রীয় কমিটির, অপর দুই কমিটির তিনদিন করে। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে প্রথম দুই কমিটির অনুষ্ঠানের মহড়া হয়েছিল, তাদের নিজস্ব অংশের মহড়া তো বটেই, আর ভক্তিময় দাশগুপ্ত সার্বক্ষণিকভাবে সে সব তত্ত্বাবধান করেছিলেন। রেডিও পাকিস্তানের চাকরি করেও আবদুল আহাদ যথাসাধ্য করেছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে।

আমরা যেমন রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্‌যোগ নিলাম, প্রতিপক্ষও বসে থাকলেন না। দৈনিক *আজাদ* গোটা বৈশাখ মাস জুড়ে রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম-বিদ্বেষী, হিন্দু ভাবধারার বাহক এবং পাকিস্তানের সংস্কৃতিক্ষেত্রে অগ্রহণীয় বলে প্রচার করতে থাকলো। স্বয়ং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্বনামে রবীন্দ্র বিরোধী লেখা প্রকাশ করলেন। তবে আমরা পেয়ে গেলাম দৈনিক *সংবাদ* ও *দৈনিক ইত্তেফাকের* সমর্থন। *আজাদের* অপপ্রচারের জবাব দেওয়াই হলো ঐ দুই পত্রিকার প্রধানকাজ - সেইসংগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিতর্কের প্রসঙ্গ এড়িয়েও কিছু লেখা ছাপা হলো, অবে এসব সাহিত্য-সমালোচনা চলমান পরিস্থিতির উত্তাপ কমাতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় একদিন বিচারপতি মুরশেদ বললেন, অনুষ্ঠানের জন্যে যেন আমরা কেউ চাঁদা না তুলি। তার কারণ, পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁকে জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনের জন্যে ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন দুহাতে পয়সা ছড়াচ্ছে। আসলে ওই কর্মকর্তার উদ্দেশ্য ছিল এসব কথা বলে বিচারপতি মুরশেদকে এই উদ্‌যোগ থেকে সরিয়ে আনা। তিনি অবশ্য সেই ভদ্রলোককে জানান, তাহলে অনুষ্ঠানের অর্থ তিনি নিজে সংগ্রহ করবেন এবং এভাবে নিশ্চিত করবেন যেন বিদেশি কোনো অর্থ তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটির অনুষ্ঠানমালার জন্যে ব্যয় না হয়। অতব বিচারপতি মুরশেদ আমাদের চাঁদা তুলতে বারণ করে বললেন, অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব তিনিই নিলেন। পরে জেনেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের ইনসপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এ কে এম হাফিজউদ্দীনকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন টাকা তুলে দিতে। অনুষ্ঠানে শেষে দেখা গেল, কিছু ঘাটতি হয়েছে। আহমদ হোসেন ও আমার সামনেই বিচারপতি মুরশেদ টেলিফোনে আই জির সংগে কথা বললেন। টেলিফোন নামিয়ে বললেন যে, হাফিউদ্দীন বলছেন, অনুষ্ঠান শেষ - এখন আর কার কাছে চাঁদা চাইবেন তিনি ! ভগবতী ব্যানার্জি রোডে তাঁর সম্বন্ধী সাইদুর রহমান থাকেন- তিনি বলে রাখবেন, আমরা যেন তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসি। আমরা তাই করেছিলাম।

এখন বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে উল্লেখ পাচ্ছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্‌যোগে কার্জন হলে ১১ ও ১২ বৈশাখে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। বেগম সুফিয়া কামাল তা উদ্বোধন করেন এবং মুহমদ আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভায় কাজী মোতাহার হোসেন বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ এই অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেছিলেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেন যথেষ্ট আনুকুল্য করেছিলেন। তবে এই অনুষ্ঠানের কথা আমার স্মরণে নেই।

৭ মে ১৯৬১ সকালে ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় কমিটির চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। তিনি এসেছিলেন বিচারপতি মুরশেদেরই অনুরোধে এবং বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। বিচারপতি মুরশেদ সুললিত ইংরেজিতে সভাপতির ভাষণ দেন- তার একটা বাংলা ভাষ্য কেউ তৈরি করে দিয়েছিলেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। ওই ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈদিক ঋষি, ফারসি কবি ও বাংলার পর্যটকের মিলিত সত্তার কথা বলেছিলেন এবং দেশের সীমা ছাড়িয়ে তিনি যে বিশ্বের কবি হয়ে উঠেছিলেন, সে-বিষয় জোর দিয়েছিলেন। *বলাকার* সংগে তিনি তুলনা করেছিলেন ফারসি কবি ফরিউদ্‌দীন আত্তারের কোনো একটি কাব্যের। খুব ভাবাবেগের সঙ্গে নিজের রবীন্দ্র-সন্দর্শনের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছিলেন তিনি। খান সারওয়ার মুরশিদের ভাষণটি ছিল মেদহীন ও মনোজ্ঞ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বেগম শাসুননাহার মাহমুদ এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন শামসুর রাহমান আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের অধ্যক্ষ ও উর্দু কবি ড. ডব্লিউ এইচ এ শাদানী। আবৃত্তি ও সংগীত চলেছিল অনেকক্ষণ ধরে।

ওইদিন সন্ধ্যায় ঢাকা জেলা পরিষদ হলে আরেকটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছেলেবেলায় যাঁর স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম, সেই ফজলুল হক সেলবর্সী ছিলেন তার সভাপতি। এখানে বক্তাদের একজন ছিলেন গোলাম আযম, অন্যেরা ছিলেন মঈনুদ্দীন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, মওলানা মহীউদ্‌দীন, হাফেজ হাবিবুর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ও সঞ্জয় বড়ুয়া। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রচুর বিষোদ্‌গার হয়েছিল। আমি যতদূর জানি, এই সভাতেই সর্বপ্রথম - রবীন্দ্রনাথের নাম না করে - পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমী ও বেতারকেন্দ্রকে বিজাতীয় সংগীত-সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত করার আহবান জানানো হয়।

গোপীবাগ কমিটির অনুষ্ঠান বোধহয় বেগম সুফিয়া কামাল উদ্বোধন করেন, প্রেস ক্লাব কমিটির অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। দুটি আলোচনা সভা বসে ফজলুল হক মিলনায়তনে, একটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। একটিতে সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তাতে অংশ নেন শামসুননাহার মাহমুদ, আবু রুশদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা। আরেকটি সভাপতিত্ব করেন এস এন কিউ জুলফিকার আলী। তাতে অংশ নেন মুনীর চৌধুরী, রশীদ করীম, হাসান জামান ও রোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তৃতীয়টির সভাপতি কে ছিলেন, মনে নেই। সেখানে অজিতকুমার গুহ বক্তৃতা করেছিলেন আর শওকত

Dhaka University Institutional Repository

ওসমান প্রবন্ধ পড়েছিলেন। শওকত ভাই আমাকে বলেছিলেন, বোরহানের মতো দু-চারজন ছাড়া তাঁর প্রবন্ধ কেউ বুঝবে না। দু-চারজনের মধ্যে আমাকে গণ্য না করায় স্বভাবতই খুশি হতে পারি নি। আমি পালটা প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে জনসমক্ষে অমন প্রবন্ধ পড়ে লাভ কী?

বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের যেসম নাম নানাসুত্রে পাচ্ছি, তা উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্য হবে না। সংগীতানুষ্ঠান যে কতোগুলি হয়েছিল, তার হিসাব দেওয়া মুশকিল। এসবে অংশ নিয়েছিলনে লায়লা আর্জুমান্দ বানু, বিলকিস নাসিরউদ্দীন, সন্‌জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, বেলা রায়, গোপা বন্দ্যোপাধায়, নাসরীন চৌধুরী, ভক্তিময় দাশগুপ্ত, ফজলে নিজামী, আতিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুল হক ও জাহিদুর রহিম। জাহিদুর রহিমের সেটাই ছিল যথার্থ আত্মপ্রকাশ এবং ফাহমিদা খাতুনের পক্ষেও ব্যাপাক পরিচয় লাভ। কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন খুরশিদী আলম, হুসনে আরা, নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা চৌধুরী (পরে সেলিনা বাহার জামান), সাবিয়া বেগম (পরে সাবিয়া মুহিত), গোলাম মোস্তফা, রফিকুল ইসলাম, আহমদ হোসেন, ইকবাল বাহার চৌধুরী ও আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বেনজীর আহমদ্ হাবীবুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মিনরুজ্জামন, লতিফা হিলালী ও লতিফা হক।

নাকট মঞ্চস্থ হয়েছিল তিনটি - *রাজা ও রানী, রক্তকরবী ও তাসের দেশ*। প্রথমটির পরিচালক কে ছিলেন, মনে করতে পারছি না, পরের দুটির ছিলেন যথাক্রমে মকসুদ উস সালেহীন ও বজলুল করিম। মুনীর চৌধুরী, নূরুল মোমেন ও রফিকুল ইসলাম তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। এসব নাটকে যারা অভিনয়-কেউ কেউ একাধিক নাটকে - তাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম, মাসুদ আলী খান, দাউদ খান মজলিস, খোন্দকার রফিকুল হক, আনোয়ার হোসেন, রেশমা, কামেলা শরাফী ও হোসনে আরা লাইজু। কিছুটা সংক্ষেপ করে *চিত্রাঙ্গদা ও চন্ডালিকা* নৃত্যনাট্য এবং *শ্যামা* নৃত্যনাট্য সম্পূর্ণ মঞ্চস্থ হয়েছিল। নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়েছিলেন জিনাত গনি (তাঁর কন্যা মিলিয়া আলী সুপরিচিত রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী), মন্দিরা নন্দী, ফরিদা মজিদ, ফাহমিদা মজিদ (মঞ্জু), লায়লা নার্গিস (পরে হাসান), অজিত দে, জ্যাকব পিউরিফিকেশন, কামাল লোহানী ও মৃন্ময় দাশগুপ্ত। নৃত্যনাট্যে গান গেয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

সনজীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, ফজলে নিজামী, জাহিদুর রহিম, এনামুল হক ও চৌধুরী আবদুর রহিম। অনেকের কথা বাদ পড়ে গেল, কিন্তু তা ইচ্ছাকৃত নয়। নাচে-গানে কবিতায়-অভিনয়ে বক্তৃতায়-আলোচনায় দশটা দিন ঢাকা শহর মেতে ছিল। ঝড়বৃষ্টির কারণে একদিনের অনুষ্ঠান পিছিয়ে যায়, তাই জন্মশতবার্ষিকী শেষ হয় একাদশম দিনে।

ঢাকার বাইরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী বড়ো করে পালিত হয়েছিল চট্টগ্রামে। সেখানে গঠিত কমিটির প্রধান ছিলেন পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এম এ (মালিক আবদুল) বারি। সরকারি কর্মকর্তা হয়েও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ কাজ করেছিলেন। আবুল ফজল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এই অনুষ্ঠানমালায়।

এই উপলক্ষে পরে *সমকাল* রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা (চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা) প্রকাশ করে। বৈশাখ, ১৩৬৮-চিহ্নিত হলেও তা প্রকাশ পায় কিছু দেরিতে এবং বিভিন্ন আলোচনা-অনুষ্ঠানে পঠিত অনেক প্রবন্ধ তাতে সংকলিত হয়। ওই সংখ্যার সূচি এরকমঃ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ... ডক্টর মুহমদ শহীদুল্লাহ্
রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম ... আবুল ফজল
উত্তমবর্ণ পূর্বসূরী ... শতকত ওসমান
রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ... মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
শিক্ষা- সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ ... এস এন কিউ জুলফিকার আলি
ইংরেজী অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ... আবু রুশ্‌দ
বাংলা কাব্যে মূল্যবোধের বিবর্তন ঃ রবীন্দ্রনাথ ... হাসান হাফিজুর রহমান
রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান ... সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (হোসায়েন)
রবীন্দ্র-সাহিত্য মূল্যায়নের সমস্যা ....জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র ... মোহাম্মদ মরিরুজ্জামান
যে প্রেম সম্মুখপানে ... অশোক বড়ুয়া
রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ অধ্যায়ে মানবতাবোধ ... মোঃ দেলওয়ার হোসেন খান
বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ ...ডক্টর মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদ (মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা)
রবীন্দ্রনাথ ... এস এম মুরশেদ

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ... আখতার হামিদ খান

রবীন্দ্রনাথকে (কবিতা) ... সৈয়দ আলী আহসান

সূর্যাবর্ত (কবিতা) ..... শামসুর রাহমান

স্মরণে (কবিতা) ... বেনজীর আহমেদ

রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) ... জিয়া হায়দার

রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) ... সৈয়দ নুরুদ্দিন

সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথ ... ফখরুজ্জামান চৌধুরী

শেষ সপ্তক ও তার কবি মানস পরিচয় ... শ্রীঅরুণকুমার তালুকদার

রবীন্দ্র-কাব্যে অপূর্ণতার বেদনা ... মির্জা হারুণ-অর-রশিদ

উল্লেখযোগ্য যে, অনুষ্ঠানে অংশ না নিলেও সৈয়দ আলী আহসান *সমকালে* রবীন্দ্রনাথ- বিষয়ে কবিতা লিখেছিলেন। ফজলুল হক হল মিলনায়তনে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন যে-প্রবন্ধ পড়েন, সেটিই *সময়কালের* এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমি এর থেকে দীর্ঘ অংশ উদধৃত করতে চাই একাধিক কারণে ঃ

... পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় এবং কি, এ প্রশ্নটা একদিক থেকে খুব অদ্ভুত এবং উদ্ভটা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত, এ নিয়ে কোন বাকবিতন্ডায় প্রবৃত্ত হওয়াটাই নিছক পাগলামী।। কিন্তু তবু এ প্রশ্ন ওঠে কেন? রবীন্দ্রনাথকে বাংলা লেখক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে পাকিস্তানবাদের কোন মূল নীতিকে বর্জন করবার একটা গভীর ইংগিত আছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করা হয় কেন? ...

... জাতীয়তার প্রসারের সংগে সংগে অবশ্য জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ সব দেশেই দেখা দেয়, কিন্তু জাতীয় সাহিত্য অর্থ একটা দেশের নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য ছাড়া আর কি হতে পারে তা বোঝা মুশকিল। কোন বিশেষ মতবাদের অভিব্যক্তি থাকলেই সাহিত্য জাতীয় সংজ্ঞা লাভ করবার উপযুক্ত হবে এবং তা না হলে জাতীয় সাহিত্যের পর্যায় থেকে তাকে ছেটে ফেলতে হবে, রাজনীতিতে এ কথার দাম যাই থাকুক, সাহিত্যে এর কোন মূল্য নেই। ...

Dhaka University Institutional Repository

... পাকিস্তানবাদী হিসেবে আমরা একটি আলাদা জাতি। আমাদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে - এ অনস্বীকার্য। কিন্তু ভাষার দিকে থেকে অন্য কোন জাতির সংগে আমাদের মিল রয়েছে বলেই আমাদের জাতীয়তাবোধে ক্ষুন্ন হতে পারে, এ কথাটা সহজে গ্রহণ করা মুশকিল। আমাদের মনে যদি নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কোন সংশয় না থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকের রচনা সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? ...

.. রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের জাতীয় কবি নন, কথাটা সত্য হলেও নিতান্ত অবান্তর। কারণ, প্রথমত, জাতীয় কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোন বড় কবির পক্ষে গৌরবের কথা নয়। যাঁরা শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন, জাতি ও কাল নির্মমভাবে তাঁদের বর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তো বটেই তিনি আরও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য এইজন্য যে তাঁর জাতীয়তাবোধ তাঁর স্বজাতিপ্রীতি এর উর্দ্ধে রয়েছে তাঁর মানবীয় মূল্যবোধ। এই কারণেই শেক্সপিয়ার এবং চসার ইংরেজ হয়েও, ভলতের অথবা বালজাক ফরাসি হয়েও যেমন বিশ্বের শ্রদ্ধালাভ করছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অথবা আরও সংকীর্ণভাবে বলতে গেলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েও শুধু আমাদের নয়, সমগ্র পৃথিবীরই বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধার প্রাত্র। ...

.... যে বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি, রবীন্দ্রনাথের কাছে তার ঋণ অপরিসীম, এ সত্যটি যেন কখনই ভুলে না যাই। বাংলা ভাষাকে তিনি তাঁর নিজের সাধনার দ্বারা মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌছিয়ে দিয়ে গেছেন, যার ফলে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা স্থান পেয়েছে। -এর নজীর পাক-ভারত উপমহাদেশের আর কোন সাহিত্যে নেই, হিন্দী-মারাঠী-তামিল-তেলেগু কোন ভাষায়ই নেই। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের যা অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে ঘরের নিভৃতে হয়ত আলোচনা করা যায়, কিন্তু দুনিয়া জাহির করবার মত কিছু থাকে না । ....

উদধৃত শেষ বাক্যটি তখন খুব সাড়া জাগিয়েছিল এবং কাগজে-কাগজে মুখে-মুখে ঘুরেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রসংগীত-বিতর্কের সময়ে যাঁরা ১৯৬১ সালের অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেনজির আহমদ, আশরাফ সিদ্দিকী ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যা আরো উল্লেখ করা দরকার, তা এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশে (জেলে বসে) লেখা স্মৃতিকথায় সাজ্জাদ সাহেব জানিয়েছেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের সময়ে তিনি ব্যবহৃতহয়েছিলেন। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, আমার সম্পাদিত বরীন্দ্রনাথ (ঢাকা, ১৯৬৮) সংকলনে ১৯৬১ সালে লেখা কোনো কোনো প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হলেও তাঁর প্রবন্ধটি স্থান হয়নি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন অতিক্রম করে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের চাই, কেননা তিনি না থাকলে আমাদের আর কী থাকে! কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা, আমাদের বাঙালি সত্তাকে ধরে রাখতে হবে, পাকিস্তান সরকারকে তা গ্রাস করতে দেওয়া যাবে না। 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই'- এই মনোভাবই কাজ করেছিল সেদিন। তখন মনে হয়েছিল, এখনো মনে হয়, সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমরা সেদিন জয়ী হয়েছিলাম- ভাষা-আন্দোলনের মতো আরেকটি আন্দোলনে।

উৎস ঃ প্রথম আলো, ১. ১২. ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৪

সাক্ষাৎকার ঃ আবদুল গাফফার চৌধুরী

প্রঃ ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে বলুন।

উঃ ঢাকাতো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য মানে পাকিস্তান পূর্ব যুগ থেকে বিখ্যাত। বাংলা সাহিত্যের যে কল্লোল যুগ, কল্লোল যুগের অধিকাংশ লেখকই ঢাকা থেকে উৎপত্তি, যেমন- বীরেন্দ্র বসু, তারপর প্রসন্ন কুমার সেন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এরা কিন্তু ঢাকাতেই একাধারে ছিল। বিশেষ করে বীরেন্দ্র বসু ''কালের পুতুল'', প্রসন্ন কুমার সেন গুপ্ত ''কল্লোল যুগ'' এই দুইটা বইয়ে ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস আছে। ঢাকা ছিল কলকাতার পরেই নাটকের প্রধান বিচরণ স্থল। তারপরে সাহিত্য অগ্রণী পত্রিকা বের হত। 'ঢাকা প্রকাশ' নামে একটি কাগজ ছিল। 'সোনার বাংলা' নামে একটি কাগজ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে কাগজটিতে লিখতেন এবং নামটা উনিই দিয়েছিলেন। এটা বেরুতো বাংলা বাজারে শ্রীশ দাস লেইন থেকে। দেশ ভাগ হওয়ার পরে মানে ১৯৪৭ সালের পরে হঠাৎ একটা অস্থিতিশীলতা আসে। কারণ এই প্রকাশনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব ব্যাপারেই তখনকার হিন্দু মধ্যবিত্ত লিডিং রোলে ছিল। তাদের অনেকেই চলে যাওয়ার পরে মাঝখানে একটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল। এরপর কিন্তু রাজনৈতিক কারণে যখন বাঙালিরা বুঝতে পারলো যে তাদের সংস্কৃতির উপর আঘাত আসলো কারণ পাকিস্তানি শাসকরা প্রথমেই চেষ্টা করলেন মুসলমান বানানোর জন্য। বাংলা হরফ চেইঞ্জ করার জন্য আরবী শব্দ। তারপর তারা এমনভাবে বাংলা ভাষাকে চেইঞ্জ করা শুরু করলো যে বাঙালি আতস্কিত। যেমন একটা উদাহরণ দেই। ১৯৪৮ সালে রেডিও পাকিস্তান লেকে বাংলায় নিউজ বলা হত। করাচী থেকে রাজস্ব সচিব ঢাকায় বিমান বন্দরে অবতরণ করছেন, এটা বাংলা খবরে বলা হত যে, তিলের খাজানা, পাকিস্তানের তিলের খাজানা আর ঢাকার হাওয়াই বুক হাট্টায় এগুলো বাংলার সাথে কথা আছে, তারপরে মাহে নও নামে একটা কাগজ বের হত, তার ফার্স্ট পেইজে একটা ছবি ছেপেছে পাকিস্তান সরকারের ডেস্ট্রয়ার আরকি দিছে। লেখা আছে পাকিস্তান সরকারের নয়া খরিদ করা 'তাবাহ'। 'তাবাহ' মানে হচ্ছে আরবী শব্দ। মানে হচ্ছে ডেস্ট্রয়ার। এইভাবে তারা খুব কাজ করেছে এবং সংস্কৃতি ও ধারণা বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যকে শেষ করে দেওয়ার, বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে। এর বিরুদ্ধে '৪৮ ভাষা আন্দোলন শুরু হলো। 'ভাষা দিবস' ছিল ১১ ই মার্চ। এবং বিভিন্ন পাড়ায় লেখক সংঘ গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ তৈরী হয়। নানাভাবে বাংলা সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। যেটা সব সময়ই বেশি ছিল বাংলা ভাষায় সংস্কৃতির আন্দোলন। বাঙালির জাতি সত্ত্বাটাকে উদ্ধার করা। পাকিস্তানীদের আগ্রাসী ভূমিকা ছিল। এরপরতো ১৯৫০, ৫১, ৫২ সালে ভাষা আন্দোলন এমন পর্যায়ে গেল অনেকেই মারা গেলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে হারা শুরু করলো এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা 'যুক্তফ্রন্ট' আসতে থাকে। তাঁরা আসার সাথে সাথে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে করা হয় '৫৫ সালে এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে যে সংবিধান হয় সেখানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্বীকার করে নিতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় বিরাট বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সম্মেলন হয়। তাতে কলকাতা থেকে মনোজ বসু, অনেক লোক আসে। দ্বিজেন্দ্র নাথ বোস আরো বহু সাহিত্যিকরা এসেছিল। ঢাকায় যারা অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা ছিল তারাও আসে। এর মধ্যে যারা ধর্মীয় মতে বিশ্বাসী তারা সম্মেলন করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৫১ সালে এর আগে মুসলমানরা কাগজের নাম রাখতো তকদীর, আজাদ, ইনকিলাব। ১৯৫১ সালে প্রথম বাংলায় নাম দিয়ে কাগজ বের হয় 'সংবাদ'। আগেও বেরিয়েছে। পাকিস্তান আমলে প্রথম একটা বিদ্রোহ করে সংবাদ নাম দিয়ে পত্রিকা বেরিয়েছে। তারপরে আজাদে লেখা হয়েছিল এটা হিন্দুয়ানি ব্যবসা। কিন্তু লোকে তা গ্রহণ করলো এই বাংলা প্রীতি। ছেলেমেয়ের নাম বাংলায় রাখা হলো, মেয়ের নাম সন্ধ্যা। এখন প্রায় লোকের সমস্যা ছিল ওখানেই। সংবাদের আগেই বাংলায় একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের হয়। তখন দুর্নাম হয়েছিল। মাসিক কাগজের নাম হয়েছিল দ্যুতি। এইভাবে বাংলা ভাষার একটা নতুন গতি আসে। বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ হয়। ঢাকা ইউনির্ভাসিটির মেয়েরা বসন্ত উৎসব করা শুরু করে। শরৎ উৎসব। হিন্দু স্টাইলে শাড়ী পরে। কেউ পছন্দ করতো, কেউ করতো না। পছন্দ না হলে কিছু করার ছিল না। এগুলো বিরুদ্ধে গেলে কিছু করতে পারতো না। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হওয়ার পরে দেশে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের একটা বড় রকমের দুর্গ তৈরী হয়। যেমন- দলমত নির্বিশেষে যারা বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাস করে এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বাস করে তারা গেল। এবং এটাই

Dhaka University Institutional Repository

আমরা প্রচার করার চেষ্টা করেছিলাম। সংস্কৃতিটা চর্যাপদে ছিল। বাংলা সংস্কৃতিটা মিশ্রণ ছিল। বাঙালি জাতিটা মিশ্রণ জাতি। বাঙালিদের মধ্যে তুর্কী, পাঠান, সিন্ধু, গ্রীক, পর্তুগীজ নানা রক্তের মিশ্রণ বাঙালিরা ছিল। বাংলা ভাষারও যেমন- নজরুলের একটা কবিতায় একটা লাইনের ভিতরে একটা মাত্র বাংলা শব্দ ''আজকের অহশন জমীন ও আসমান''। যেমন- আ শব্দটা ছাড়া আর কোন বাংলা শব্দ নাই। এভাবে প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। কিন্তু সে বাংলা তার চরিত্র হারায়নি। বাংলা ভাষা হিসাবেই টিকে রয়েছে। এবং দেখা গেল লালন ফকির সে কোন জাতের আজ পর্যন্ত ঠিকমত বুঝা যায় না। ফকির লালন শাহ হিন্দু ছিলেন কি, বৈষ্ণব ছিলেন। বাংলা সংস্কৃতির আলাওল তারপরে মনসা মঙ্গল তার পাশাপাশি সাহিত্য এগুলো বাঙালিদের বিশ্ব সংস্কৃতির ধর ধর্ম আমাদের সংস্কৃতির বিকাশে সর্বত্র রয়েছে (অস্পষ্ট)। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। দুই সম্প্রদায়ের বিকাশ হয় ধর্মের ভিত্তিতে। সংস্কৃতি হচ্ছে আরবী, ফারসী এবং মধ্যপ্রাচ্যের ধারা (অস্পষ্ট)। শাড়ী পরা হিন্দুয়ানি, বাংলায় কথা বলা হিন্দুয়ানি, মাথায় পাগড়ী পরা হিন্দুয়ানি এই সবগুলো প্রচার মানে অপপ্রচার হয়েছে। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হওয়ার সময় ধীরে ধীরে তারা নিজের সংস্কৃতির শিকড়ের দিকে গেছে। তারা রুট নিয়েছে আমরা বাঙালি। তারা ভাল কাজে লিপ্ত হয়েছে। সংস্কৃতির যেগুলো ভাল দিক, আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে ঈদ করেছি, নামাজ পড়েছি, হজ্জ করতে গেছে আমাদের লোক কিন্তু নিজেদের যে একটা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যেটা দেখা যায় ইরানী সম্প্রদায়দের দেখা যায় আরবদের সাথ সম্পৃক্ত। আরব দেশে ইরানীরা মুসলমান হয়েছে আরবী সভ্যতার খাতিরে। আমাদের পর্তুগীজরা আছে, হিন্দু আছে। আমরা সর্বতোভাবে বাঙালি হতে চেষ্টা করেছি। আমরা হিন্দু ছিলাম, মুসলমান হতে চেষ্টা করেছি। আমরা বাঙালি না মুসলমান বাংলাদেশী না বাঙালি নানারকম বিতর্ক। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আমরা দেখি যে আমাদের সংস্কৃতি অবিভাজ্য, সংস্কৃতি এক, তার ফলে আমাদের শিকড়চ্যুত করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, হচ্ছে এবং এখনও হচ্ছে কিন্তু বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্য একই আছে এবং যেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই বাংলাদেশ। সেটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি এবং লোকজ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রঃ এই যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন মহল্লা ভিত্তিক কিছু সংগঠনের নাম কি আপনি বলতে পারবেন মহল্লায় যে কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যাপকভাবেতো হয়েছিল। কিন্তু মহল্লায় মহল্লায় কি কিছু গড়ে উঠেছিল ?

উঃ তখন অনেক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এমনকি এসব এরিয়াতে আদি ঢাকাবাসীরা উর্দুতে কথা বলতো। যেমন- কলতা বাজার সবুজ সংঘ। এটা ছিল পুরানো ঢাকায়। তারপরে শাখারী পট্টির অংশে ছিল। তারপরে উয়ারী মহিলা সংসদ, উয়ারী সাহিত্য সংসদ, উয়ারী পাঠাগার তারপরে ছিল পুরানা পল্টন।

প্রঃ এই সংঘের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের নাম কি মনে আছে আপনার ?

উঃ বাঙালি মেয়েদের ভিতরে মনে কর নাদেরা বেগম এবং গৃহবধুরা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তারা পুলিশের সাথে হাতাহাতি করেছেন। তখন এরা বিয়ে করেছেন নিজের ইচ্ছায়। নাদেরা বেগম থেকে শুরু আরো অনেকে আছেন। ইলা মিত্রের সময় এখানে ইলা মিত্র ছিলেন।

প্রঃ ওরা যে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করলেন এটা কেন হয়েছে ? শুধু কি সংগঠন গড়ার জন্য না সংগঠনের কার্যক্রমের জন্য ?

উঃ সংগঠন করার জন্য আরকি। যেমন নাদেরা বেগম উনার কাজ ছিল বিভিন্ন মেয়েদের ভিতরে আলোর প্রসার সৃষ্টি করা, মেয়েদের যে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, পুরুষের দাসত্ব করা যাবে না। তখন তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল। ওয়ারেন্ট হলেও বিভিন্ন বাড়িতে পালিয়ে তিনি থাকতেন। এ্যারেস্ট করার সময় অন্যের বাড়িতে ছিলেন। খুব মেমোরাইজড হয় ঘটনাটা। তারপরে কামরুন্নাহার লাইলী, হাফিজা চৌধুরী, জহরত আরা, মাসুদা চৌধুরী অনেক নাম বলতে পারি। যেমন- ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এখানে এই এরা নাটক করতো। ঢাকা শহরের মধ্যে নাটক করতো। মারতে আসতো। ১৯৫৪ সালে প্রথম এই ফরিদা পারভীন, মাসুদা চৌধুরী, সাবেরা মোস্তফা এরা ঠিক করলো ইউনিভার্সিটিতে তারা নাটক করবে। এইজন্য মোল্লারা মিছিল করেছিল। মাগীর গোষ্ঠী বংশচ্যুত হউক। আমি যখন সলিমুল্লাহ হলে ছিলাম। দ্বিতীয় নাটক যেটি হয় আমরা

Dhaka University Institutional Repository

কার্জন হলে পড়ি। তখন প্রচন্ডভাবে অনেক টিচার পর্যন্ত সমালোচনা করেছে। কারণ ছেলেরা মেয়েরা একসাথে অভিনয় করেছে। তাতে সুবর্ণার মা হোসনে আরাসহ আরো অনেকে নাটকটি করে। এইভাবে এই আন্দোলন এগিয়ে চলে। সমাজের চেহারাটা বদলে যায়। মেয়েরা সামনে এগিয়ে আসে। তারপরে অনেকভাবে লোকজন টিটকারী মারতো। মেয়েরা কলেজ, ইউনির্ভাসিটিতে হেটে যেতে পারতো না। ঘোড়ার গাড়িতে তার মধ্যে শাড়ী পেঁচিয়ে নিত। তাও নানারকম কটূক্তি করতো। কিন্তু আন্দোলনে জড়িত মেয়েরা শাড়ী পরে হেঁটে যেত। সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে মিছিল হত।

প্রঃ তখন মেয়েরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন। এগুলো নিয়েও নাকি খুব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ?

উঃ খুব বাধা হয়েছে। যেমন- ফরিদা পারভীন, শাহজাহান সিরাজ, কাজী শাহজাহান হাফিজ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন। এদেরকে রেডিওতে খুব কম প্রোগ্রাম দেয়া হত। রবীন্দ্র সঙ্গীত ব্যান্ড করার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে। এরা রবীন্দ্র সঙ্গীত খুব ভাল গাইতো। তারপরে নজরুল ইসলামের গজল গাইবে, তাঁর কীর্তনগুলা বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়েছে। প্রতিটা আন্দোলনেই সাংস্কৃতিক কর্মীরা সোচ্চার হয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, প্রগতিশীল লেখক সংঘ, কলতাবাজার প্রবীণ সংঘ এরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, আন্দোলন করেছে।

প্রঃ আপনি কি কোন সংঘের সাথে জড়িত ছিলেন ?

উঃ আমি পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাথে জড়িত ছিলাম। একজন মহিলা যিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। লায়লা সামাদ। সংবাদে প্রথম মহিলা পাতায় লিখতেন, বেগম পত্রিকাতে লিখতেন এবং উনি আগের থেকেই অতিরিক্ত করেছেন। রিক্সার হুড তুলে চলতেন।

প্রঃ এই যে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ছিলেন তাঁদের কারো সাথে কি আপনার পরিচয় আছে? অর্থাৎ যারা বেঁচে আছেন ?

Dhaka University Institutional Repository

উঃ হাঁ, কবি শামসুর রাহমান। তাঁর কবিতা ঈশ্বর লিখেছেন। তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে।

প্রঃ আপনি যেসব মহিলাদের কথা বললেন ?

উঃ কামরুন্নাহার লাইলী মারা গেছেন। ....(অস্পষ্ট) কাজী, উনার সাথে আলাপ আছে। উনি এখন কবিতার সাথে নিবদ্ধ নয়। অজয়া ....(অস্পষ্ট) উনি আছেন। উনি এখন অনেক ধার্মিক হয়ে গেছেন। (প্রঃ উনি কোথায় থাকেন ?) উনি বোধ হয় ঢাকায়ই থাকেন। এলাকার নাম বলতে পারবো না। ওর স্বামীর নাম কিবরিয়া। উনি নাকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন আর মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলেন। নাদেরা বেগম, সাবেরা মোস্তফা আছেন, তিনি সাংবাদিক কাজী গোলাম মোস্তফা তার স্ত্রী। উনারা লন্ডনে আছেন। আমিতো বহুদিন পরে ২২ বছর পরে ঢাকায় এসেছি। আরো পরিচিত বহুত আছে। ছেলেদের ভিতরে ফয়েজ আহমদ। তিনি পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সেক্রেটারী ছিলেন। আবদুল্লা-আল মুতি শরফুদ্দীন, শামসুর রহমান, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, দাউদ খান মজলিশ প্রচুর আছে। এরাই ছিল সামনের দিকে। তারপরে সায়িদ আতিকুল্লাহ।

প্রঃ ১৯৫৮ এর পর থেকে কিছু বলেন ?

উঃ সামরিক শাসন হয়। চারিদিকে প্রচুর গন্ডগোল ছিল। আইয়ুব খান বহু চেষ্টা করেছিল বাংলা ভাষায়-আরবী উর্দু ভাষা দেওয়া যাবে না। বরং রোমান হরফে বাংলা লেখার জন্য এরা চেষ্টা করেছে। ওরা বলছিল বাংলায় টাইপ রাইটার হয় না, এটা হয় না, সেটা হয় না, তাই রোমান হরফে লেখা হবে। তখন মুনীর চৌধুরী এটার প্রতিবাদ করে। এবং মুনির অপটিমা নামে একটা টাইপ মেশিন বের করে প্রথম দেখালো যে বাংলা ভাষায় টাইপ রাইটার, বাংলা ভাষায় টেলি প্রিন্টার দেওয়ার ব্যাপারে, বাংলা ভাষায়- এখনতো ইন্টারনেট হয়ে গেছে। তখন যে সমস্ত যান্ত্রিক প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ছিল সব কটাতেই বাংলা ভাষার ব্যবহার করতো, বাংলা ভাষার সংস্কার হত। কিন্তু বাংলা ভাষা যদি রোমান হরফে লেখা হয় তাহলে বাংলা ভাষাতো হাজার বছরের, এটাতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের আসল কথা হলো কি আমাদের ছেলেমেয়েরা

Dhaka University Institutional Repository

মুনির চৌধুরীর টাইপ মেশিন ধরতে পারলো না। ফলে প্রচুর বই আবার রোমান হরফে ছাপা হল। দুই বাংলা ভাষা বিকৃত হয়ে গেল। যেমন- বাংলা ভাষায় এমন শব্দ আছে যেগুলা রোমান হরফে উচ্চারণ করা যায় না। যেমন- ত, থ এই শব্দ গুলা উচ্চারণ করা যায় না। যেমন-'ত' তোমার বলতে পারি। কিন্তু টোমার বলতে হয়। যার ফলে বাংলা ভাষা বিকৃত হয়ে গেল। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। প্রচন্ড আন্দোলন। '৫৮ সালের পরে ভাষার পরিবর্তনে এটা আসে। তারপরে তারা চেষ্টা করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট, এখানে এক ইউনিট করে আমাদের শোষণ ও বঞ্চিত করতে। তাই ফিফটি ফিফটি করে দিল। ফলে আস্তে আস্তে বাংলা সংস্কৃতি অনেক চেইঞ্জ করলো। সেটাও কিভাবে তারা করেছে ? '৬৪ এ, '৬৫ এখানে শিক্ষা কমিশন ঐটার উপরে সাংঘাতিক আন্দোলন হয়। তারপরে ছয় দফার আন্দোলন আসে, এগারো দফার আন্দোলন আসে, '৬৯ এর অভ্যুত্থান আসে। তার ফলে আমাদের এই সাহিত্য সংসদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আসছিল।

প্রঃ সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলাতো রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে ? কিভাবে ?

উঃ যেমন -আওয়ামী লীগে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ বলে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মুসলিম আওয়ামী লীগাররা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ছিল। এই '৫৪ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট হয় তখন দেখা গেল বহু হিন্দু কবিয়াল, নাটকবিদ এরা গান লিখতো। যেমন রমেশ শীল। যত গ্রাম্য পুঁথি এরাতো কেউ কোন ধর্ম নিয়া কেউ কাজ করেনি। এক এক পুঁথিতে দেখবেন যে আল্লাহ খোদা মদীনার নামে বন্দনা। এই যে বন্দনা, তার পরেই বলছে পূবেতে বন্দনা করি পূর্বের মানুষের। দক্ষিণে বন্দনা করি- এই যে বন্দনাটা বন্দনার কোন জাতিতত্ত্ব নাই। সমস্তটাই সব সময়ই সেগুলো মিক্সড। ওরাই গযল লিখেছে আবার খালি বন্দনার কথা লিখেছে। বাংলা ভাষা এইভাবে মিক্সড হয়ে গেছে। মন্দির, মসজিদ পাশাপাশি গীর্জা। একই জায়গায় মসজিদ, একই জায়গায় মন্দির। এই চেতনাটা '৪৭ সাল থেকে আস্তে আস্তে বিকাশ লাভ করে যে আমরা বাঙালি। এই বোধটা আমাদের ভিতরে আসতে থাকে। এবং এতই- ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িক হয়ে যায়। তারপরে আওয়ামী লীগ হয়। তারপরে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করলো। আগে এই দেশে যুক্ত নির্বাচন হয়েছে। সেপারেট ইলেকটরেট ছিল। মানে হিন্দুরা

Dhaka University Institutional Repository

আলাদা ভোট দিত, মুসলমানরা আলাদা ভোট দিত। সেপারেট ইলেকটরেট বলতো। আন্দোলনের ফলে জয়েন্ট ইলেকটরেট হয়। এখন হিন্দু মুসলমান কোন পৃথক ভোট থাকবেনা। এখন পর্যন্ত যেটা আছে। কিন্তু যুক্ত নির্বাচনে পরে আওয়ামী লীগ নন কুম্যুনাল প্রতিষ্ঠান। নাম আওয়ামী লীগ। মুসলিম বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে ন্যাপ আরো পলিটিক্যাল পার্টি মুসলমান শব্দটা বাদ দিয়েছে। মুসলিম লীগ এক ঘরা হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ ....(অস্পষ্ট) পরিত্যাগ করেছে এবং কিছুদিন সামরিক শাসন দিয়ে ঠিকই দেখা গেছে আলটিমেটলি আর পারেনি, বাংলাদেশ স্বধীন হয়ে গেছে। কারণ ছয় দফা ছিল কালচারাল ম্যুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত। '৬৯ এ অভ্যুত্থান হয়, শিক্ষা আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের গান বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করছিল, সেটা ব্যর্থ হয়। প্রেস অর্ডিনেন্স ব্যর্থ করা হয়। সবগুলি সাংস্কৃতিক কর্মীরা করেছে। রাজনীতিবিদরা পরে আসছে। মূলত সাংস্কৃতিক কর্মীরা আগেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। তারপরে আমাদের সঙ্গে যে আন্দোলনগুলো প্রোগ্রেসিভ কালচারাল ম্যুভমেন্টগুলা সব সময়ই আমাদের রাজনীতিকে ঘিরে করেছে। এটা একেবারে বাংলাদেশ হওয়া পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক কর্মীরা করেছে। এখন বাংলা একডেমীতে সাহিত্য মেলা হয়েছে। এখন এই নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল সব এগুলোই কিন্তু বি এন পি বা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলা এই যে মৌলবাদী-অবশ্য আওয়ামী লীগও অনেকটা এগুলো করেছে। বিছমিল্লাহ বল, এই বল, সেই বল। কিন্তু এ্যকচুয়েলি এই প্রভাবটা থাকবেনা। আমাদের যে শেকড় এই শেকড়টা মুসলমান থাকবে নামাজ রোযা করবে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি যে ধর্মনিরপেক্ষ এটা বার বারই ফিরে আসবে। এটা আমার বিশ্বাস। বিশ্বাসটা ভাংগার কোন কারণ দেখিনা।

প্রঃ আচ্ছা তখন যে প্রতিবাদী নাটকগুলা হয়েছিল তার কয়েকটা নাম বলতে পরবেন?

উঃ এগুলাতো ১৯৫৪ সালেই হয়। নীল দর্পণ নাটক মন্ঞ্চস্থ হয়, তার চেয়ে বড় কথা মুনীর চৌধুরীর কবর, ভাষা আন্দোলনের ওপরে। এটা সাংঘাতিকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। সরকার ব্যান্ড করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। কারণ এটা সর্বত্র স্কুল, কলেজে মন্ঞ্চস্থ হয়। এটা ভাষা শহীদদের নিয়ে লেখা। তার পরে এখানে একজন নাট্যকার ছিলেন। মুকুজদা.........(অস্পষ্ট) উনিও এই ধরনের নাটক লিখতেন। তারপরে নুরুল মোমেনের নাটক একেবারেই ....(অস্পষ্ট) মত ছিল। খাঁটি বাঙালির ইতিহাস। নেমিসিস তার

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের নাম। এরপর থেকে দেখা গেল যে নাটক, গান সর্বত্রই আগের সেই ....(অস্পষ্ট) নেই। তার মানে আমরা আগে মুসলমানরা আল্লাহ লিখতাম, হিন্দুরা ঈশ্বর লিখতো। সেটাও উঠে গেল। দেখা গেল যে আল্লাহ ঈশ্বর দুটোই আমাদের সাহিত্যে এসছে। শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রচুর ঈশ্বরের কথা আছে। আবার এখন পশ্চিমবঙ্গে অনেক কবিতায় আল্লাহ, নামায, রোযা এইসব আসছে। পর্দা ছিল যেটা সেটা থেকেও বেরিয়ে এসেছে। তার ফলে এই সংস্কৃতি রাজনীতিতে আবার বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ কিন্তু অবিভাজ্য সংস্কৃতি এখানো আছে....(অস্পষ্ট) । যেমন- আরব, আরব জাতি, আরব জাতি বলতে একটা দেশকে বোঝায় না। সৌদি আরব, ইয়েমেন, ইজিপ্ট। ইরাক সব দেশ। কিন্তু তাদের চেহারা আলাদা, দেশ আলাদা। ইংরেজরা ভাষার জোরে টিকে আছে। সাম্রাজ্য চলে গেছে। কিন্তু আজকে ইংরেজি ভাষা না শিখলে, অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড এরাতো ইংরেজি ভাষী। সারা পৃথিবীতো ইংরেজী দাদা। তারপরেও ওদের অর্থনৈতিক শক্তি খুব বেশী। ওরা ইংরেজি ভাষার ভিত্তিতে যে জাতীয়তা, আতিথিয়তা, বুরোক্রেসী তারপরে এই যে ব্যবসা-বাণিজ্য আজকে ইংরেজি ভাষা বিক্রি করে ইংরেজরা এখনও টিকে আছে। বাঙালিরা কোথায় ২২/২৩ বছর হয়ে গেল- বাংলা ভাষায় একটা বই ছাপা হলে, বই বাজাতে এসেছে। হয়তো দুই হাজার বা পাঁচ হাজার ছাপা হলো কিন্তু আমাদের যে ওয়ার্ল্ড মার্কেট নেই, বাঙালি ভাষাভাষির, যেমন- আমাদের ছায়াছবি, উপন্যাস, গল্প এগুলোর মার্কেট নেই। ভাষা যদি আরো উন্নত হয়, তাহলে আমাদের ভাষার সম্মান হচ্ছে। যেমন পারসিকরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু সভ্যতা নষ্ট হয়নি। ভাষা গ্রহণ করেনি। ইরানিরা মুসলমান। তারা তাদের ভাষাকে ছাড়েনি।

প্রঃ আমরা এই বিষয়ে কোথায় গেলে বিস্তারিত তথ্য পাব ?

উঃ আমার একটা বই আছে বাংলাদেশী না বাঙালি। বইটাতে আপনি পাবেন। ধীরে বহে বুড়িগঙ্গায় আমি ৫০ থেকে আরম্ভ করে' ৭০ এর দশক পর্যন্ত স্মৃতিকথা লিখেছি। তাতে এসব কাহিনীগুলো আছে। ধীরে বহে বুড়িগঙ্গায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খন্ড বেরিয়েছে। বাঙালি না বাংলাদেশী এটাও বের হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রঃ আপনারা আন্দোলন করতে গিয়ে কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই সময়ে এই ধরনের কোন ঘটনা অথবা সেই সময় আন্দোলনটা কি প্রভাব ফেলেছিল ?

উঃ আন্দোলন বলতে যেমন বললাম মেয়েদের অভিনয় করতে দেবে না, সেটা আমরা ভেঙ্গেছি। এ ধরনের শব্দ দেখলে বলতো এটা হিন্দুয়ানি। মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দিতে হবে। হিন্দু উৎসব, ছায়ানট যখন তৈরী করা হয় এগুলো সংস্কারের জন্য ওরা রমনা পার্কে অনুষ্ঠান করছে, আমরাও শহীদ মিনারে আসছি। এখানে পর্যন্ত ওরা প্রতিরোধ করেছে। এবং এইজন্য সনজিদা খাতুনকে খুব অত্যাচার করেছে। যেহেতু উনি মাষ্টারি করতেন। যারজন্য উনি সংসারটা করতে পারেননি। তাছাড়া শামসুর রাহমান রূপালি স্নান নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন। এটা সংবাদের সাহিত্য, সাময়িকীতে বাদ দেওয়া হয়।

প্রঃ সরকার থেকে কি এর বিরুদ্ধে খুব অত্যাচার হত ?

উঃ খুব, খুব অত্যাচার করা হয়।

প্রঃ আচ্ছা অত্যাচারগুলি কিরকম ছিল ? অর্থাৎ কতটা কঠিন বা রুঢ় ছিল ?

উঃ যেমন মেয়েরা কলেজে আসছে, দু'পাশ থেকে চিৎকার করতো। চিকা চিকা চিকা এগুলো বলতো। অশ্লীলভাবে তাদের বিরুদ্ধে আচরণ করতো। তখন সেটাকে প্রতিরোধ করে দেওয়া, তারপরে পাঁচ পান্ডুর নামে একটা গুন্ডা ছিল। সে মেয়েদেরকে রেইপ করার চেষ্টা করছে। ঘরে এসে মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে। কারণ তারা ঐ মাথায় কাপড় দিত না।

প্রঃ আচ্ছা এগুলো নিয়ে তখন লেখালেখি হয়েছিল ?

উঃ হাঁ। পাঁচ পান্ডুরকে মারা হল পরে। সলিমুল্লাহ হলে ছেলেরা একত্র হয়ে করেছে কাজটা। পাঁচ পান্ডুর বলতে ঢাকা শহরে কাঁপতো সবাই। তারপরে মেয়েদেরকে বাঁধা দিত। যে বসন্ত উৎসবে যেও না। বাপ মা'রা চেষ্টা করতো নাটকে যাতে না যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এখনতো অনেক স্বাধীন। তখন মানে ঘরে ঘরে ফ্যামিলি পলিটিক্স ছিল। উমুকের নাম করে নাটকের নাম করে ধমকাতো মেয়েদের খারাপ করে দিচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে যখন আমরা পড়ি তখন ক্লাসে ঢুকার সময় মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো, প্রফেসর না আসা পর্যন্ত। স্যার ঢুকলে মেয়েরা তার পিছন পিছন ঢুকতো, আবার স্যার বের হতে গেলে মেয়েরা আগে বের হত। তারপরে প্রফেসররা বের হত। যদি কোন কারণে প্রফেসর না আসতো মেয়েরা ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো। আমাকে একবার পাঁচ টাকা ফাইন দিতে হয়েছে। মেয়ের কাছ থেকে নোট চেয়েছিলাম, তা লেডিস কমনরুম ছিল তার সামনে গিয়েছিলাম। তখন ওয়ার্নিং দিল যে ভবিষ্যতে আবার লেডিস কমনরুমের ঐখানে গেলে আমাকে বহিষ্কার করা হবে। এভাবে নানারকমের কষ্ট দেয়া হত। মেয়েদের গার্ডিয়ানদের কাছে চিঠি যেত। তোমার মেয়েকে আজকে দেখা গেছে এরকম ছেলের সঙ্গে বসে গল্প করতে। উমুক হলে ইউনিভার্সিটি ছুটির সময় টিউটোরিয়াল ক্লাসে বা উমুক জায়গায় হয়তো নোট নিয়ে আলাপ আছে। এটাও খুব কষ্ট হয়েছে। একমাত্র বাংলা ডিপার্টমেন্টের একটা পিকনিক হতো বছরে। ইয়ারলি পিকনিক। সেটাতেও কয়জন টিচার যাবে তাদের সঙ্গে এটাচ করে দেওয়া হত মেয়েদের। নানারকম অত্যাচার, পাকিস্তান হওয়ার পরে এটা বেশি হয়। তবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট দেখাতে হতো। যে আই এ্যাম নট এসোসিয়েটেড উইথ.....(অস্পষ্ট)। মানে হলো বাংলা ভাষার পক্ষে কথা না বলা, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জয়েন করা এগুলো করলে পুলিশের কাছে একটা কালো রিপোর্ট যেত। ফলে ভালরকমের ফলাফল বা ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হলে তাকে গভর্ণমেন্ট চাকরি দেওয়া হতো না। এই যে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হাবিবুর রহমান সাহেব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ছিলেন। উনি যখন ফার্ষ্ট ক্লাস ফাষ্ট হয়ে গেলেন চাকরি দেয় না । ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেয়া হলো। উনি করলেন কি গলায় একটা পান বিড়ি সিগারেট বিক্রি করে যে, এগুলো একটা নিয়ে ঢাকায় বিভিন্ন বাসে উঠে চাই পান বিড়ি সিগারেট, চাই পান বিড়ি সিগারেট বলে দুই মাস পান বিড়ি সিগারেট বিক্রি করেছিলেন। এটা আবার খবর হয়ে ছাপা হল। কাগজে বের হল ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট এল এল বি কার বিরুদ্ধে তোমরা কাজ কর ....(অস্পষ্ট)। তখন গভর্ণমেন্ট তাকে একটা চাকরি দিল। বহু হাস্যকর ব্যাপার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রঃ তার মানে যে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ওরকম নির্যাতন সত্ত্বেও তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। এ লক্ষ্যগুলা কি সব পূরণ হয়েছিল ? অপূর্ণ দিকটা কি ?

উঃ মোটামুটি বাংলাদেশ হওয়া পর্যন্ত যেমন- নারীর দিক। নারীর স্বাধীনতা মোটামুটি এসেছিল। মেয়েরা শাড়ী পরে ঘোরাফেরা করত তারপর আবার শুরু হয় ব্যাকলেস। এই '৭৫ এর পর থেকে আবার শুরু হয় -এই সামরিক শাসন আসার পর থেকে আবার নানা রকম, কিন্তু রাখতে পারেনি। সমাজকর্মীদেরকে আটকে রাখা যায় না। সেইজন্য দেখা যায় মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে, যে গ্রামের মেয়েরা চলে আসছে লক্ষ লক্ষ। গার্মেন্টস হয়েছে, বিউটি পারলার এখানে সেখানে কাজ করছে। কিন্তু সামাজিক অবস্থাতো খারাপ। কিন্তু এ্যাকচুয়েলি জামায়াত ইসলামী বা মৌলবাদীরা এদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চায়। এই যে বেরিয়ে এসেছে এর থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইউরোপে নারী মুক্তি এসেছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়্যারে। জার্মানীরা এসে গ্রাম ভেঙ্গে দিয়েছে, বাড়ি ভেঙ্গেছে, মেয়েদের উপরে অত্যাচার করেছে। তারা যে কাজের জন্য বেরিয়েছে আর ফিরে যায়নি। এভাবে স্বাধীন হয়েছে। এদেশেও আমাদের হাজার হাজার নারী, লক্ষ লক্ষ নারীর ওপরে অনেক নির্যাতন করেছে। অসম্ভব নির্যাতন করেছে। যশোর যখন মুক্ত হয় তখন বাংকার থেকে ১০/১২ টি ন্যাংটা মেয়ে ইন্ডিয়ান সৈন্যরা বের করে এনেছে। ওদের কাপড় পরাবার জন্য শিখ সৈন্যরা মাথায় পাগড়ী খুলে দিয়েছে। এরকম প্রতি জায়গায় তার মধ্যে হিন্দু মেয়ে ছিল, মুসলমান মেয়ে ছিল, শিক্ষিত মেয়ে এম. এ পাশ মেয়ে ছিল। যুদ্ধের পরে প্রচুর মেয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল প্রেগনেন্ট, নানারকম সমস্যায় জর্জরিত অবস্থায়। এই যে মানুষের মনে ভীতিটা নষ্ট হয়ে গেছে, ভেঙ্গে গেছে, কুসংস্কারটা ভেঙ্গে গেছে, যে ছেলেরা দেখলে আমাদের অসুবিধা নেই। এই আরকি। আর বাংলাদেশ হওয়ার পরে এগুলো আর এত গোঁড়ামি ছিল না। পলিটিক্যালি আর কোন হুশিয়ারি ছিল না এই ব্যাপারে।

প্রঃ আচ্ছা আপনি যে বললেন এই বিষয়গুলো নিয়ে ঐ সময়ে পত্রিকায় লেখালেখি হত। এই পত্রিকার উপরে আবার এ্যাকশন আসতো না ?

উঃ হ্যাঁ হতো। তখন বহু পত্রিকা ব্যান্ড হয়েছে। ইত্তেফাক বোধ হয় আমার দেশ নামক একটি কাগজ ছিল সেটিও ব্যান্ড হয়েছে। ....(অস্পষ্ট) থেকে বেরিয়ে হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। আড়াই বছর জেলে ছিল। জহুর হোসেন জেলে ছিল। তারপরে জিয়াউর রহমানের আমলে বেরিয়েছে। কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস জেলে ছিল। বহু সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ জেলে ছিল। ফয়েজ আহমদ সাত বছর জেলে ছিল। অনেকের পাসপোর্ট, আমার পাসপোর্ট সীজ করে। বাইরে যেতে দিত না। চাকরি দেওয়া হত না। বহুত লোকের চাকরি গিয়েছিল। রেডিওতে প্রোগ্রাম দিত না। শামসুর রাহমানতো প্রোগ্রাম করে একেবারে শেষ দিকে, '৬৬ এ। লেখা ছাপাতে দিত না। আজাদ, মোহাম্মদী, ...(অস্পষ্ট) গভর্ণমেন্ট কাগজে ছাপা হত না। এমন নির্যাতনের জন্যই আজকে বাংলাদেশ এই অবস্থায় এসেছে। এখনও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মুসলিম জাতীয়তা, বাংলাদেশী জাতীয়তা ....(অস্পষ্ট)। এই আরকি।

আপনাকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ রোজিনা কাদের

দিলরুবা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. বাংলা ভাষার রচিত বই

আতাউর রহমান খান ঃ *ওজারতির দুই বছর*, ঢাকা, ১৩৭১।

আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ ঃ *ভাষা-আন্দোলন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ঢাকা, ১৯৯০।

আবদুল হক ঃ *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৯৩*, ঢাকা, ১৯৯৬।

আবদুল্লাহ্ আবু সাঈদ ঃ *বিদায় অবন্তী !* ঢাকা, ১৯৯৫।

আবু আল সাঈদ ঃ *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, ১৯৯৩।

আবুল কাসেম ফজলুল হক ঃ *মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পাদিত) ঃ *গৌরবের চল্লিশ বছর ঃ ১৯৫২-৯২*, ঢাকা, ১৯৯৩।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৬৮।

আবুল মনসুর আহমেদ ঃ *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭৫।

আবুল মোমেন ঃ *সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, ঢাকা, ১৯৯৬।

ইসরাইল খান ঃ *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, ঢাকা, ১৯৯৯।

এম. এম. আকাশ ঃ *ভাষা আন্দোলন ঃ শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ঢাকা, ১৯৯০।

ওবায়দুল হক সরকার ঃ *সেকালে আমাদের নাট্যচর্চা*, ঢাকা, ১৯৯৫।

ওয়াহিদুল হক ঃ *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কবির চৌধুরী ঃ *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা ১৯৯৯।

কামাল লোহানী ঃ *প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ঢাকা, ১৯৯৮।

গোলাম মুরশিদ ঃ *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ ঃ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র চর্চা*, ঢাকা, ১৯৮১।

চিত্তরঞ্জন সাহা প্রকাশিত ঃ *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৭৪।

তাজউদ্দিন আহমদ ঃ *ডায়েরী, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড*, ঢাকা, ২০০০।

নাজিম সেলিম বুলবুল ঃ *আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে গণ-সঙ্গীতের ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৭৯।

বদরুদ্দীন উমর ঃ *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খন্ড)*, ঢাকা, ১৯৯৫, এবং *৩য় খন্ড*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।

বদরুদ্দীন উমর ঃ *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে*, ঢাকা, ২০০০।

বশীর আল হেলাল ঃ *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯।

বিনয় ঘোষ ঃ *বাংলার বিদ্বৎ ও সমাজ*, কলকাতা, ১৯৭৮।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ঃ *মুক্ত কর হে বন্ধ*, ঢাকা, ১৯৭৫।

মনসুর মুসা সম্পাদিত ঃ *বাঙলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৪।

মাহমুদ নুরুল হুদা ঃ *আমার জীবন স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৯৯।

মুনতাসীর মামুন ঃ *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৯৭।

মুনতাসীর মামুন ঃ *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৭৯।

মুনতাসীর মামুন ঃ *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর মামুন ঃ *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান*, ঢাকা, ১৯৯১।

মুনতাসীর মামুন ঃ *পূর্ববঙ্গের সভাসমিতি*, ঢাকা, ১৯৮৪।

মুনতাসীর মামুন ঃ *যেসব হত্যার বিচার হয়নি*, ঢাকা, ২০০০।

মুনতাসীর মামুন ঃ *সেই সব পাকিস্তানী*, ঢাকা, ১৯৯৯।

মুনতাসীর মামুন ঃ *বাংলাদেশের উৎসব*, ঢাকা, ২০০০।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায় ঃ *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৫।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায় ঃ *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৪।

মুস্তাফা নুরউল ইসলাম ঃ *সময়ের মুখ তাঁহাদের কথা*, ঢাকা, ১৯৯৭।

মুস্তাফা নুরউল ইসলাম (সম্পাদিত) ঃ *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) ঃ *স্মৃতিকথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা, ১৯৯২।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম (সম্পাদিত) ঃ *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৫২, ৩য় খন্ড সংস্করণ ১৯৬৯।

মোহাম্মদ ফরহাদ ঃ *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, ১৯৮৯।

মোঃ মাহবুবর রহমান ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৯৪৭-৭১, ঢাকা, ১৯৯৯।

মোহাম্মদ হাননান ঃ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৪।

মোহাম্মদ হাননান ঃ *ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খন্ড)*, ঢাকা, ১৯৯৩।

রেজোয়ান সিদ্দিকী ঃ *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৯৬।

রেহমান সোবহান ঃ *বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুজ্জামান খান ও কল্যানী ঘোষ ঃ *গণসঙ্গীত*, ঢাকা, ১৯৮৫।

শেখ লুতফর রহমান ঃ *জীবনের গান গাই*, ঢাকা, ১৯৯৩।

সাঈদ-উর রহমান ঃ *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা, ১৯৮৩।

সালাউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ঃ *সংগ্রামের ইতিহাস*, ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা, ১৯৯৯।

সিরাজুল ইসলাম ঃ *পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি*, ঢাকা, ১৯৬৯।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪ - ১৯৭১ *(৩য় খন্ড)*, ঢাকা, ১৯৯৩।

সুকুমার বিশ্বাস ঃ *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকা, ১৯৮৮।

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ঃ *বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৬।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ঃ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, ১ম ও ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২।

হাসান গারদেজি ও জামিল রশিদ (সম্পাদিত) ঃ *পাকিস্তান ঃ ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৮৬।

হুমায়ুন আজাদ ঃ *ভাষা-আন্দোলন ঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, ঢাকা, ১৯৯০।

২. ইংরেজি ভাষায় রচিত বই

Barnard, Alan and Spancer, Jonathan (edited) ঃ *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*, London, 1996.

Ghosh, Shyamali ঃ *The Awami League*, Dhaka, 1990.

Khan, Mohammad Ayub ঃ *Friends not Masters*, Karachi, 1967.

Said Edward ঃ *Culture and Imperialism*, London, 1964.

Sen, Rangalal ঃ *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ

আনিসুজ্জামান ঃ 'রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক', চিত্তরঞ্জন সাহা প্রকাশিত *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৭৪।

আনিসুজ্জামান ঃ 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী', প্রথম আলো, ১-১২-২০০০।

আবদুল হালিম ঃ 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৬-১৯৬৯' সালাউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা, ১৯৯৯।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ঃ ' 'নীরব সংঘ' ও রবীন্দ্রনাথ', *বিদায় অবন্তী*, ,ঢাকা, ১৯৯৫।

আবুল কাসেম ঃ 'ভাষা আন্দোলন ও তমদ্দুন মজলিশ', *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৬৯।

আবদুল মোমেন ঃ 'সমাজ প্রগতি গণতন্ত্রায়নে সংস্কৃতির ভুমিকা', *সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, ঢাকা, ১৯৯৬।

ওয়াহিদুল হক ঃ 'রবীন্দ্র সঙ্গীত ঃ পূর্বধারা', মুস্তাফা নুরউল ইসলাম সম্পাদিত *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩।

কবীর চৌধুরী ঃ 'বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকটঃ কৃত্রিম সমস্যা (?)', মুস্তাফা নুরউল ইসলাম সম্পাদিত *আবহমান বাংলা*, ঢাকা,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩।

করুনাময় গোস্বামী ঃ 'সঙ্গীত', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (৩য় খন্ড), ঢাকা, ১৯৯৩।

কাজী তামান্না ঃ 'পুরানো সেই দিনের কথা' আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত *গৌরবের চল্লিশ বছর ১৯৫২-৯২*, ঢাকা, ১৯৯৩।

কামাল লোহানী ঃ 'গণসঙ্গীত ও আমাদের রাজনীতি', মুস্তাফা নুরউল ইসলাম সম্পাদিত, *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩।

নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ঃ 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮', সালাউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, ১৯৯৯।

ডঃ প্রীতি কুমার মিত্র ঃ 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬', সালাউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, ১৯৯৯।

বশীর আল হেলাল ঃ 'ভাষা আন্দোলনের চরিত্র বিচার' *সুন্দরম*, ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৯৪।

বুলবন ওসমান ঃ 'বাংলাদেশ পরিস্থিতি ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৭৪।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ঃ 'সংস্কৃতি সর্বত্র, সতত', *মুক্ত করো হে বন্ধ*, ঢাকা, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ঃ 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা', আজকের কাগজ, একুশ ভাদ্র, ১৪০০।

মাহফুজউল্লা ঃ 'বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারা', *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৮।

মুনতাসীর মামুন ঃ 'মুক্তিযুদ্ধ', *যে সব হত্যার বিচার হয়নি*, ঢাকা, ২০০০।

মুস্তাফা নুরউল ইসলাম ঃ 'প্রতিরোধের সড়ক ধরে এবং রবীন্দ্র নাথ', *সময়ের মুখ তাঁহাদের কথা*, ঢাকা, ১৯৯৭।

মিনার মনসুর ঃ 'বাংলাদেশ (১৯৪৭-'৮২)ঃ সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি', মুস্তাফা নুরউল ইসলাম সম্পাদিত *আবহমান বাংলা*, ঢাকা, ১৯৯৩।

রঙ্গলাল সেন ঃ 'ষাটের দশকে বাংলাদেশ ও বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', *গৌরবের চল্লিশ বছর ১৯৫২-'৯২*, ঢাকা, ১৯৯৩।

রফিকুল ইসলাম ঃ 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', মনসুর মুসা সম্পাদিত *বাঙলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৪।

শওকত ওসমান ঃ 'বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন', *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা, ১৯৭৪।

শেখ মুজিবুর রহমান ঃ 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসুচি', *রক্তাক্ত বাংলা*, ১৯৭৪।

সাঈদ-উর রহমান ঃ 'আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১৯৭৪।

সৈয়দ জামিল আহমেদ ঃ 'নাটক ও নাট্যকলা', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ (তৃতীয় খন্ড), ঢাকা, ১৯৯৩।

৪. বাংলা সংবাদ পত্র

দৈনিক আজাদ ঃ ১৯৫৩, ১৯৭১।
দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ১৯৬৯।

৫. ভিডিও ক্যাসেট ঃ মুক্তিযুদ্ধের গান, গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালন শাহরিয়ার কবীর।

সাক্ষাৎকার

বেগম সুফিয়া কামাল

জনাব শামসুর রাহমান

জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী

জনাব ফয়েজ আহমদ

জনাব কলিম শরাফী

অধ্যাপক সনজীদা খাতুন

অধ্যাপক মুস্তাফা নুরউল ইসলাম

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

অধ্যাপক হাশেম খান

অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

জনাব শামসুজ্জামান খান।